(اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ)

يونس: 62

আল্লাহ্ প্রেমিকদের মৃত্যুকালিন অবস্থা

2

(اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ)

يونس: 62

আল্লাহ্ প্রেমিকদের মৃত্যুকালিন অবস্থা

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা ইউসুফ মুতালা
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

3

সুচিপত্র

ভূমিকা	17
আল্লাহ প্রেমিকদের চরিত্র	17
ফেরেশতাগণের আশ্চর্য হওয়া	18
ঈমানের উপর মৃত্যু বড় নেয়ামত	19
আখেরাতের চিন্তার উপকারিতা	19
এই অসুস্থ প্রেম দেখতে ভাল নয়	20
لاتخافوا ولا تحزنوا এর উপযুক্ত যারা	21
খোদাভিতির তাৎপর্য	22
আল্লাহ প্রকৃত সত্য প্রত্যেক চক্ষুষ্মানকে দেখিয়ে দিয়েছেন!	23
হযরত আতা সুলমী (রহ.) এর খোদাভিতির চিত্র	24
সাহায্য চাই হে আল্লাহ	26
হে আল্লাহ অন্তর থেকে অন্যায়ের চিহ্ন মিটিয়ে দাও	26
হযরত সুফিয়ান সাওরী (র:) এর পরকালের ধ্যান	27
একজন সত্যবাদির ওসিয়ত	28
শেষ কর্ম	29
খোদাভিতি আল্লাহর এক নেয়ামত	29
খোদাভীতির আরো কিছু প্রকার সমুহ	30
খোদাভিতি ছেড়ে দেওয়ার পরিণতি	31
আল্লাহর সাথে মিলনের অবস্থা	32
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	33
অসুস্থতার প্রারম্ভিকতা	33
বিদায়ী সপ্তাহ	33
মৃত্যু পুর্ব ৫ম দিনের অবস্থা	34
মৃত্যু পুর্ব ৪র্থ দিনের অবস্থা	35
বৃহস্পতিবার মাগরিবের সময়ের অবস্থা	36
বৃহস্পতিবার এশার সময়ের অবস্থা	36
মৃত্যুর একদিন বা দুই দিন পুর্বের অবস্থা	36
মৃত্যুর একদিন পুর্বের অবস্থা	37
শেষ দিনের অবস্থা (মৃত্যু বরণের দিন)	37
মৃত্যু যন্ত্রণার অবস্থা	38
মদীনা মুনাওয়ারায় শোকের ছায়া	40
আবু বকরের অস্থিরতা ও দৃঢ়চিত্ত্বতা	41
হযরত আবু বকর (রা:) এর ভাষণ	43

4

গোসল ও কাফন-দাফনের প্রস্তুতি	46
জানাযার নামাজ	47
হযরত আবু বকর (রা:)	48
খলিফা নির্ধারণ	48
আবু বকর (রা:) কর্তৃক উমর (রা:) কে ওসিয়ত	49
বিদায়ী সাক্ষাৎ	51
পরলোক গমন	53
দাফন কাফন	53
হযরত উমর (রা:) এর হত্যাকান্ড	54
উমর (রা:) এর হত্যা কারী	55
মদিনাবাসির পেরেশানী	56
শেষ কামনা	57
খলিফা নির্বাচন	57
হযরত উমর (রা:) এর ওসিয়ত	58
মৃত্যু	59
জানাযার নামায	59
হযরত উছমান (রা:)	60
প্রান উৎসর্গকারীদের পরামর্শ ও অনুমতি চাওয়া	62
শাহাদাতের প্রস্তুতি	63
শাহাদাত	65
জানাযার নামাজ	66
ছাহাবায়ে কেরামের পেরেশানী	67
হযরত আলী (রা:) কে হত্যার কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র	69
আলী (রা:) এর হত্যাকান্ড	69
হযরত বেলাল (রা:) এর শেষ বিদায়ের চিত্র	71
হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা:) এর শেষ বিদায়	71
হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:) এর শেষ বিদায়ের অবস্থা	72
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:)	72
হযরত উকবা ইবনে আমির জুহানি (রা:)	73
হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:)	73
হযরত আবু মালিক আশআরি (রা:)	73
হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা:)	74
হযরত উতবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা:)	74
হযরত সালমান ফারসি (রা:)	74

5

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)	76
হযরত আছিম বিন ছাবিত (রাঃ)	77
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)	77
হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)	78
হযরত উবাদা ইবনে ছামিত (রাঃ)	79
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে কুরাইয (রাঃ)	81
হযরত আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস (রাঃ)	81
হযরত ইকরামা রা.এবং তাঁর সাথি (রাঃ)	81
হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ)	83
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)	83
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রাঃ)	84
হযরত হুবাইব বিন যয়েদ বিন আসিম মাজনী (রাঃ)	85
হযরত আকসাম বিন সাইফী (রাঃ)	87
হযরত হাসান বিন আলী মুরতাযা (রাঃ)	87
হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ)	89
হযরত সাদ বিন রাবী (রাঃ)	90
হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ)	90
হযরত খুবাইব (রাঃ)	92
হযরত আব্দুল্লহ বিন জাহাশ (রাঃ)	92
হযরত হানযালা (রাঃ)	93
হযরত আবু দারদা (রাঃ)	94
হযরত আবু জর (রাঃ)	95
হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)	96
হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)	96
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)	97
হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)	98
হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)	99
নারীকুলের সর্দার হযরত ফাতেমা (রাঃ)	100
উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবিবা (রাঃ)	100
হযরত আছিয়া (রাঃ)	101
মাশেতা বিনতে ফেরআউন	102
হযরত সুমাইয়া (রাঃ)	103
হযরত মুআজ আদাবিয়া (রাঃ)	103
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)	104

6

পরকালের যাত্রা	105
স্বপ্নে সাক্ষাৎ	106
ইমাম বুখারী (রহ.)	107
ইমাম মুসলিম (রহ.)	110
ইবনে হজর আসকালানী (রাহ:)	110
ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ:)	111
ইমাম মালেক (রাহ:)	111
হযরত ইমাম নাসায়ী (রাহ:)	112
ইমাম শাফেয়ী (রাহ:)	113
ইমাম আবু ইউসুফ	115
ইমাম নাফে (রাহ:)	116
কুতবুল আকতাব শায়খুল হাদিছ যাকারিয়া রহ. এর শেষ আদর	116
আজরাইলের সাথে আলাপ	117
জাগ্রত অবস্থায় আজরাইলের সাথে সাক্ষাৎ	117
স্বপ্নযোগে সাক্ষাত	118
মৃত্যুকালিন অসুস্থতা	119
মৃত্যু	120
দাফন কাফন	121
মুতাআল্লিকীনদের ব্যাপারে হযরতের চিন্তা ফিকির	123
সুসংবাদ প্রাপ্তি	123
হযরত ইয়ায বিন কাতাদাহ আবশামী (রাহ:)	123
হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রাহ:)	124
হযরত খায়র নুর বাফ (রাহ:)	125
হযরত আহমদ বিন খাজরুবিয়াহ (রাহ:)	126
উমর ইবনে আব্দুল আজিজে রহ. এর স্বপ্ন	126
উমর ইবনুল আব্দুল আজিজের খোদাভীতি	128
মৃত্যুর প্রেরণা এবং পরলোকগমন	129
যেভাবে শহিদ হলেন	129
স্বপ্নে সাক্ষাৎ	134
হযরত আমর বিন শুরাহবীল	135
হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসি আযদী (রাহ:)	135
আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন হানী আন নিসাপুরী	136
হযরত মাকহুল শামী (রাহ:)	136
হযরত আমির বিন আব্দুল্লাহ বিন কয়েস (রাহ:)	137

হযরত আলী বিন সালেহ (রাহঃ)	138
হযরত হাবীবে আযমী (রাহঃ)	138
ফাতাহ বিন সাঈদ (রাহঃ)	139
হযরত মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (রাহঃ)	139
আবু শুআইব সালেহ বিন যিয়াদ (রাহঃ)	140
হযরত মুহাম্মদ বিন আসলাম তুসী (রাহঃ)	140
হাসান বিন হাই (রাহঃ) এর ভাইয়ের ঘটনা	141
আবু ইয়াকুব নাহর জুরী (রাহঃ)	141
হযরত আবু আলী রুদবারী (রাহঃ)	141
হযরত আবু বকর বিন হাবিব (রাহঃ)	142
হযরত রাবি বিন খাসয়াম (রাহঃ)	142
হরম বিন হাইয়ান আজদী আবদী (রাহঃ)	143
হযরত কাজি ইয়াছ বিন মুআবিয়া (রাহ)	144
সালামা বিন দিনার (রাহঃ)	145
হযরত তাউস বিন কায়ছান (রাহঃ)	145
কাছিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দীক (রাহঃ)	145
রাফি বিন মেহরান (রাহঃ)	146
আবু জুরআ রাযী (রাহঃ)	147
হযরত ইউসুফ বিন হুসাইন (রাহঃ)	148
শায়খ যুন নূন (রাহঃ)	149
শায়খ বিশরে হাফি (রাহ)	150
শায়খ নজমুদ্দীন কুবরা (রাহঃ)	152
হযরত আওরঙ্গজেব আলমগিরী (রাহঃ)	152
খাজা মুহাম্মদ মাছুম (রাহঃ)	153
খাজা খুর্‌দ (রাহঃ)	154
শায়খ আমান পানি পতি (রাহঃ)	155
শায়খ সাদিদুল্লাহ (রাহঃ)	155
খাজা যিয়া উদ্দিন সুনামী (রাহঃ)	156
শায়খ শিহাবুদ্দীন খতিব হানসুয়ী (রহঃ)	156
শায়খ ইছহাক (রাহঃ)	157
শায়খ জালালুদ্দীন গুজরাটি (রাহঃ)	158
খাজা মওদুদ চিশতি (রাহঃ)	158
শায়খ মাসউদ গাজি শহিদ (রাহঃ)	159
মুর্তিকে চুর্ণ বিচুর্ণকারি হবে না বিক্রেতা হবে?	159

8

হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন	160
শাহাদাত বরণ	160
হযরত শায়খ মারুফ কারখী (রহঃ)	162
হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইদরিস (রহঃ)	163
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ উমরী (রাহঃ)	163
হযরত শায়খ ছিররী সাকাতী (রাহঃ)	164
তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস (রাহঃ)	165
শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব ভুপালি (রাহঃ)	166
খাজা ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শাকার (রাহঃ)	168
আবু সুলায়মান দারানী (রাহঃ)	169
সাহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতারী (রাহঃ)	169
সায়্যিদুত তায়িফা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহঃ)	170
মুহাম্মদ বিন সিমাক	173
শায়খ আলী বিন সাহল ইস্পাহানী (রাহঃ)	173
শায়খ হুসাইন বিন মনছুর আল-হাল্লাজ (রাহঃ)	174
মৃত্যুর দুয়ারে মনছুর (রাহঃ)	175
শায়খ ইবরাহিম বিন শহর ইয়ার গাজরুনী (রাহঃ)	180
শায়খ আবু আলী আদ দাককাক (রাহঃ)	180
বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহঃ)	182
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রাহঃ)	184
মির্জা মাযহার জানে জানা (রাহঃ)	185
আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ	186
হত্যাকান্ড (যেভাবে তাকে হত্য করা হলো)	186
শাহাদত	189
মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রাহঃ)	190
মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার অবগতি এবং নির্জনতা	190
আমলের প্রতি পাবন্দি	192
ওসিয়ত	192
মৃত্যু	193
কাফন দাফন	194
হযরত তুহফা রহ.	194
তুহফা (রাহঃ) এর মুনিবের সাথে সিররীর সাক্ষাৎ	195
শেষ রাত্রির অস্থিরতা দেখার মত	197
তুহফা (রাহঃ) এর বারকাত সমূহ	197

কাবার প্রাঙ্গনে	198
শায়খ মুহকাম উদ্দিন ছাহেবুল ইয়াছার উয়াইসী (রাহ:)	199
শায়খ মুজাদ্দিদ উদ্দিন বাগদাদী (রাহ:)	201
হযরত সায়িদ ইবনে জুবায়ের (রাহ:)	202
শায়খ আবু আর রেজা (রাহ:)	203
শায়খ অজিহ উদ্দীন (রাহ:) এর শাহাদতের আকঙ্ক্ষা	205
শাহাদাত	206
শায়খ আহমদ নাখলী (রাহ:)	207
খাজা ফুজাইল বিন ইয়াজ (রাহ:)	207
হযরত ইয়াহয়া বিন মুআজ (রাহ:)	208
হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাহ:)	208
সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহ:)	211
মুজাহিদ বিন জবর (রাহ:)	211
ছিলাহ বিন আশয়াম আদাবী (রাহ:)	212
আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান	212
খলিফা হারুনুর রশিদ (রাহ:)	213
আল্লামা সাবুনী (রাহ:)	214
হাফেজ আহমদ ছাহেব (রাহ:)	215
শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী (রাহ:)	216
হযরত হাসসান বিন সিনান (রাহ:)	217
মালেক ইবনে দিনার (রাহ:)	217
হযরত ফাতাহ বিন শহরাফ (রাহ.)	219
ইব্রাহিম বিন ইসহাক হারাবী (রাহ:)	219
মুহাম্মদ বিন সিরিন (রাহ:)	221
হযরত আতা সুলামী (রাহ:)	221
মাও: জাফর আহমদ থানেশ্বরী (রাহ:) কে ইংরেজদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের বিবরণ	222
মৃত্যু যন্ত্রনার শুভাগমন ও শাস্তির রদবদল	223
প্রাসঙ্গিক কথার পর এবার মৃত্যুদণ্ডের শুভাগমনের বিস্তারিত বিবরণ শুনুন	225
আকবর বাদশাহ	226
সুলতানুল মাশায়িখ খাজা নেযামুদ্দীন (রাহ:) এর খোদা প্রেমে নিমজ্জিত হওয়া	226
হযরতের দুনিয়া বিমূখীতা	227
দান দাক্ষিন্যতা	228
মৃত্যু	228
হযরত মাহবুব এলাহি (রাহ:)	229

শায়খ রুকুনুদ্দীন (রাহ)	230
শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া সোহরায়ার্দি (রাহঃ)	231
শায়খ খাজা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ (রাহঃ) এর উপর তাঁকে হত্যা করার জন্য অক্রমন	231
মৃত্যু	232
শায়খ বুরহানুদ্দীন গরীব (রাহঃ)	232
শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ (রাহঃ)	233
হযরত সায়্যিদ ইলমুল্লাহ (রাহঃ)	235
আওরঙ্গজেবের স্বপ্ন	235
মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রাহঃ)	236
শাহ নুর মুহাম্মদ (রাহঃ)	237
একজন চুলের মেকারের কাহিনী	238
লাহা নামক এক মালির ঘটনা	239
আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত ঘটনা	241
হযরত হাকাম (রাহঃ)	241
আবু বকর জাফফাক (রাহঃ)	241
মাসলামা বিন আব্দুল মালেক (রাহঃ)	241
হাছান বছরী (রাহঃ)	242
সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রাহঃ)	242
হযরত মিসআর বিন কিদাম (রাহঃ)	242
হযরত ইয়াহইয়া আল-জালা (রাহঃ)	242
আবুল ওয়াক্ত আব্দুল আউয়াল (রাহঃ)	243
হযরত আদম বিন আবি ইয়াস (রাহঃ)	243
ইমাম গাযালী (রাহঃ)	244
ইবনে ইদ্রিছ (রাহঃ)	244
আবু হাকিম হিরি (রাহঃ)	244
হযরত আবু বকর বিন আইয়াশ (রাহঃ)	244
সাফওয়ান বিন সুলাইম (রাহঃ)	245
মুহাম্মদ বিন ইসমাইল নাসসাজ (রাহঃ)	245
ইয়াযিদ আর রুকাশী (রাহঃ)	246
আবু মুহাম্মদ জাফর আল মুরতাইশ (রাহঃ)	246
উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আয যাহিদ আল-বুসতী (রাহঃ)	247
আমির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনবারী (রাহঃ)	247
আবু হুসাইন,আছিম, আ'মাশ (রাহঃ)	247
হযরত আবু হাফস (রাহঃ)	248

11

হযরত রুয়িম (রাহঃ)	248
জুবাইদা (রাহঃ) এর ঘটনা	248
শায়খ আবু তুরাব নখশবী (রাহঃ)	249
শায়খ মুহাম্মদ বিন ফজল (রাহঃ)	249
শায়খ দানিয়াল (রাহঃ)	249
শায়খ মুজাফফর বলখী (রাহঃ)	250
হযরত দাউদ তায়ী (রাহঃ)	250
শায়খ হামদান কাসসার (রাহঃ)	250
শায়খ আবুল হাছান নুরী (রাহঃ)	250
শায়খ উছমান আল হিরি (রাহঃ)	251
শায়খ নাসসাজ (রাহঃ)	251
শায়েখ আবু বকর কাত্তানি (রাহঃ)	252
শায়খ আব্দুল্লাহ ছাকিফ (রাহঃ)	252
খাজা উবায়দুল্লাহ মুরাওওয়িজে শারইয়্যাহ (রাহঃ)	252
শায়খ মমশাদ দিনওয়ারী (রাহঃ)	253
শায়খ আবু হামযা মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বাগদাদী (রাহঃ)	253
শায়খ আবুল ফজল হাছান সরখসী (রাহঃ)	253
হযরত বাবা ওয়ায়ে কাশ্মিরী (রাহঃ)	254
শায়খ জামালুদ্দীন হাঁসবী (রাহঃ)	254
শায়খ আহমদ নাহরওয়ানী (রাহঃ)	254
হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাহঃ)	255
কাজি হুমাইদুদ্দীন নাগুরী (রাহঃ)	255
শায়খ আব্দুল আজিজ (রাহঃ)	255
হিশাম বিন আব্দুল মালিক (রাহঃ)	256
হযরত মুগীরা আল-খিরায (রাহঃ)	256
হযরত ইবরাহিম নখয়ী (রাহঃ)	256
আবু বকর ইবনে আব্বাস (রাহঃ)	257
ওয়াহাব ইবনুল ওয়ারদ (রাহঃ)	257
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ	257
হযরত ইবনুল মুনযির (রাহঃ)	258
কতিপয় আল্লাহ ওয়ালাদের মরনের চিত্র যাহাদের নাম জানা নাই	258
কবিতা শুনে শুনে যারা প্রাণ দিলেন	265
শায়খুল মুমীন চিশতি ছাবেরীর ছেলে শায়খ সুন্ধা (রাহঃ)	265
শায়খ সুলতান ওলদ (কুদ্দিসা সিররুহু)	265

শায়খ আব্দুল আজিজ বিন হামীদুদ্দীন নাগুরী (রাহঃ)	266
শায়খ ফয়েজ বখস লাহোরী (রাহঃ)	266
হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাহঃ)	267
খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (রাহঃ)	269
শায়খ আবু সায়িদ বিন আবুল খায়ের (রাহঃ)	269
শায়খ মুহাম্মদ দাউদ বিন সাদিক গাঙ্গুহী (রাহঃ)	269
সায়িদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সোমনায়ী (রাহঃ)	270
আবু সাঈদ খাররাজ (রাহঃ)	271
শায়খ হাছান (রাহঃ)	272
শায়খ ফখরুদ্দীন ইরাকী (রাহঃ)	273
হযরত শাহ ফখরুদ্দীন (রাহঃ)	273
পানি বহনকারীর সন্তানের ঘটনা	274
এক সুদর্শন বাদশাহর ঘটনা	275
কবর জগতের অবস্থা	277
রূহ সমুহের পরস্পর সাক্ষাৎ ও পরিচিতি	277
একজন ইবাদতকারি যুবক	278
একটি ছোট্ট মেয়ের ঘটনা	279
কয়েক আল্লাহ ওয়ালা নারীর ঘটনা	279
হাফিজ খাজা সায়্যিদ আব্দুল্লাহ (রাহঃ)	280
মৃত ব্যক্তিদের আল্লাহর যিকির	281
কবরবাসির কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ প্রদান	281
হযরত শায়খ মুহাম্মদ (রাহঃ)	282
মাওলানা ফয়জুল হাছান সাহেব (রাহঃ)	283
উছমান বিন সাওয়াদ তুফাবী (রাহঃ) এর মা	283
এক আল্লাহর ওলীর ঘটনা	284
হযরত রাবেয়া বসরী (রাহঃ)	285
হযরত আছেম জাহদরী (রাহঃ)	286
আমলের গ্রহনযোগ্যতা	286
একটি চিৎকার দিলেন এবং জান দিয়ে দিলেন	288
একটি বাদি	288
এক বুজুর্গের ঘটনা	289
হযরত জুরারাহ বিন আওফা (রাঃ)	289
একজন বেদুইন	290
দুই যুবকের ঘটনা	292

13

আল্লাহকে ভয়কারি এক যুবকের ঘটনা	292
খোদাভীতু এক যুবতির ঘটনা	293
হযরত শায়বান মুসাব (রাহঃ)	294
হযরত আবু জাহিজ (রাহঃ)	295
লায়লা মজনুর ঘটনা	297
মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে অবস্থা জিজ্ঞাস করা যে কী অতিবাহিত হয়েছে	299
জীবিত ও মৃত্যুদের রূহের সাক্ষাত	299
হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও সালমান ফারসী (রাঃ) এর চুক্তি!	301
ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ)	301
এক নেককার ব্যক্তির ঘটনা	303
হযরত আবুল আব্বাস আহমদ বিন মানসুর (রাহঃ)	303
দুই গুণাহগারের কাহিনী	303
হযরত আবু আব্দুল্লাহ বিন হামিদ (রাহঃ)	304
হযরত আবু হাফছ কাগজী (রাহঃ)	305
এক লেখকের ঘটনা	305
আরেক ব্যক্তির ঘটনা	305
খলফ রহ. এর সহপাঠির ঘটনা	306
হযরত আবু সুলায়মান রহ.	306
হযরত আবু যুরআ (রহ)	307
শাহ সনজরি (রাহঃ) এর মুক্তি	307
শায়খ মুহাম্মদ (রাহঃ)	307
শায়খ আবু বকর শিবলী (রাহঃ)	308
শায়খ আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আহমদ আসসুফি আল-খাওয়াছ (রাহঃ)	310
আল্লামা ইবনুল কাছিম (রাহঃ)	311
হাছান বিন ছালেহ (রাহঃ)	311
হযরত মারওয়ান মাহলভী (রাহঃ)	311
মুসলিম বিন ইয়াছার (রাহঃ)	312
মাওরিক আজালি (রাহঃ)	312
হযরত উয়াইছ কারনি (রাহঃ)	313
শুবা বিন হাজ্জাজ (রাহঃ) এবং মিছআর বিন কিদাম (রাহঃ)	313
ঈসা বিন যাযান (রাহঃ)	314
মুসলিম বিন খালেদ জঙ্গি (রাহঃ)	314
শুরাইহ বিন আবিদ শিমালী (রাহঃ)	315
মুররা হামদানী (রাহঃ)	315

আল্লামা হুমায়দী আন্দালুসী (রাহঃ)	316
আল্লামা ইয়াহইয়া বিন মুয়ীন (রাহঃ)	316
আল্লামা খতিব বাগদাদী (রাহঃ)	316
শায়েখ ফাতাহ মুসিলী (রাহঃ)	317
আব্দুল আজীজ বিন সুলায়মান (রাহঃ)	317
মাইছারাহ বিন সুলাইম (রাহঃ)	318
শায়খ আবু আলী যাগবানী (রাহঃ)	318
উস্তাদ আবুল কাসিম কুশাইরী (রাহঃ)	318
জাইগাম আবিদ (রাহঃ)	318
আবুল আলা আইয়ূব (রাহঃ)	318
সালামাহ বিন কুহাইল (রাহঃ)	319
ওফা বিন বিশর (রাহঃ)	319
আব্দুল্লাহ বিন আবী হাবীবা (রাহঃ)	319
হাম্মাদ বিন সালামা (রাহঃ) এর এক সাথি	319
রাজা বিন হায়ওয়াহ (রাহঃ)	319
শিক্ষণীয় দরস	321
পরিপূর্ণ মরণের মোরাকাবা	326
কসিদা-১	338
কসিদা-২	339

15

আল্লাহ্ প্রেমিকদের মৃত্যুকালিন অবস্থা

16

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

মানুষের মুক্তির নির্ভর শেষ অবস্থার উপর। যদি মৃত্যু ঈমানের উপর হয়ে যায়, তাহলে চিরস্থায়ী শান্তি মিলে গেল, আর না হয় সব সময় আযাবের মধ্যে থাকতে হবে। এজন্য নবীগণ এবং নেককারগণ সব সময় আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার (صمد) গুণের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন, জানা নেই মৃত্যু কোন অবস্থায় হবে।

আল্লাহ্ প্রেমিকদের চরিত্র

আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শি'রানী রহ. আহওয়ালুস সাদিকীনের মধ্যে বলেন, আল্লাহ প্রেমিকদের চরিত্রের মধ্যে এটাও একটি যে, তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকেন যে, না জানি আল্লাহ তাদের মৃত্যু খারাপ অবস্থায় দিয়ে দেন। এবং জাহান্নামে গিয়ে আল্লাহ থেকে দুরে থাকতে হয়। কারো কারো অবস্থাতো এরকম হয় যে, তারা চিন্তা ভাবনার মধ্যে এই পরিমাণ ডুবে থাকেন যে, খবরও থাকেনা তাদের কাছে কারা বসা।

হযরত হাছান বছরী (রাহ:) যখন এই কথা শুনতেন, সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে বের হবে ঐ ব্যক্তি যে হাজার বৎসর জাহান্নামে জ্বলে তারপর বের হবে তখন বলতেন আফসোস আমি যদি ঐ ব্যক্তি হয়ে যেতাম। কেহ জিজ্ঞাসা করল, আপনি এই আকাঙ্ক্ষা কেন করছেন? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি কি জাহান্নাম থেকে বের হবে না?

উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কিছু লোক এরকমও হবে যারা সর্বদা জাহান্নামে থাকবে কিন্তু ঐ ব্যক্তিতো তাদের থেকে ভালো এবং আমার আশংকা হয় যে আমি যেন তাদের মধ্য থেকে না হয়ে যাই। কেননা আমি এটা চাই না। এজন্য আমি আকাঙ্ক্ষা করি আমি যেন সর্বদা জাহান্নামে অবস্থানকারিদের মধ্য থেকে না

হই। বরং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হই যারা কোনো সময় জাহান্নাম থেকে বের হবে। চাই সে সবশেষেই বের হোক। কেননা সে সবশেষে হলেও তো আযাব থেকে মুক্তি পাবে।

সুফিয়ান ছওরী রাহ. বলতেন, যে তার দ্বীনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়, আল্লাহ তাকে এই আশংকাহীনতার স্বাদ ভোগ করান।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলতেন, অধিকাংশ মানুষের ঈমান মৃত্যুর সময় উঠিয়ে নেওয়া হয়। কেননা শয়তান এই সময় সর্বশক্তি ব্যয় করে এবং তার ভ্রান্ত করার সকল ক্ষমতাকে শেষ করে দেয়। তার ষড়যন্ত্র থেকে অনেক কম লোকই বাচঁতে পারে। اللهم احفظنا منه

ফেরেশতাগণের আশ্চর্য হওয়া

বিশরে হাফী রহ. বলেন, যখন কোন মানুষ ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করে এবং তার রূহ নিয়ে ফেরেশতাগণ আসমানে যান তখন ফেরেশতাগণ আশ্চর্য হন এবং বলেন, সে দুনিয়ার ধোঁকা থেকে কিভাবে বাচাঁলো?

রবী বিন খুছাইম রহ. বলেন, মানুষের রূহ ঐ অবস্থায় বের হয় যা তার মৃত্যুর পূর্বে অধিকাংশ সময় থাকে।

এর সমর্থনে তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। বলেন, আমি মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে এরকম এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকীন করলাম তখন সে টাকার হিসাব করছিলো। আমি অমুকের কাছে এত টাকা পাব, এখনো পাইনি ইত্যাদি।

মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন যারা ধ্বংস হয়ে যায়, তাদের উপরে আমি আশ্চর্য হই না বরং তাদের উপরে আশ্চর্য হই যারা বেঁচে যায়।(কেননা দুনিয়া থেকে বেঈমান হয়ে যাওয়া কঠিন নয় বরং ঈমানদার হয়ে যাওয়া কঠিন) এজন্য বান্দার উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এটা যে, তিনি যেন তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দিয়ে দেন।

18

ঈমানের উপর মৃত্যু বড় নেয়ামত

যায়েদ ইবনে আসলাম রহ. বলেন, যদি মৃত্যু আমার হাতে থাকত তাহলে ঈমানের উপরে থেকে আমি আমার আত্মাকে মৃত্যু দিয়ে দিতাম, কিন্তু মৃত্যু আমার হাতে নয় এজন্য আমি অপারগ।

একবার সুফিয়ান ছওরী রহ. এত ক্রন্দন করলেন যে, বেহুশ হয়ে গেলেন। এক গোলাম এত ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, ভাই আগেতো আমি গুণাহের জন্য ক্রন্দন করতাম এখন ঈমানের জন্য কাঁদি যে, ঈমান বাঁচতেছে কি না?

বলে থাকেন, কোনো সময় বান্দা মূর্তির পূজা করে কিন্তু সে আল্লাহর কাছে সৌভাগ্যবান। আবার কোনো সময় সে খুব বেশী পরিমাণে আল্লাহর এবাদত করে কিন্তু সে আল্লাহর কাছে হতভাগা। হাদীসের মধ্যে রয়েছে, কোন কোন মানুষ জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমল করতে থাকে এমনকি জান্নাতের এত কাছে চলে যায় যে, জান্নাত এবং তার মধ্যে এক হাত দূরত্ব থাকে। কিন্তু তাকদীরে এলাহি বিজয়ী হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামের কাজ করতে থাকে এবং জাহান্নামে চলে যায়।

আখেরাতের চিন্তার উপকারিতা

ইয়াহয়া ইবনে মুআয রহ. বলেন, চিন্তা করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা এমন দুটি বিষয় যার দ্বারা মানুষের অন্তর থেকে আশ্চর্যজনক জ্ঞানী কথা বের হয়। এবং মানুষ তাঁর থেকে এমন কথা শুনে জ্ঞানীরা পছন্দ করেন। যার সামনে উলামাগণের মাথা নিচু হয়ে যায় ফুকাহারা আশ্চর্য হয়ে যান, যেগুলো শিক্ষা করার জন্য জ্ঞানিরা দৌড়াতে থাকেন।

সুফিয়া ছওরী রহ. বলেন, মুমিনের ভয় এবং চিন্তা তার অন্তর দৃষ্টি অনুযায়ী হয়। (যে পরিমাণে অন্তর দৃষ্টি থাকবে সেই পরিমাণে ভয় এবং চিন্তা থাকবে)

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসির রহ. এর চেহারা অধিক চিন্তার কারণে এরকম দেখা যেত যেমন বাচ্ছা হারিয়ে যাওয়ার কারণে চিন্তিত কোনো মহিলা। এবং তার

প্রভাব এরকম ছিল, যে কেউ তাকে দেখত তার অন্তর থেকে কঠোরতা দূর হয়ে যেত। অন্তর নরম হয়ে যেত।

বলতেন, এমন মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা (পীর বানানো) উচিত যার সঙ্গে কথা বার্তা বলার পূর্বে শুধু দেখার দ্বারাই এটা মনে হয় যে, সে দ্বীন পালনে আমার থেকে অগ্রগামী।(এবং এর যোগ্য যে তাঁকে পীর বানানো যাবে)

ওয়াহাব ইবনুল ওয়ারদ রহ. বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহিম আঃ কে বলেন নিজের অন্তর কে ধৌত কর। তিনি বললেন হে আল্লাহ পানিতো সেখানে পৌঁছে না তাহলে কিভাবে ধৌত করবো?

নির্দেশ আসল (অন্তর পানি দিয়ে ধোয়া হয় না বরং চিন্তা দ্বারা ধৌত করা হয় এজন্য) তোমার উচিত আমার যে সমস্ত বস্তু তোমার থেকে হারিয়ে গেছে এবং যেগুলো হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এগুলোর জন্য অত্যান্ত চিন্তিত ও পেরেশান হওয়া। এভাবেই অন্তরকে ধৌত কর।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. বলতেন, যেভাবে শারিরিক রোগের উৎস শরীর এমনি ভাবে অন্তরের রোগের উৎস গুণাহ। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রোগের ঔষধ তৈরী করেছেন। অন্তরের রোগেরও ঔষধ তৈরী করেছেন। (এবং এটা হচ্ছে চিন্তা এবং আফসোস) যখন মানুষ তার গুণাহের কারণে চিন্তিত হয় (এবং তার চোখের পানি চক্ষু থেকে অন্তরে চলে যাবে অর্থাৎ সে কাঁদবে চক্ষু দ্বারা নয় বরং অন্তর দ্বারা) তখন তার শরীর খোলে যাবে এবং সে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।

কেহ তাঁকে বলল, আপনার চুল সাদা হয়ে গেছে আপনি খেযাব ব্যবহার করেন না কেন? তিনি বললেন মিয়া খেযাবে সুন্দর্য্য অর্জনের বস্তু, আমিতো রাত দিন চিন্তাতেই ডুবে থাকি। (চিন্তিত ব্যক্তির সুন্দর্য্যের সঙ্গে কি সম্পর্ক)

এই অসুস্থ প্রেম দেখতে ভাল নয়

বিশর ইবনুল হারিছ (রহ.) কে কেহ জিজ্ঞাসা করল, কি হল! আপনাকে সর্বদা চিন্তিত দেখা যায় কেন ?

তিনি বললেন, আরে মিয়া আমিতো ঐ ব্যক্তি যাকে সরকারী বেসরকারী অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর এ জিজ্ঞাসাবাদ যেহেতু এখনো হয়নি তাই ভয়ের মধ্যে আছি।

তিনি আরো বলেন যে, সকল চিন্তা-পেরেশানী বিলম্বে হলেও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু গুণাহের পেরেশানী প্রত্যেক মূহুর্তে বাড়তে থাকে, কেননা অন্য বিষয়ের পেরেশানীর মাধ্যমে বিলীন হয়ে যায় নতুবা পুরাতন হয়ে যায়, যদ্দরুন পেরেশানীও চলে যায়, কিন্তু গুণাহের কারণে যে পেরেশানী আসে তা কালের অতিক্রমের দ্বারা শেষ হয় না বরং বাড়তে থাকে। কারণ কালের অতিক্রমের দ্বারা মৃত্যু নিকটবর্তী হতে থাকে, তাই গুণাহের পেরেশানীও বাড়তে থাকে।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) কেঁদে কেঁদে বলতেন– জীব-জন্তু মৎসকুল মরনের পর শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমি মরেও শান্ত হব না, বরং আমলের কারণে কয়েদী হিসাবে থাকব।

হাতেম ইবনে আব্দুল জলীল (রহ.) এর নিয়ম ছিল, ঈদের দিন যারা তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখত তাদের নিয়ে একত্র হয়ে কাঁদতেন।

কেহ জিজ্ঞেস করল, হুজুর দুনিয়াবাসী ঈদের দিন আনন্দ করে আর আপনি কাঁদেন? তিনি বললেন ভাই আমি হলাম আল্লাহর আদেশ নিষেধের অনুগত এক বান্দা, আমার জানা নাই তাঁর আদেশ নিষেধ সমুহের হক যথার্থ ভাবে আদায় করতে পারছি কি না? (অতএব আমি আনন্দ উল্লাস করি কিভাবে?) ঈদের আনন্দ তার জন্যই শোভা পায় যার শাস্তির কোন ভয় নাই।

لاتخافوا ولا تحزنوا এর উপযুক্ত যারা

হাতিম আসিম (রহ.) আল্লাহর বাণী ان لاتخافوا ولا تحزنوا সম্পর্কে বলতেন, পরকালে ভয়ভীতি-পেরেশানী মুক্ত লোক হল তারাই যার দুনিয়াতে গুণাহের ব্যাপারে অধিক ভীতু ও পেরেশান ছিলেন। যারা অবাধে গুণাহ করেছে, গুণাহের কারণে আল্লাহর কাছে লজ্জিত না হয়ে সীমালঙ্গনতা করেছে তারা এ আয়াতের উপযুক্ত হবে না।

মুআয ইবনে জাবল (রা:) বলতেন, যতক্ষন পর্যন্ত পুলসিরাত পাড়ি দেওয়া হয়নি, ততক্ষন পর্যন্ত মানুষের জন্য আনন্দ শোভা পায় না।

রাসুল (সা:) বলতেন, যখন জিব্রাঈল আমার কাছে আসতেন তখন তাঁর অবস্থা এই হত যে, তিনি অত্যন্ত ভীত অবস্থায় থাকতেন, আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকতেন।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা:) বলেন, ইব্রাহিম (আ:) কে তাঁর অধিক খোদাভীতির কারণে আল্লাহ বন্ধু বাণিয়েছেন। তাঁর খোদাভীতির অবস্থা এমন ছিল যে, লোকেরা তাঁর অন্তরের স্পন্দন অনেক দূর থেকে শুনতে পেত।

মুসা ইবনে মাসউদ (র:) বলতেন, যখন আমরা সুফিয়ান সাওরী (রহ.) এর কাছে বসতাম তখন তার ভয়ভীতি, অস্থিরতার কারণে মনে হত যেমন আমাদের চারপাশে আগুন বেষ্ঠন করে নিয়েছে।

ফুজাইল ইবনে আয়াজ (রহ.) বলতেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছে, যাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্বতা-বড়ত্ত্বতার ভয়ে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যেত। পরে আবার একত্রিত হত। তাদের এ অবস্থা মরন পূর্ব চালু ছিল।

তিনি আরো বলতেন, আল্লাহর মারিফাত যার যত বেশি হয়ে থাকে আল্লাহর প্রতি তার ভয় তত বেশী হয়।

ইব্রাহিম ইবনুল হারিছ (রহ.) আল্লাহর প্রতি অধিক ভয় ও লাজুকতার দরুন আসমানের দিকে চেহারা উঠাতেন না।

কতক ব্যক্তি এমনও বলেছেন যে, সুফিয়ান সাওরী, মালেক ইবনে দিনার, ফুজাইল ইবনে আয়াজ (রহ.) প্রমূখ বুযুর্গদের মধ্যে আল্লাহর ভয় যখন প্রবল হত তখন চেহারা উপর দিকে উঠিয়ে অজানা গন্তব্যের দিকে চলে যেতেন।

খোদাভিতির তাৎপর্য

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) খোদাভিতির আধিক্যতার সময়ে বলতেন, হে আল্লাহ, আমি চাই আমি যেন ছাই হয়ে যাই, যাতে বাতাশ আমাকে উড়িয়ে নিবে।

22

ইসহাক ইবনে খালাফ (রহ.) বলতেন, বসে কান্নাকাটি করা, অশ্রু প্রবাহিত করার নাম খোদাভিতি নয় বরং খোদাভিতি হল যে সকল কথা কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন তা ছেড়ে দেওয়া।

হাছান বসরী (রহ.) বলতেন, আমি বার বার পড়তে থাকলাম

كل نفس ذائقة الموت (সকল আত্মা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে) তখন দেখলাম কেহ আমাকে বলছে তুমি আর কতক্ষণ এ আয়াত পুণরাবৃত্তি করবে? তুমি তো এ আয়াত পড়ে চার হাজার জিনকে হত্যা করে দিয়েছ। যখন তারা এই আয়াত শুনত তখন ভয়ের প্রবনতার কারণে আসমানের দিকে চোখ তুলত না, এ অবস্থায় মরে যেত।

ফুজাইল ইবনে আয়াজ (রহ.) আরাফার দিনে আরাফার মাঠে অবস্থান করলেন, আর সুর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁর দাড়ি মোবারক পাকড়াও করে কাঁদতে থাকলেন। এবং বলতে থাকলেন, যদিও হজ্বের বরকতে আমার গোনাহ মাফ হয়ে গেছে তথাপি আক্ষেপ রয়ে গেছে।

হাম্মাদ ইবনে যয়েদ (রহ.) পায়ের পাতায় ভর করে বসতেন। পুর্ণ পা রেখে বসতেন না। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলতেন, ভাই আত্মতৃপ্তির সাথে ঐ ব্যক্তিই বসতে পারে, যে আল্লাহ ত'য়ালার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। আমিতো রাত দিনের কোন সময়ে আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে ভয় বিহিন নয় তাহলে কিভাবে ভাল করে বসতে পারি?

উমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহ.) বলতেন, عظمت না হলে সকল মাখলুক আল্লাহর ভয়ে মরে যেত, অতএব তুমি অনুমান করে নাও খোদাভিতি কি জিনিস। এজন্য তোমাদের অনুভুতি হওয়া উচিত।

আল্লাহ প্রকৃত সত্য প্রত্যেক চক্ষুষ্মানকে দেখিয়ে দিয়েছেন!

মালেক ইবনে দিনার (রহ.) এর খোদাভিতির অবস্থা ছিল এমন যে, তিনি বলতেন, আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি আমার পরিবার পরিজনকে ওসিয়ত করব, যখন আমার ইন্তেকাল হবে তখন আমাকে হাতকড়া পরিয়ে কবরে

রাখবে, যেভাবে মুনীব থেকে পলায়নকারী গোলামকে পরানো হয়। অতএব হে লোক সকল তোমরা বল, তোমরা জাহান্নামের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে জান্নাতে যাওয়ার এবং সেখানকার হুর, বালাখানার ইচ্ছা পোষণ কর।

ফুজাইল ইবনে আয়াজ (রহ.) বলতেন, আল্লাহর কছম কোন প্রেরিত নবী (আ:) অথবা নৈকট্যশীল ফেরেস্তার প্রতি আমার ঈর্ষা নেই। কারণ তারা কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন, এবং প্রত্যেকে স্ব-স্ব অবস্থা অনুপাতে প্রভাবান্বিত হবেন। আমার ঈর্ষা হল, তাদের উপর যারা এখনো জন্ম নেয়নি (কারণ কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার সাথে তারা সম্পর্কহীন) অতএব আমি চাই তাদের মত আমিও যেন হয়ে যাই। যাতে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন না হই।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলেছেন, মানুষের এমন হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহর কাছে সম্মানিত নিজের কাছে নিকৃষ্ট। মাখলুকের কাছে মধ্যমশ্রেণী। অর্থাৎ মানুষের জীবন পদ্ধতি এমন হবে যে, সে কখনও নাফরমানী করবে না, তাহলে আল্লাহর কাছে হবে সে সম্মানি, সাথে সাথে নিজেকে নিকৃষ্ট সৃষ্টি মনে করবে, আর আল্লাহর সৃষ্টির সাথে এমন আচরন করবে না, যদ্দরুন সে তাকে মন্দ বলবে। আর সৃষ্টি জগত তাকে ভাল বলবে এমন চেষ্টাও করবে না।

ফারকাদ সানজী (রহ.) বলতেন, একদা বায়তুল মাকদিছে ৫০০ জন কুমারী মেয়ে গেল, সেখানে তাদেরকে কোন একজন আলেম আখেরাতের অবস্থা শুনালেন। তখন একসাথে সবাই মারা গেল। তারা ছিল দুনিয়া বিমূখ। তাইতো তাদের পরনে ছিল চট, যা হল যুহদের পোষাক।

হযরত আতা সুলামী (রহ.) এর খোদাভিতির চিত্র

আতা সুলামী (রহ.) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এই দোয়া করার সাহস করতেন না। কারণ তিনি লজ্জাবোধ করতেন তার এই আমালের বিনিময়ে জান্নাতের দরখাস্ত করাটাকে। এই ছিল তার সুউচ্চ বিনয়ের অবস্থা।

24

ফরকাদ সানজী (রহ.) বলেন, একবার আমরা আতা সুলামী (রহ.) এর কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম প্রখর রোদের মধ্যে জমিনে শুয়ে আছেন। তার গালবেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি গাল বেয়ে অশ্রু জমিনে পড়ে মাটি স্যাতস্যাতে হয়ে গেছে, কাদা হয়ে গেছে। তাঁর অভ্যাস ছিল চোখের পানি হাত দ্বারা এদিক সেদিক ছিটাইয়া দিতেন, যাতে মানুষ মনে করে তিনি অজু করেছেন আর অজুর কারণে কাদা জমে আছে।

ফারকাদ সানজী (রহ.) বলেন, আতা সুলামী (রহ.) ৪০ বছর যাবৎ আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকাননি। একবার ভুলে তার চাহনি আসমানের দিকে পড়ায় উপুড় হয়ে পড়ে যান। যদ্দরুন পেটে চাপ লেগে পেটের ভিতরের একটি অন্ত্র ফেটে যায়। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর নিয়ম ছিল, যখন শহরবাসির উপর কোন মুসিবত আসত তখন তিনি বলতেন এটা আমার গুণাহের কারণে হয়েছে। যদি আমি এই শহর থেকে বের হয়ে যেতাম তাহলে তাদের উপর মুসিবত আসত না। রাতের বেলা অধিকাংশ সময় নিজের শরীরের উপর হাত বুলাতেন এজন্য যে, গুণাহের কারণে আমার শরীর বিকৃত করা হল কিনা। তিনি বলেন, একবার আমরা উতবাতুল আল্লাম এর সহিত কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় আসার পর উতবাতুল আল্লাম বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। যখন তাঁর হুশ ফিরে আসল তখন বললেন, এটা হল ঐ জায়গা যেখানে বালেগ হওয়ার আগে আমি আল্লাহর নাফরমানি করেছিলাম।

তাঁর এই অবস্থা ঐ সময়কার যখন তিনি ও তাঁর মুরীদগণ ৪০ বছর যাবৎ এশার ওজু দ্বারা ফজর পড়ছিলেন। অপরদিকে তাঁর শরীর জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শরীরের রং তরমুজের ছালের মতো হয়ে গিয়েছিল। এর দ্বারাতে অনুমিত হয় ঐ সকল আল্লাহ ওয়ালাদের খোদাভিতি কেমন ছিল। আমাদের কতক পূর্বসুরিদের অবস্থান এমন ছিল যে, কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেতেন। কারো কারো তো অবস্থা এমন ছিল যে, মৃত ব্যক্তির শোকে বিলাপ করার ন্যায় কেঁদে কেঁদে ইন্তেকাল করেন।

সাহায্য চাই হে আল্লাহ!

এক আল্লাহ ওয়ালা বলেন, যদি ৫০ বছর যাবৎ কারো একত্ববাদ সম্পর্কে আমার জানা থাকে, অতপর ঐ ব্যক্তি আর আমার মধ্যে একটি দেয়াল প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, এবং এই অবস্থায় সে মারা যায় তাহলে আমি তার তাওহিদের সাক্ষি দিব না। কারণ আমার জানা নাই তার উপরে কি কি বিষয় অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইমাম আবু মুহাম্মাদ সহল (রহ.) বলতেন, আল্লাহ ওয়ালাগন সর্বদা মন্দ কর্মের কারণে আল্লাহ থেকে দুরে সরে যাওয়ার ভয়ে ভীতু থাকেন। আল্লাহ ঐ সকল বান্দাদের প্রশংসায় বলেছেন- وقلوبهم وجلة

তিনি বলতেন, যেভাবে মানুষ মন্দ কাজকে ভয় করে তেমনিভাবে যদি ভালো কাজকেও ভয় না করে তাহলে তার ভয় সঠিক নয়।

একবার বললেন, ভয়ের উচ্চস্থর এটা যে, নিজের ব্যাপারে সর্বজ্ঞানী আল্লাহর ইলমের ভয়ে ভীত থাকা। কখনো যেন খেলাফে সুন্নাত কোন কাজ করে না বসি এবং এই কাজ তাকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এবং বললেন, আল্লাহর ফয়সালার ভয় সম্মানের পাল্লা।

হে আল্লাহ অন্তর থেকে অন্যায়ের চিহ্ন মিটিয়ে দাও

এক আল্লাহ ওয়ালা বলেন, যদি বাড়ির ফটকে শাহাদত হয় আর কক্ষের ফটকে ইসলামের উপর মৃত্যু হয়, তাহলে আমি শাহাদতের মৃত্যুকে পছন্দ করব।

জিজ্ঞাসা করা হলো কেন? তখন বললেন যে, আমার তো জানা নাই বাড়ির ফটক থেকে কক্ষের ফটক পর্যন্ত পৌছার ভিতর কোন অঘটন ঘটে কিনা। আমার ঈমানের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে কিনা?

যুহাইর ইবনে নুআইম আলবানি (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার সবচেয়ে বড় পেরেশানী আমার গুণাহ নয়, বরং বড় পেরেশানী হলো ঈমান হারা হয়ে যাই কিনা? এবং ঈমানবিহিন মৃত্যু হয় কিনা?

26

ইবনুল মোবারক আবু লুহাইয়া থেকে, তিনি আবু বকর ইবনে সুওয়াদাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ছিল যে মানুষ থেকে আলাদা থাকত। যেখানে যায় সেখানেই আলাদা থাকে। একদা আবু দারদা (র.) তার কাছে গেলেন। তাকে বললেন তোমাকে আল্লাহর কছম দিয়ে বলছি বলতো তুমি মানুষ থেকে পৃথক হয়ে থাকাকে গ্রহণ করলে কেন?

তিনি বললেন, আমার ভয় হয় আমার অজান্তে ধর্ম হারা হয়ে যাই কিনা।

আবু দারদা (র.) বললেন এই গুনে গুনান্বীত ভীতু একজন লোক দেখেছ? ৯০জন লোক দেখেছ? ৮০জন লোক দেখেছ? এভাবে বলতে বলতে বললেন ১০জন ও কি দেখেছ?

রাবী বলেন, আমি শামের একজন ব্যক্তির কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এটি তো শুরাহবীল ইবনে সামিতের ঘটনা যিনি রাসূল (সাঃ) এর সাহাবী।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) কছম করে বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ঈমানহারা হওয়ার ভয় থেকে আশংকামুক্ত হয়ে যায় সে ঈমান হারা হয়ে যায়।

আমাদের একজন আলেম বলেন, যাকে ঈমান দান করা হলো সে সব কিছু পেয়ে গেলো। আর যে ঈমান থেকে বঞ্চিত হলো সে সকল নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলো। কারণ যার কাছে ঈমান আছে সে আংশিক নয় বরং পূর্ণ নেয়ামতের অধিকারী।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এর পরকালের ধ্যান

যখন সুফিয়ান সাওরী (রহ.) এর মরন যখন ঘনিয়ে এল তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আবু আব্দিল্লাহ তোমার জন্য আল্লাহর অধিক করুনার প্রতি আশা রাখা উচিত।

তিনি বললেন, আমি কি গুণাহের উপর কাঁদছি? যদি আমি নিশ্চিত ভাবে জানতাম আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হবে তাহলে আমি কোন পরওয়া করতাম না, চাই পাহাড় সম গুণাহ নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করি না কেন?

একবার জমিন থেকে একটি শস্য উঠিয়ে বললেন, আমার গুণাহ এর চাইতে হালকা, আমার ভয় মাত্র একটিই, তা হলো শেষ সময়ে ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হয় কিনা?

আল্লাহ তাঁকে রহম করুন, তিনি আল্লাহ ভীতুদের মধ্যে ছিলেন, অধিক ভয়ের কারণে রক্ত পেশাব করতেন। আল্লাহর ভয়ের কারণে অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকতেন। তাঁর প্রশ্রাব এক আহলে কিতাবির সামনে রাখা হলে সে বলল এটা কোন দুনিয়া ত্যাগির পেশাব।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) হাম্মাদ বিন সালামা (রা:) কে বললেন হে আবু সালামা, আমার মতো লোকেরও কি ক্ষমা আছে? হযরত হাম্মাদ (র:) জবাবে বললেন আমি আশান্বীত।

একজন আলেম বলেন, যদি আমার সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন হত যে, আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হবে। তাহলে উহাই আমার কাছে সব কিছুর চাইতে প্রিয় থাকতো। তখন আমি আনন্দে সকল মাল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করতাম।

একজন সত্যবাদির ওসিয়ত

এক বুযুর্গ একজন সত্যবাদি বান্দার ঘটনা বর্ণনা করেন, যিনি অত্যান্ত খোদভীতির অধিকারী ছিলেন। তিনি তার মরনকালে তার ভাইদেরকে ওসিয়ত করলেন, যখন তোমরা দেখবে আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে গেছে, তখন তোমরা আমার মাথার নিকট বসবে, আমার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে থাকবে, যদি দেখ আমার মরন তাওহীদেও উপর হয়েছে, তাহলে আমার মালিকানাধীন সকল সম্পদ বিক্রয় করে বাদাম এবং মিষ্টান্ন জাতীয় বস্তু ক্রয় করে শহরের বাচ্চাদেরকে বন্টন করবে। আর বলবে এটা হচ্ছে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির আনন্দের মিষ্টি।

আর যদি দেখ তাওহীদের উপর মৃত্যু হয় নাই তাহলে প্রচার প্রসার করবে না। যাতে মানুষ জানাযায় শরীক হয়ে প্রতারিত না হয়। তারপর যদি কেহ স্বেচ্ছায়

28

শরিক হয়, তাহলে হোক। এ অবস্থায় কোন প্রকারের রিয়া সম্পৃক্ত হবে না। আর মুসলমানকে প্রতারিতকারীও সাব্যস্ত হব না।
তখন একজন ভাই এই ওসিয়ত করার পর প্রশ্ন করলেন, আমরা কিভাবে বুঝব ঈমানের উপর মৃত্যু হয়েছে? তখন তিনি কয়েকজন মৃত ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে কিছু আলামত বর্ণনা করলেন।
বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমি তার মাথার নিকটে বসে তার চেহারায় তাওহীদের উপর মৃত্যুর আলামত দেখলাম। রাবী বলেন, আমি তার ওসিয়ত পুরা করলাম। কিন্তু এ ঘটনা আমি আমার বিশেষ কয়েকজন বন্ধুর কাছে বলেছি।

শেষ কর্ম

মরণকালে মানুষের জীবনের সকল মন্দ কর্ম তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সে ঐ মন্দ কর্ম গুলো তার জীবনের শেষ মুহুর্তে প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ না করুক, যদি ঐ সময় আত্মা ঐ সকল মন্দ কর্মের দিকে ধাবিত হয়ে যায় আর এই ধ্যানে লেগে যায় তাহলে উহাই তার শেষ কর্ম গন্য হবে। চাই ঐ মন্দ কর্ম যতই অল্প হউক না কেন। তার ফলাফল ঐ কর্ম অনুপাতে হবে।
আর যদি কেহ জীবনভর ভাল কর্ম করে তাহলে ঐ ভালকর্ম তার মরণকালে হাজির হবে। সে তা দেখতে থাকবে। ঐ সময় যদি ঐ ভাল কর্মের প্রতি অন্তর সম্পৃক্ত হয়ে যায়, ধ্যান তৈরী হয়ে যায় তাহলে উহাই তার শেষ কর্ম গন্য হবে, তার ফলাফল হবে ঈমানী মৃত্যু।

খোদাভিতি আল্লাহর এক নেয়ামত

আল্লাহ প্রিয় বান্দাদের একদল আগত আয়াত (আল্লাহ জন্মমৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ) সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে তার জীবদ্দশায় গুণাহের খেয়ালের দ্বারা অন্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। আর মৃত্যুকালে তাওহীদ থেকে হঠিয়ে পরীক্ষা করেন।

এবার যার রূহ তাওহীদের উপর বাহির হয়, সে সকল পরীক্ষার ঘাট সফলতার সাথে পার করল। সে হল মুমিন, আর উহাই ‘বালায়ে হাছান’ যেমন- আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا (আর যেন আল্লাহ তার নিজের পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে উত্তম ভাবে পরীক্ষা করেন। এ সকল বিষয়ের জ্ঞান বান্দার অন্তরে খোদাভিতি সৃষ্টি হয়। ফলে সে তার কর্মের প্রতিদানের প্রতি লক্ষ্য রাখেনা।) কারণ তার রবের মা’রিফাত হাছিল। আর এই ভয় হচ্ছে তার আমলের প্রতিদান।

এজন্য খোদাভিতি হচ্ছে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। আর এ ভয় তার জন্য একটি স্থর হয়ে গেছে। যেমন- আল্লাহ বলেন,

قَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهَا (আল্লাহ থেকে ভয়কারী দুই ব্যক্তি বলেছে আল্লাহ তার ভয় দ্বারা আমায় পুরুস্কৃত করলেন। অর্থাৎ তাকে ভয়ের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

খোদাভিতির আরো কিছু প্রকার সমুহ

খোদাভিতির ২য় স্থর ডানপন্থিদের জন্য, যারা প্রথম স্থর থেকে কম। অর্থাৎ গুণাহের শাস্তির ভয়, আল্লাহর অনুগত্যের বেলায় স্বল্পতার ভয়, আল্লাহর সীমালঙ্গনের ভয়, নেক আমলের তাওফিক ছিনিয়ে নেওয়ার ভয়, গাফলতির কারণে সতর্কতার পর্দা উঠিয়ে নেওয়ার ভয়, সুস্থতার পর দুর্বলতার মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভয়, তাওবাহ ভঙ্গের পর কৃত ওয়াদা শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়, কু–প্রবৃত্তি অভ্যাসে পরিণত হওয়া, যার ভয় আখেরাতের চিন্তা থেকে দুনিয়ার প্রতি মনযোগী হওয়ার, ৩য় পূর্বের গুণাহের কারণে ধৃত হওয়ার ভয়, তার মন্দ কর্ম দেখে আল্লাহ নারাজ হয়ে যাওয়ার ভয়।

আল্লাহ ওয়ালাদের খোদাভিতির আরো স্থর রয়েছে। বলা হয় যে, আরশ হলো আলোকিত মূল্যবান পাথর যাহা সকল امورکونية তথা আধ্যাত্মিক বিষয়াদী দ্বারা ভরপুর। বান্দা যে অবস্থায় থাকে তার আকৃতি আরশে এমনি হয়, যখন কিয়ামত সংগঠিত হবে আর বান্দা হিসাব নিকাশের জন্য উপস্থিত হবে তখন আরশ থেকে তার ঐ সুরত তার সামনে রেখে দেওয়া হবে, ফলে সে দুনিয়াতে

যেভাবে ছিল, পরকালেও নিজেকে সেই সুরতে দেখবে আর আমলের কথা স্মরণ করবে। তখন সে এই পরিমাণ লজ্জিত হবে যে, তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

খোদাভিতি ছেড়ে দেওয়ার পরিণতি

বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে তার মারিফাত দান করেন কিন্তু বান্দা সে অনুযায়ী আমল করে না। তখন তার থেকে মারিফাত উঠিয়ে নেওয়া হয় না বরং বাকি থাকে যাতে কিয়ামতের দিন যে পরিমাণ মারিফাত দান করা হয়েছিল সেই পরিমাণ হিসাব নেওয়া হয়। তবে হ্যাঁ বরকত বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত পুরুষ্কার থেকে বিরত রাখা হয়।

যাকে আল্লাহ পরীক্ষা করার পর নেয়ামত দান করেন অতপর সে নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে গর্ব অহংকার করে পূর্বের অপরাধ ভুলে পূর্বের অবস্থা ফিরে আসার ভয় করে না, এমন বান্দাকে ভৎসনা করে আল্লাহ বলেন-

وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءُ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيْ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ

আর যদি আমি তাকে কষ্ট স্পর্শের পর আমার নেয়ামত আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলবে, আমার থেকে অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে। নিশ্চয় সে উৎফুল্ল হয়ে অহংকার প্রদর্শন করে। (হুদ-৯)

মোটকথা: মৃত্যুর বিষয়টি সবচাইতে বেশী চিন্তা ও পেরেশানীর কারণ। সুতরাং এ বিষয়ে সজাগ রাখার জন্য আল্লাহ প্রিয় বান্দাদের শেষ সময়ের অবস্থা কেমন ছিল, কোন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন, তাদের শেষ অবস্থার চিত্র এই কিতাবে সংকলিত করা হয়েছে।

শেষ নি:শ্বাসের সময় আল্লাহর প্রিয়দের অবস্থা কিছুটা এই কিতাব থেকে অর্জন হবে, আর ঐ সময়ের জন্য প্রস্তুতির তাওফীক অর্জিত হবে ইনশা আল্লাহ। انشاءالله

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্দর মৃত্যু দ্বারা সৌভাগ্যবান করুন- امين

(হযরত মাওলানা ইউসুফ মুতালা সাহেব মুদ্দা জিল্লুহুল আলী)

আল্লাহর সাথে মিলনের অবস্থা

32

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থতার প্রারম্ভিকতা-

ছফর মাসের ২৮ তারিখ রোজ রবিবার রাসুল (সা:) এক জানাযা থেকে ফেরার পথে মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। তারপর এই ব্যথা বাড়তে থাকল।

হযরত আবু সায়িদ খুদরী (রা:) বলেন, যে রুমাল রাসুল (সা:) এর মাথায় দিয়ে রেখে ছিলেন আমি সেটাকে স্পর্শ করলাম, দেখলাম তা গরম হয়ে আছে। শরীর মোবারক এত গরম ছিল যে, আমার হাত গরম সহ্য করতে পারে নাই। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, নবীদের থেকে বেশী কষ্ট কারো হয় না। এজন্য তাদের প্রতিদান সবচাইতে বেশী।

রাসুল (সা:) পূর্ণ তের অথবা চৌদ্দ দিন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার **১১**তম দিন পর্যন্ত মসজিদে এসে নিজে ইমামতি করেছেন।

বিদায়ী সপ্তাহ

বিদায়ী সপ্তাহ পূর্ণ অতিক্রান্ত করেছেন আয়েশা ছিদ্দিকা (রা:) এর গৃহে। হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, রাসুল (সা:) যখনই অসুস্থ হতেন তখন নিম্নের দোয়াটি পড়তেন।

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ' لَا شِفَاءَ اِلَّاشِفَائُكَ' اِشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

হে মানুষের প্রভু! পীড়া দুর করে সুস্থতা দান কর। তুমি শিফা দান কারী। তোমার শিফা ছাড়া কোন শিফা নাই। আমাকে এমন শিফা দান কর যাতে আর কোন কষ্ট না থাকে।

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, ঐ দিনগুলোতে আমি নিজে এই দোয়া পড়ে রাসুল (সা:) এর হাতে ফু দিতাম, যাতে রাসুল (সা:) নিজ পবিত্র হাত শরীরে বুলিয়ে দেন। কিন্তু রাসুল (সা:) হাত সরিয়ে নিতেন আর বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَالْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلي আয় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর,

আমাকে আমার মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।(বুখারী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ রা.থেকে)

মৃত্যু পূর্ব ৫ম দিনের অবস্থা

নবী করিম (সাঃ) বুধবার দিন পাথর অথবা একটি গামলার মধ্যে বসে সাত কুপের সাত মশক পানি শরীর মোবারকে ঢালেন, এর দ্বারাতে কিছুটা স্বস্তি লাভ করেন। ফলে মসজিদে গিয়ে লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের পূর্বে একটি জাতি ছিল যারা নবীদের এবং সৎকর্মশীলদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। সাবধান! তোমরা এরূপ কর না। আল্লাহর অভিশম্পাত বর্ষিত হোক ঐ সকল ইহুদী নাসারাদের উপর যারা নবীদের কবরকে মসজিদ বা সেজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।(বুখারী, মুসলিম উরওয়া থেকে তিনি আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন)

আরো বলেন, আমার কবরকে ইবাদতের জন্য মসজিদ বানাইও না।

(মুয়াত্তা মালেক আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন)

আরো বলেন, ঐ জাতির উপর আল্লাহর কঠিন শাস্তি রয়েছে যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছে। সাবধান! আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি। আমি হুকুম পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন। এই দিনে রাসুল (সাঃ) নামাজ পড়িয়েছেন। তারপর মিম্বরে বসেন। এটা ছিল শেষ বসা।

অতপর হামদ ও ছালাতের পর উহুদ যুদ্ধের শহিদদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদেরকে আনসারদের ব্যাপারে ওসিয়াত করছি, ঐ লোকগুলো আমার সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে ছিল। তারা তাদের দায়িত্ব পূর্ণ করেছে। এবার তাদের পাওনা বাকি রয়ে গেছে। তা হল, সৎকর্মকারীকে মূল্যায়ন করা, ভুলকারীকে ক্ষমা করা। (যুরকানী ৮ম খন্ড) হে মুহাজিররা, তোমরা তো অগ্রগামী হতে থাকবে। আর আনসাররা এখন যে অবস্থায় আছে তার থেকে বেশী হবে না।

অতপর বলেন, এক বান্দার সামনে দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছু পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আখেরাতকে বেছে নিয়েছেন। এই কথার মর্ম একমাত্র

34

আবু বকর (রা:) বুঝেছেন। তাইতো তিনি বলে উঠলেন, আমার মা-বাবা আমার প্রাণ,মাল-সম্পদ সবকিছু হুজুর (সা:) এর জন্য কুরবান হোক। একথা বলে তিনি কেঁদে ফেললেন।

রাসুল (সা:) আবু বকরকে লক্ষ্য করে বললেন, আবু বকর ধৈর্য্য ধর। তারপর আদেশ করলেন, আবু বকরের দরজা ব্যতিত মসজিদের সকল দরজা বন্ধ করা হোক! (বুখারী আয়েশা থেকে, দারেমী ও মুসলিম আবু সা্ঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেন)

মৃত্যুপূর্ব ৪র্থ দিনের অবস্থা

বৃহস্পতিবার রাসুল (সা:) এর অসুস্থতা বেড়ে গেল। এ অবস্থায়ও উপস্থিত লোকদের ডেকে বললেন, কাগজ নিয়ে আস। আমি তোমাদেরকে এমন কিছু লিখে দিব যা মেনে চললে তোমরা ভ্রষ্ট হবে না।

তখন কেউ কেউ বললেন যে, রাসুল (সা:) এর অসুস্থতা এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। কুরআন তো আমাদের কাছে আছে। উহাই যথেষ্ট! এ সময় পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হল, কেহ বলল লিখার সরঞ্জাম নিয়ে আস, হতে পারে কিতাবুল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু লিখবেন। শোরগোল বেড়ে গেলে রাসুল বললেন, সবাই উঠে যাও।

অতপর রাসুল (সা:) ঐ দিনই তিনটি ওসিয়াত করলেন,

(১) ইহুদীদেরকে আরব ভূখন্ড থেকে বাহির করে দাও।

(২) প্রতিনিধি দলের সম্মান, মেহমানদারী রাসুল যেভাবে করেছেন সেভাবে করবে।

(৩) সুলায়মান আহয়াল এর রেওয়ায়ত যাহা বুখারীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত উহাতে উল্লেখ নাই।

তবে ছহীহ বুখারীতে কিতাবুল ওসায়ার মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আউফা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা:) কুরআন শরীফ সম্পর্কে ওসীয়ত করেছেন।

35

বৃহস্পতিবার মাগরিবের সময়ের অবস্থা

বৃহস্পতিবার মাগরিব পর্যন্ত সকল নামাজ রাসুল (সা:) পড়িয়েছেন। মাগরিবের নামাজে সুরা মুরসালাত তেলাওয়াত করেছেন। এই সুরার শেষ আয়াতটিও কুরআনের মহা মর্যাদা প্রকাশ করে। فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
অর্থাৎ কুরআনের পর আর কোন কথার উপর ঈমান আনবে! (ছহীহ বুখারী উম্মে ফজল থেকে বর্ণিত)

বৃহস্পতিবার এশার সময়ের অবস্থা

এশার নামাজের জন্য রাসুল (সা:) মসজিদে যেতে তিনবার ইচ্ছা করলেন। প্রত্যেকবার ওজুর জন্য বসার সাথে সাথে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। শেষ পর্যন্ত বললেন যে, আবু বকর কে বল নামাজ পড়াবার জন্য।

(বুখারী মুসলিমে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্নীত)

বুখারীর রেওয়ায়েতে এসেছে, আবু মুসা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা:) এই হুকুম তিনবার করেছেন।

এই আদেশের পর থেকে রাসুলের জীবদ্দশায় আবু বকর (রা.) ১৭ ওয়াক্তের নামাজের ইমামতি করেছেন।

মৃত্যুর একদিন বা দুই দিন পূর্বের অবস্থা

শনিবার অথবা রবিবারে আবু বকর (রা:) এর ইমামতিতে যুহরের নামায শুরু হল। এদিকে নবী করীম (সা:) হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আলী (রা) এর কাঁধে ভর করে জামাআতে হাজির হলেন। ছিদ্দিকে আকবার (রা:) রাসুলের উপস্থিতি টের পেয়ে পিছু হটতে শুরু করলেন। রাসুল (সা:) ইশারা করলেন, স্বস্থানে থাকার জন্য। অতপর ছিদ্দিকে আকবরের বরাবর বসে নামাজে (শরীক হলেন।) এবার আবু বকর ছিদ্দিক (রা:) রাসুলের ইকতেদা করছেন আর বাকী সবাই আবু বকরের ইকতেদা করছেন।

(বুখারী মুসলিমে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত)

মৃত্যুর একদিন পূর্বের অবস্থা

রবিবার সকল দাসদেরকে আজাদ করলেন। কিছু বর্ণনা মতে, এদের সংখ্যা ৪০। ঘরের মধ্যে সাত দিনার ছিল তা গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এই দিনের সন্ধ্যায় আয়েশা (রাঃ) বাতি জ্বালানোর জন্য এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে তেল ধার করেন। হাতিয়ারসমূহ মুসলমানদের দান করেন।(বুখারীতে আমর ইবনুল হারেছ থেকে বর্ণিত, যিনি উম্মুল মু'মিনীন যুওয়ারিয়া রা. এর ভাই)

রাসুল (সাঃ) এর একটি লৌহবর্ম একজন ইহুদীর কাছে ৩০ ছা' যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল । (বুখারী)

শেষ দিনের অবস্থা (মৃত্যুবরণের দিন)

সোমবার ফজরের নামাজের সময় নবী করীম (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) এর হুজরা ও মসজিদের নববীর মধ্যখানে যে পর্দা ছিল ঐ পর্দাটি উঠালেন। ঐ সময় মসজিদে নামাজ চলছিল। কিছুক্ষণ রাসুল (সাঃ) তার শিক্ষার ফলাফল অবলোকন করলেন। (ছহীহ মুসলিমে আনাস থেকে বর্ণিত)

নামাজের এই দৃশ্য দেখে তাঁর চেহারাতে আনন্দ ভেসে উঠল, ঠোঁটে হাসির ঝলক ফুটে উঠল। ঐ সময় তাঁর চোহারাটাকে কুরআনের পাতার ন্যায় মনে হচ্ছিল। (বুখারী মুসলিমে আনাছ থেকে বর্ণিত)

চেহারা মোবারককে কুরআনের পাতার সাথে তুলনাটি আনাছ (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে। এটা একটা আশ্চর্যজনক এবং পবিত্র সাদৃশ্য।

রাসুলের পর্দা ওঠানোর দ্বারা ছাহাবাদের উৎসাহ উদ্দীপনার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, মনে হয় তারা নামাজ ভেঙ্গে রাসুলের নূরানী চেহারা অভিমুখী হবেন। আবু বকর (রাঃ) মনে করলেন, হয়তো রাসুল নামাজে আসার খেয়াল করেছেন। তাই তিনি পিছনের দিকে আসতে লাগলেন। রাসুল (সাঃ) ইশারায় নামাজ পড়াতে বললেন। এই নামাজের পূর্ণ ইমামতি আবু বকরই করলেন। (বুখারী মুসলিম)

এরপর রাসুলের উপর আর কোন নামাজের ওয়াক্ত অতিক্রম হয় নাই।

এই অসুস্থতার সময়ে রাসুল (সা:) ফাতেমাকে ডাকালেন এবং ইশারায় কাছে আসতে বললেন। তিনি রাসুল (সা:) এর উপর ঝুঁকে গেলেন। রাসুল (সা:) তার কানে কিছু বললেন। তখন তিনি কেঁদে কেঁদে মাথা উঠালেন। রাসুল (সা:) ইশারায় আবার নিকটবর্তী হতে বললেন। তিনি নিকটবর্তী হলেন, রাসুল কানে কানে কিছু বললেন। এবার ফাতেমা মাথা হেঁসে হেঁসে উঠালেন। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না।

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, আমরা এই দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হলাম। পরবর্তী সময়ে একদিন ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, প্রথমবার তিনি ডেকে কাছে নিয়ে বললেন, আজ আমার জীবনের শেষ দিন। সন্ধ্যার আগেই আমার রবের সাথে মিলিত হবো। একথা শুনে আমার ক্রন্দন এসে গেল। ২য় বার ডেকে বললেন, আমি আমার রবের কাছে দোয়া করেছি আমার পরিবারের মধ্য থেকে তোমাকে যেন প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাৎ করান। ইহা শ্রবণে আমি হাসলাম। (ছহীহ বুখারীতে আয়েশা থেকে বর্ণিত)

ফাতেমা (রা:) রাসুলের কাছে সুসংবাদ পাওয়ার পর তাঁর উভয় সন্তানকে রাসুলের কাছে নিয়ে আসলেন। রাসুল (সা:) উভয়কে আদর করলেন। আর তাদেরকে সম্মান করার ওসীয়ত করলেন। (মাদারিজুন নবুওয়াত)

অতপর স্ত্রীগণকে ডেকে নসীহত করলেন। ঐ দিন রাসুল (সা:) হযরত ফাতিমা (রা:) কে বিশ্বের সকল নারীদের সরদার (سيدة نساء العالمين) হওয়ার সুসংবাদ দিলেন। (বুখারী আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত)

কিছু রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, এই ঘটনা শেষ দিনের নয় বরং শেষ সপ্তাহের।

মৃত্যুযন্ত্রণার অবস্থা

যখন মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হল, তখন রাসুল (সা:) শোয়া অবস্থায় ছিলেন। তাঁর গায়ের উপর একখানা নকশী চাদরও ছিল। ইত্যবসরে হযরত আয়েশার (রা:) ভাই আব্দুর রহমান বিন আবু বকর মিসওয়াক নিয়ে আসলেন।

38

রাসুল (সা:) তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। আয়শা বুঝে ফেললেন, তাই জিজ্ঞাসা করলেন, রাসুলের মিসওয়াকের প্রয়োজন আছে কি? ইশারায় বললেন, হ্যাঁ! তখন আয়শা (রা:) মিসওয়াক চিবিয়ে রাসুলের হাতে দিলেন।

পানির পাত্র রাসুলের মাথার নিকটে ছিল। রাসুল পাত্রে হাত ডুবিয়ে চেহারা মাছেহ করতে লাগলেন। চেহারা মোবারক কখনও লালবর্ণ হত, কখন হলুদবর্ণ হত। হযরত ফাতিমা (রা:) এ অবস্থা দেখে বললেন, আহ, কত কষ্ট! রাসুল (সা:) বললেন, আজকের দিনের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট হবে না ।

(বুখারীতে আনাছ থেকে বর্ণিত, باب مرض النبى صلى الله عَلَيْهِ وسلم)

এই সময় রাসুল (সা:) বললেন,

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَات

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, মৃত্যুতে আছে প্রচুর তিক্ততা।(ছহীহ বুখারী যাকওয়ান থেকে বর্ণিত)

যখনই রাসুল (সা:) কথা বলার শক্তি লাভ করতেন, তখনই বলতেন নামাজ,নামাজ, তোমরা সর্বদা নামাজের প্রতি যত্নবান থাকবে। এই ওসীয়ত শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত করেছেন।

অতপর ছাদের দিকে তাকিয়ে হাত উঠিয়ে বললেন- فِيْ الرَّفِيْقِ الْاَعْلى হে আল্লাহ! আমার মহান প্রভুর সান্নিধ্য চাই।

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, আমি রাসুলকে বার বার বলতে শুনেছি যে, নবীদের রূহ তাদের স্থানকে না দেখিয়ে কবজ করা হয় না। এমনিভাবে দুনিয়া অথবা আখেরাত মধ্য থেকে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার না দিয়ে রূহ কবজ করা হয় না। হযরত আয়েশা (রা:) বললেন, যখন রাসুলের যবান থেকে একথা বের হলفِيْ الرَّفِيْقِ الْاَعْلى তখনই আমি বুঝে নিলাম তিনি এখন আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর প্রভূর সান্নিধ্যে চলে যাওয়াকে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

মোটকথা: রাসুলের জবান মোবারক থেকে এই কথাগুলি উচ্চারিত হচ্ছিল, اَللّٰهُمَّ فِيْ الرَّفِيْقِ الْاَعْلى আর এ অবস্থায় রূহ মোবারক উর্ধ্ব জগতে চলে গেল, আর হাত মোবারক নিচে পড়ে গেল।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ أَفَاِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُوْنَ

এই প্রাণ বায়ু বের হওয়া যার দ্বারা দুনিয়াবাসি নবুওয়াত-রেসালতের বরকত থেকে মাহরূম এবং আল্লাহর ওহীর নূর ও তজল্লী থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়। ১১ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিন দুপুর এবং চাশতের মাঝামাঝি সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। এই সময় রাসুল (সা:) এর বয়স ৬৩ বছর (চন্দ্রমাস হিসাবে) ৪ দিন ছিল। সায়্যিদা ফাতিমাতুয যাহরা (রা:) এই দু:খ-যাতনার সময় বলেছিলেন-

يَا اَبَتَاهُ اَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ- يَا اَبْنَاهُ اِلى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَهُ- يَا اَبْنَاهُ اِلى جِبْرَئِيْلُ نَنْعَاهُ

প্রিয় বাবাজী রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, জান্নাতুল ফেরদাউসে অবতরণ করেছেন, হায় জিব্রাইলকে মৃত্যু সংবাদ কে দিবে? অতপর বললেন, হে প্রভু! ফাতেমার রূহকে মুহাম্মদের কাছে পৌঁছে দাও। আমাকে মুহাম্মাদের সাক্ষাতে আনন্দিত কর। আমাকে এ মুসিবতের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত কর না। এবং মুহাম্মাদ (সা:) এর শাফায়াত থেকে হাশরের দিন বঞ্চিত কর না।

মদীনা মুনাওয়ারায় শোকের ছায়া

এই শোক সংবাদ মানুষের কাছে যখন পৌঁছল, তখন মনে হল যেন কিয়ামত এসে গেছে। খবর শুনামাত্র ছাহাবায়ে কেরাম দিশেহারা হয়ে গেলেন। গোটা মদীনা আহাজারিতে ছেয়ে গেল। যে কেউ এই হৃদয়স্পর্শী সংবাদ শুনত সাথে সাথে অস্থির-পেরেশান হয়ে যেত। যিন্-নুরাইন ওসমান গনী (রা:) বাকশক্তি হারিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইলেন।

হযরত আলী (রা:) এর অবস্থা ছিল এমন যে, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

হযরত আয়েশা (রা:) ও অন্যান্য পবিত্রতমা স্ত্রীগণের উপর যাতনার যে পাহাড় আপতিত হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) অস্থিরতায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

40

হযরত উমর (রা:) এর অস্থিরতা-পেরেশানী ছিল সবার থেকে বেশি। তিনি তলোয়ার বের করে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, মুনাফিকদের একমাত্র ধারণা হলো রাসুল (সা:) ইন্তেকাল করেছেন। আসল কথা হল, রাসুল ইন্তেকাল করেননি, বরং তিনি তাঁর প্রভুর নিকটে গেছেন। যেভাবে মুসা (আ:) তূর পর্বতে আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে এসেছিলেন। আল্লাহর শপথ, তিনিও এভাবে ফিরে আসবেন। আর মুনাফিকদেরকে মুলোৎপাটন করবেন। হযরত উমরের নাঙ্গা তলোয়ার আর ক্রোধের কারণে কারো সাহস হচ্ছিল না রাসুল (সা:) ইন্তেকাল করেছেন একথা বলার।

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা:) রাসুলের ইন্তেকালের সময় রাসুলের কাছে ছিলেন না। রবিবার দিন রাসুলের প্রশান্তি দেখে তিনি রাসুলকে বললেন, আল্লাহর শোকর! আপনাকে আজ প্রশান্ত দেখা যাচ্ছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে একটু বাড়ি যাব। রাসুল (সা:) তাঁকে অনুমতি দিলেন। আবু বকর (রা:) বাড়িতে চলে গেলেন। তাঁর বাড়ী মদীনা থেকে এক মাইল দুরত্বে অবস্থিত। তিনি যখন এই মর্মান্তিক সংবাদ পেলেন। তখন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মসজিদে নববীর দিকে অত্যান্ত বিষণ্ন মনে রওয়ানা হন। মসজিদে নববীর সামনে ঘোড়া থেকে নেমে হুজরা শরীফের দিকে গমন করলেন। আয়েশা রা. অনুমতিক্রমে ভিতরে প্রবেশ করলেন। রাসুল (সা:) বিছানা মোবারকের মধ্যে ছিলেন, আর সকল স্ত্রীগণ তাকে ঘিরে বসে আছেন। আবু বকরের আগমনে আয়েশা ছাড়া বাকি সকলই চেহারা ঢেকে পর্দা করলেন। আবু বকর (রা:) রাসুলের চেহারা মোবারকের উপর থেকে চাদর সরিয়ে কপালে চুমু খেলেন। এবং ক্রন্দন করতে শুরু করলেন।

আবু বকরের অস্থিরতা ও দৃঢ়চিত্ততা

আবু বকর ছিদ্দিক (রা:) তখন তিন বার বললেন-

’وَا صَفِيَّاهْ ’وَا خَلِيْلَاه ’وَا نَبِيَّاه এমতাবস্থায় চোখের পানি বেয়ে বেয়ে রাসুলের চেহারার উপর গিয়ে পড়ছে। আর বলতে থাকলেন, আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক। খোদার কসম, আপনি আর ২য় বার মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন

করবেন না। আপনার জন্য যে মৃত্যু অবধারিত ছিল তা হয়ে গেছে। আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি জীবন মরণ উভয় অবস্থায় পবিত্র। আপনার মৃত্যুতে নবুওয়্যাত ও ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে যা অন্য কোন নবীর মৃত্যুতে বন্ধ হয়নি। আপনি মহাজ্ঞানী যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। আপনি শোক প্রকাশ করা হতে অমুখাপেক্ষী। আপনার মৃত্যু দ্বারা মানুষ প্রশান্তি অর্জন করবে। (অর্থাৎ যখন মানুষ কোন মুসিবত দ্বারা আক্রান্ত হবে তখন আপনার বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে স্বরণ করলে, তা তাকে সেই মুসীবতের পেরেশানী থেকে মুক্তি দিবে।) আবার আপনি সাধারণ লোক এ হিসাবে যে, আমরা সকলে আপনার দু:খ যাতনার সমান। যদি আপনার মৃত্যু আপনার ইচ্ছাধীন না হতো (এ হিসাবে যে, আল্লাহ আপনাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু আপনি আখিরাত গ্রহণ করেছেন) তাহলে আমরা আপনার মৃত্যুর বদলা হিসাবে আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করতাম। যদি আপনি আমাদেরকে অধিক কান্নাকাটি থেকে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমরা আমাদের চোখের পানি কেঁদে কেঁদে শেষ করতাম।

তবে দুটি বস্তু এমন যা সরানো সম্ভব নয়। ১. বিচ্ছেদের যাতনা ২. দু:খ যাতনায় শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হওয়া। এই দুটি জিনিস একটি অপরটির মিত্র। একটা অপরটা থেকে পৃথক হয় না।

হে আল্লাহ, আমাদের এই অবস্থা আমাদের নবীর কাছে পৌঁছে দাও। হে মুহাম্মদ (সা:), আমরা আশেকদেরকে আল্লাহর দরবারে স্বরণ রাখিও। আশা রাখি, আমরা আপনার হৃদয়ের কল্পনায় থাকব। যদি আপনি আপনার সাহচর্য ও বরকত দ্বারা আমাদের অন্তরে প্রশান্তি না রেখে যেতেন, তাহলে আপনার বিচ্ছেদকে সহ্য করতে পারতাম না। এসব কথা বলে তিনি হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে দেখলেন, হযরত উমর (রা:) অত্যান্ত ক্রোধান্বিত। আবু বকর (রা:) বললেন, রাসুল (সা:) ইন্তেকাল করেছেন। হে উমর! তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শুন নি, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ (অর্থাৎ আপনি মৃত্যুবরণ করবেন, তারাও মৃত্যুবরণ করবে) এবং এ আয়াতও وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (অর্থাৎ আপনার পূর্বে কোন লোককে চিরস্থায়ী রাখিনি)। এই কথা শুনার পর সকল মানুষ উমর (রা:) কে ছেড়ে আবু বকর (রা:) এর পাশে জড়ো হল।

42

হযরত আবু বকর (রা:) এর ভাষণ

যখন লোকেরা জড়ো হলো, আবু বকর (রা:) মিম্বরের দিকে অগ্রসর হয়ে উচ্চ আওয়াজে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, সবাই নিরব হয়ে বস! সকলেই বসে পড়ল। ছিদ্দিকে আকবর (রা:) হামদ-ছানা পাঠ করে এই খুতবা পাঠ করলেন-

اَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَأِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَأِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ قَالَ اللهُ تَعَالى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ' أَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْأً وَسَيَجْزِىَ اللهُ الشَّاكِرِيْنَ

হামদ ও সালাতের পর, তোমাদের মধ্য থেকে যে আল্লাহর ইবাদত করে সে যেন জেনে নেয়, নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু নাই। আর যে মুহাম্মাদের ইবাদত করে সে যেন জেনে নেয়, মুহাম্মাদ (সা.) মারা গিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। তার পূর্ববর্তী সকল রাসুল গত হয়ে গেছেন। অতপর যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা শহীদ হন তাহলে তোমরা কি ধর্ম বিমূখ হয়ে যাবে! যে ধর্ম বিমূখ হয়ে যাবে সে কষ্মিনকালেও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

আবু বকর (রা:) এর এই বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যা তিনি ব্যথিত হৃদয় গ্রস্থ উম্মতকে সান্তনা দেওয়ার জন্য ইসলামী ইতিহাসের এক ক্রান্তি লগ্নে দিয়েছিলেন। (পুর্ণ বক্তব্য নিম্নে প্রধান করা হলো)

আবু বকর (রা:) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ তার নবীর সাথে কৃত সকল অঙ্গিকার পূর্ণ করেছেন। তিনি তার সম্মানিত বান্দাকে সাহায্য করেছেন আর কাফিরদেরকে পরাজিত করেছেন। অতএব সকল প্রশংসা সেই একক লা-শরিক সত্ত্বার। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসুল এবং আখেরী নবী। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কুরআন আল্লাহর কালাম, তা তেমনি বিদ্যমান যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। নাযিলকৃত ধর্ম সেভাবে বিদ্যমান যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। হাদিছ এমনি সংরক্ষিত আছে যেভাবে রাসুল (সা:) এর পবিত্র জবান থেকে বের হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ সত্য। সত্যকে তিনি প্রকাশকারী। হে আল্লাহ, আপনি আপনার বিশেষ বান্দা রাসুল,নবী, বিশ্বাসী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী মুহাম্মাদ (সা:) এর

43

উপর রহমত বর্ষণ করুন। যেভাবে আপনি আপনার বিশেষ বান্দাদের উপর বর্ষণ করেছেন।

হে আল্লাহ! আপনি রহমত-বরকত নাযিল করুন সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবিয়্যিন, কল্যাণের পথপ্রদর্শক রাসুলের উপর। হে আল্লাহ! তাঁর সান্নিধ্যতা বাড়িয়ে দাও। তাঁর দলিল-প্রমাণকে মহান করে দাও। তাঁর মাকামকে সম্মানিত কর। তাঁকে মাকামে মাহমুদে আসীন কর। যার উপর পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলে ঈর্ষা করবে। কিয়ামতের দিন তাঁর মাকামে মাহমুদ (মাকামে শাফায়াত) থেকে আমাদেরকে উপকৃত কর। দুনিয়া আখেরাতে তাঁর উছিলায় আমাদের উপর রহমত বর্ষণ কর। তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান কর।

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে ইব্রাহিম (আ:) ও তার পরিবারবর্গের উপর করেছ। নি:সন্দেহে আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত। হে লোক সকল, তোমাদের মধ্য থেকে যে মুহাম্মদ (সা:) এর ইবাদত কর, সে যেন জেনে নেয় মুহাম্মাদ (সা:) মারা গেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করে, সে যেন জেনে রাখে আল্লাহ চিরঞ্জীব; তার মরণ নেই। রাসুল (সা:) মারা যাবেন তা আল্লাহ আগেই বলে রেখেছেন, সুতরাং ঘাবড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নবীর সোহবতকে পছন্দ করেছেন। তাইতো তাঁকে সম্মানের ঘরের দিকে ডেকে নিয়েছেন। রাসুলের পরে কুরআন ও রাসুলের সুন্নাতকে তোমাদের কাছে অবশিষ্ট রেখেছেন। অতএব যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে, সে সত্যকে পরিচয় করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাতের মধ্যে বিভাজন করবে (কুরআন মানবে; সুন্নাত মানবে না) সে সত্যকে চিনতে পারবে না।

হে ঈমানদারগন! তোমরা সত্য ও ন্যায় পরায়ণতাকে প্রতিষ্ঠাকারী হও। নবীর মরণের কারণে অভিশপ্ত শয়তান যেন তোমাদেরকে সত্য থেকে বিচ্যুত না করে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ার আগে নেককাজকে দ্রুত কর। নেককাজে প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হয়ে শয়তানকে লাঞ্ছিত কর। তাকে তোমাদের সাথে মিশে গুণাহে লিপ্ত করার সুযোগ দিওনা।

আল্লাহ তার নবীকে সম্বোধন করে বলেন, নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণকারী, তারাও মৃত্যুবরণকারী। আল্লাহর সত্তা ছাড়া সবকিছু ধ্বংসশীল। প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী। কিয়ামতের দিন সকলেই কর্মের পূর্ণ প্রাপ্য পাবে।

তিনি আরো বললেন যে, আল্লাহ তার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা, তার বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত রাসুলকে জীবন দিয়ে পৃথিবীতে রেখেছেন। তারপর তার কাছে ডেকে নিয়ে গেছেন। আর রাসুল (সা:) তোমাদেরকে একটি সঠিক রাস্তায় উঠিয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এবার যে পথভ্রষ্ট হবে সে সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর পথভ্রষ্ট হল। সুতরাং যে আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে, সে যেন জেনে রাখে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তার কখনও মৃত্যু নাই। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা:) এর ইবাদত করছিল, তাকে খোদা হিসাবে মানতো সে যেন জেনে রাখে, তার খোদা মারা গেছেন।

হে লোক সকল, আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহর দ্বীনকে মজবুত করে ধর। নিজের প্রভুর উপর ভরসা কর। নিশ্চয় আল্লাহর দ্বীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ ওয়াদা পূর্ণকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয়দানকারী, সাহায্যকারী। আল্লাহর কিতাব আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। এটাই হল হেদায়েতের আলো ও আত্মার চিকিৎসা। এটা দ্বারাই মুহাম্মদ (সা:) পথ পদর্শন করেছেন এবং এতে রয়েছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হালাল-হারামের আলোচনা।

আল্লাহর কছম, আমরা ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে সামান্যতম পরোয়া করি না, যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। (একথা দ্বারা ধর্মত্যাগীদের প্রতি ইশারা করেছেন) নিশ্চয় আল্লাহর তরবারি যা আমাদের হাতে আছে,তা আল্লাহর দুশমনের উপর শানিত হবে। এই তলোয়ার এখনো আমরা হাত হতে রাখি নি।

আল্লাহর কছম, আমরা আমাদের দুশমনের বিরুদ্ধে এখনো এভাবে জিহাদ চালিয়ে যাব, যেভাবে রাসুলের সাথে থেকে করেছি। অতএব দুশমনরা যেন ভাল করে বুঝে নেয়, যাতে নিজের উপর অত্যাচার না করে।

(সিরাতে মুস্তাফা- ইদ্রীছ কান্দলভী, আল-বিদায়া ওয়ান্নেহায়া ৫ম খণ্ড ২৪৩০ পৃষ্টা, যুরকানী ৮ম খণ্ড ২৮০পৃষ্টা, ইতহাফ শরহে ইয়াহউল উলুম ৩০২পৃষ্টা, আর-রাউজুল উনুফ ২য় খণ্ড ৩৭৬ পৃষ্টা)

আবু বকর ছিদ্দিকের কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের দ্বারা সকলের পেরেশানী দূর হয়ে গেল। চোখ থেকে গাফলতির পর্দা উঠে গেল। সবার বিশ্বাস হয়ে গেল রাসুল ইন্তেকাল করেছেন। এ সময়ের অবস্থা এমন মনে হল, যেন এ আয়াত কেউ আগে শুনেনি। (যুরকানী ও তাবকাতে ইবনে সাআদ)

হযরত উমর (রা:) বলেন, আমার অবস্থাও এমন হল যে, আমি এ আয়াতগুলো যেমন আজই পড়লাম এবং নিজের ধারণা থেকে ফিরে এলাম। (তাফসীরে কুরতুবী ৪র্থ খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা।)

গোসল ও কাফন-দাফনের প্রস্তুতি

সাহাবায়ে কেরাম যখন রাসুল (সা:) কে গোসল করানোর জন্য জমায়েত হলেন তখন প্রশ্ন উদ্রেক হল, রাসুলের পরিধানের কাপড় খোলা হবে কিনা? এ ব্যাপারে কোন ফয়ছালা হচ্ছে না, এমতাবস্থায় সকলের তন্দ্রা এসে গেল। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনা গেল যে, আল্লাহর রাসুলকে কাপড়সহ গোসল দাও। সুতরাং কাপড়সহ গোসল দেওয়া হল। পরে খোলে নেওয়া হল।

হযরত আলী (রা:) গোসল করালেন, আর আব্বাস (রা:) এর উভয় ছেলে ফজল ও কাসিম (রা:) পার্শ্বপরিবর্তন করেছিলেন, আর উছামা ও শাকরান (রা:) পানি ঢেলে দিয়েছেন। (আল-বিদায়া ৫ম খণ্ড ২৬০ পৃষ্টা)

গোসলের পর সুহুল দ্বারা নির্মিত তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন পরানো হল। কাফনের মধ্যে কামিছ এবং আমামা ছিল না। আর যে কাপড়ে গোসল দেওয়া হয়েছিল তা খোলে নেওয়া হল। (ইতহাফ খণ্ড ৪০ পৃষ্টা ৩০৪)

কাফনের পর আবার প্রশ্ন দেখা দিল, কোথায় দাফন করা হবে। তখন ছিদ্দিকে আকবর রা. বললেন, আমি রাসুলকে বলতে শুনেছি পয়গাম্বরগণের রূহ যেস্থানে কবজ করা হয় সেখানে দাফন করা হয়। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

সুতরাং রাসুল যেখানে ইন্তেকাল করেছেন সেখানেই বিছানা সরিয়ে কবর খনন করা হলো। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন দেখা দিল, কোন রকমের কবর খনন করা হবে। মুহাজিরিন সাহাবিগণ বললেন, মক্কা শরীফের নিয়মানুযায়ী বগলী কবর খনন করা হোক । আনসাররা বললেন, মদীনার নিয়মানুযায়ী লাহাদ কবর তৈরী করা হোক। হযরত আবু উবায়দা (রা:) বগলী কবর আর আবু তালহা (রা:) লাহাদ খননে পারদর্শী ছিলেন। এবার তাদের উভয়জনকে ডাকা হলো। নির্ধারীত হল, যে আগে আসবে তিনি তার জানা মোতাবেক খনন করবেন।

46

সুতরাং আবু তালহা প্রথমে এসে পৌঁছলেন। তাই তিনি রাসুলের জন্য লাহাদ কবর তৈরি করলেন।
(যুরকানী খন্ড ৮ পৃষ্টা ২৮৯-২৯২* তাবকাতে ইবনে সাআদ খন্ড ২ পৃষ্টা ৫৯-৬৮)

জানাযার নামাজ

রাসুল (সা:) যেখানে ইন্তেকাল করেছেন সেখানেই তাঁর লাশ রাখা হল। জানাযার নামাজ প্রথমে পরিবারের লোকেরা, তারপর মুহাজিরিন, তারপর আনসারগণ পড়লেন। প্রথমে পুরুষগণ, তারপর নারীগণ, তারপর ছোট বাচ্চারা পড়ে। এই নামাযে কোন ইমাম ছিলেন না। হুজরা মোবারক ছোট ছিল বিধায় দশ জন দশ জন করে প্রবেশ করে নামাজ পড়ে বাহির হয়ে আসতেন।
এ ধারাবাহিকতা দিন রাত চালু রইল, বিধায় দাফন মোবারক মারা যাবার প্রায় ৩২ ঘন্টা পর বুধবার অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আলী, আব্বাস এবং তাঁর ২ ছেলে ফজল ও কাসেম (রা:) রাসুল (সা:) কে কবরে নামান। দাফন থেকে অবসর হওয়ার পর কবর মুবারক কুঁজের আকৃতিতে তৈয়ার করা হল এবং পানি ছিটানো হল। اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (তাবকাতে ইবনে সাআদ খণ্ড-২ পৃষ্টা-২৯২)
সাহাবায়ে কেরাম যখন দাফন থেকে অবসর হলেন, তখন হযরত ফাতেমা (রা:) আনাছ (রা:) কে বললেন, হে আনাছ! তোমরা কি আনন্দের সাথে রাসুলের কবরে মাটি নিক্ষেপ করেছ? আবু বকর (রা:) বললেন,
আমি যখন রাসুলকে কবরে দেখলাম তখন জমিন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে সংকীর্ণ মনে হল। আমি পাগলের ন্যায় হয়ে গেলাম। আমার হাড্ডিগুলো দূর্বল হয়ে ভাঙ্গা শুরু করল। (তারপর তিনি নিজেকে বললেন, হে আমার নফস, তোমার জন্য আক্ষেপ! তোমার প্রিয়তম মাটির গর্ভে চলে গেছেন, কিন্তু তুমি একা রয়ে গেলে। (তারপর রাসুলকে লক্ষ করে বললেন) হে আমার সাথী! যদি আপনার মৃত্যুর আগে আমি কবরে চলে যেতাম আর আমাকে পাথর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হত! (রাহমাতুল্লিল আলামীন কাজী সুলায়মান মানসুরপুরী পৃষ্টা-২৫৫, সিরাতে মুস্তাফা ২০৪-২২২ পৃষ্টা)

47

হযরত আবু বকর (রা:)

হযরত আবু বকর (রা:) এর খেলাফত কাল মাত্র সোয়া দু'বছর ছিলো। এই অল্প সময়ে মিথ্যা নবুওয়াত দাবীদার, মুরতাদ, যাকাত অস্বিকারকারীদের মুলোৎপাঠনের পর বিজয়ের শুরুতেই তাঁর বিদায়ের বার্তা পৌঁছে গেল।
হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, একদিন অত্যান্ত ঠান্ডার মৌসুমে তিনি (রা:) গোসল করলেন। গোসলের পর তার জ্বর এসে গেল, ধারাবাহিক ১৫ দিন পর্যন্ত অধিক কষ্টের মধ্যে কাটালেন। এসময় তিনি মসজিদে আসতে অপারগ হয়ে গেলেন। তাঁর আদেশে হযরত উমর (রা:) ইমামতির দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

খলিফা নির্ধারণ

অসুস্থতা যখন দিন দিন বাড়তে থাকল। সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কমতে লাগল। তখন সাহাবায়ে কেরামদেরকে ডেকে খলিফা বানানোর ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। পরামর্শক্রমে উমর (রা:) এর নাম আসল।
হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা:) বললেন, উমর (রা:) খলিফা হতে কারো কি কোন সংশয় থাকতে পারে, অথচ তিনি কত কঠোর লোক ছিলেন?
হযরত উছমান (রা:) বলেন, আমার ধারণা মতে উমরের ভিতরগত অবস্থা বাহ্যিক থেকে ভাল। কিন্তু কিছু সাহাবী উমরের কঠোর স্বভাবের কারণে কানাঘুষা করছিলেন। তাই হযরত তালহা (রা:) আবু বকরের সামনে বসে অভিযোগস্বরূপ বললেন, আপনি উমরকে খলিফা বানাতে চান, অথচ তিনি আপনার সামনে কত কঠোর ছিলেন। এবার ভবিষ্যতে কেমন হবেন আল্লাহই জানেন।
আবু বকর (রা:) জবাবে বললেন, যখন তাঁর উপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হবে তখন সে নম্র হয়ে যাবে। এমনিভাবে আরেকজন ছাহাবী আবু বকরকে বললেন, উমরের কঠোরতার কথা আপনার জানা থাকা সত্ত্বেও তাকে খলিফা মনোনয়ন করলেন! আপনি চিন্তা ফিকির করুন। আপনি আল্লাহর কাছে গিয়ে কি জবাব দিবেন?
আবু বকর (রা:) জবাব দিলেন। আমি আল্লাহকে বলব, হে প্রভূ! তোমার বান্দাদের মধ্য উত্তম বান্দাকে আমি নির্বাচন করেছি।

48

মোটকথা: তিনি সবাইকে সান্তনা দিলেন।
আর হযরত উছমান (রা:) কে ডেকে খেলাফতের অঙ্গিকারনামা লিখাতে শুরু করেন। প্রথম শব্দ লিখার সাথে সাথে আবু বকর (রা:) বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হযরত উছমান (রা:) এ অবস্থা দেখে উমরের নাম নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে লিখে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে আসল। তখন উছমান (রা:) কে বললেন, অঙ্গিকারনামা পড়ে শুনাও। তিনি পড়তে শুরু করলেন। তখন আবু বকর (রা:) আল্লাহু আকবার বলে আওয়াজ দিয়ে উঠলেন। আর বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। তুমি আমার মনের কথা লিখেছ। অঙ্গিকারনামা পূর্ণ হওয়ার পর তাঁর গোলামকে ডেকে সমবেত সকলের মধ্যে শুনিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর নিজে ঘরের ছাদে যেয়ে সবাইকে লক্ষ করে বললেন, আমি আমার নিকটাত্মীয়কে খলিফা নির্ধারণ করি নাই। বরং তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে বানানো হয়েছে।
উপস্থিত সবাই এই মনোনয়নের উপর سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا বলে উঠলেন। তারপর আবু বকর (রা:) হযরত উমরকে ডেকে অত্যান্ত উপকারী কিছু নছিহত করলেন, যা তার সফল খেলাফতের জন্য উত্তম সংবিধান হিসাবে গণ্য হল। (তাবকাতে ইবনে সাআদ ১ম খণ্ড পৃষ্টা-৩, ওসিরতে আবু বকর (রা:) পৃষ্টা-৪২)

আবু বকর (রা:) কর্তৃক উমর (রা:) কে ওসিয়ত

আবু মালিহ বলেন, আবু বকর (রা:) উমর (রা:) কে বললেন, আপনি আমার ওসিয়ত গ্রহণ করেন। আমি আপনাকে ওসিয়ত করছি যে, আল্লাহ তায়ালার কিছু হক আছে যা রাতে গ্রহণ হয়; দিনে গ্রহণ হয় না, আর কিছু হক আছে যা দিনে গ্রহণ হয়; রাতে হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত ফরজ আল্লাহর দরবারে কবুল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নফল কবুল হবে না। যারা সত্যের অনুসরণ করবে পরকালে তাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে। মিজানের মধ্যে সত্য রাখা হলে তা ভারী হওয়া স্বতঃসিদ্ধ কথা। আর যারা অন্যায়ের পথ অনুসরণ করবে, তাদের পাল্লা হবে হালকা। দুনিয়াতেও অপরাধ তাদের কাছে হালকাই মনে হবে। আর মিজানের ক্ষেত্রে নীতি হল, তাতে অন্যায় রাখা হলে তা হালকা হয়।
আল্লাহ তায়ালা জান্নাতবাসির আলোচনা তাদের উত্তম আমল দ্বারা করেছেন। আর তাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। আর জাহান্নামিদের আলোচনা তাদের

49

মন্দ কর্ম দ্বারা করেছেন। তারা যে নেক আমল করেছে তা তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, গ্রহণ করেন নাই।

তুমি কি চিন্তা করে দেখ না, আযাব সংক্রান্ত আয়াত নাযিলের পাশাপাশি আশা সঞ্চারমূলক আয়াতও নাযিল করেছেন। আবার আশারবাণীর সাথে ভীতি সঞ্চারমূলক বাণীও নাযিল করেছেন, যাতে বান্দার মধ্যে ভয়-আশা উভয়টি বিদ্যমান থাকে। এবং নিজেকে সে ধ্বংসের মধ্যে না ফেলে, সে যেন আল্লাহর প্রতি অবিচারের আশা না রাখে।

হে উমর! যদি তুমি আমার ওসিয়ত স্বরণ রাখ, তাহলে কোন অদৃশ্য বস্তু তোমার মৃত্যু থেকে অধিক প্রিয় হবে না। আর মৃত্যু অবশ্যই আগত। আর যদি আমার এই ওসিয়ত বিনষ্ট করে দাও, তাহলে কোন অদৃশ্য বস্তু মৃত্যু থেকে অধিক খারাপ মনে হবে না। আর মৃত্যু তো অবশ্যই আগত। তা থেকে তুমি পলায়ন করতে পারবে না।

হযরত সায়িদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ:) বলেন, যখন আবু বকর (রা:) এর মৃত্যু নিকটবর্তী হয়ে গেল তখন তাঁর কাছে থাকা কিছু সাহাবী বললেন, আমাদেরকে কিছু নসিহত করুন। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি আপনার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

তিনি বললেন, যে ঐ কালিমা পাঠ করে মারা যাবে আল্লাহ তার রূহকে ‘উফুকে মুবীনে’ পৌঁছে দিবেন।

লোকেরা বলল, উফুকে মুবীন কি?

তিনি বললেন, আরশের সামনের এক ময়দান। তাতে রয়েছে বাগান, নহর, গাছগাছালি। প্রত্যেক দিন আল্লাহর একশত রহমত তা ঢেকে নেয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই কথাগুলো পাঠ করবে, উল্লেখিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিবেন। হে আল্লাহ! তুমি প্রথমে মানবকে সৃষ্টি করেছ, কিন্তু এতে আপনার প্রয়োজন নিহিত নেই। অতপর গোটা সৃষ্টিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছ। একদল জান্নাতি, আরেক দল জাহান্নামি। সুতরাং আপনি আমাকে জান্নাতিদের অন্তর্ভূক্ত কর। জাহান্নামিদের অন্তর্ভূক্ত করনা।

হে প্রভু! তুমি সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টির প্রারম্ভে কয়েক দলে বিভক্ত করেছ। সৃষ্টির শুরুতেই তাদের পৃথক করে দিয়েছ। কাউকে পাপী, কাউকে নেককার

বানিয়েছ। সুতরাং আমাকে আপনার অনুগত্যের দ্বারা সৌভাগ্যবান কর। আপনার নাফরমানির মাধ্যমে হতভাগা বানিও না।
হে আল্লাহ! প্রত্যেক ব্যক্তি কতটুকু উপার্জন করবে, তা সৃষ্টি থেকে তুমি জ্ঞাত, মানুষ যা কিছু করে তা তোমার জ্ঞানের বাহিরে নয়। আমাকে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত কর, যাদের কাছ থেকে আপনি নেককাজ গ্রহণ করবেন।
হে প্রভু! আপনার পছন্দের বাহিরে কিছুই চাইনা, সুতরাং আমার আত্মাকে এমন কর্মে লাগিয়ে দাও, যা আমাকে আপনার কাছে নিয়ে দেয়।
এই ওসিয়ত থেকে অবসর হয়ে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে দৃষ্টি দিলেন। হযরত আয়শাকে মদীনা অথবা বাহরাইনের আশপাশ এলাকায় একখন্ড রাষ্ট্রিয় ভুমি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হল যে, এর দ্বারাতো অন্যান্য ওয়ারিশদের হক ক্ষুণ্য করা হল। তাই তিনি বললেন, হে আমার কলিজার টুকরা, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় তুমি আমার কাছে প্রিয় ছিলে। যে জায়গা আমি তোমাকে দান করেছি, তাতে তুমি তোমার ভাই বোনকে অংশীদার করবে কি?
হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্মতি জানালেন, তখন আবু বকর (রাঃ) বায়তুল মালের ঋণ আদায়ের জন্য ওসিয়ত করলেন। বললেন যে, আমার কাছে মুসলমানদের সম্পদের মধ্য থেকে একটি বাদী ও দুটি উট ছাড়া আর কিছুই নাই। আমার মরনের সাথে সাথে তা উমরের কাছে পৌঁছে দিবে।
সুতরাং এই সকল মাল উমরের কাছে পৌঁছানো হল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আব্বাজান এই ওসিয়তও করেছেন যে, আমার কাফন দাফনের পর ভাল করে দেখে নিও, ঘরের মধ্যে আর কোন সম্পদ রয়ে গেল কি না? যদি থাকে তাও উমরের কাছে পৌঁছে দিবে।
দাফনের পর ঘরে তালাশ করে আর কোন জিনিস পাওয়া গেল না।

বিদায়ী সাক্ষাৎ

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) এর সেবার জন্য আসলেন। বললেন, হে আবু বকর! আমাদেরকে কিছু নসিহত করুন।
আবু বকর (রাঃ) বললেন, তোমরা দুনিয়াকে বিজয় করবে। সুতরাং দুনিয়া থেকে প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করবে। স্বরণ রেখ, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ

পড়ল, সে আল্লাহর অঙ্গিকারনামায় প্রবেশ করল। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার ভঙ্গ করে, উল্টোমূখী হয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ হইওনা। এই কালেমাগুলোর অনুবাদ হল:

হে প্রভু, বান্দার প্রত্যেকটি নড়াচড়ার হিসাব আপনি করে রাখেন। কোন কিছুই আপনার অনুমতি ছাড়া নড়াচড়া করে না। সুতরাং তুমি আমার প্রত্যেকটা নড়াচড়া তাক্বওয়ার ভিতর দিয়ে করে দাও। প্রভু, আপনি ভাল মন্দ উভয়টি সৃষ্টি করেছেন, আবার ভালো-মন্দ কর্মশীলকে সৃষ্টি করেছ। সুতরাং এ দুই দলের যে দল ভাল, আমাকে তার অন্তর্ভূক্ত করে দাও।

প্রভু, আপনি জান্নাত জাহান্নাম উভয়টি সৃষ্টি করেছেন, তার বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। আমাকে জান্নাতবাসির অন্তর্ভূক্ত করে দাও।

প্রভু, আপনি একটি জাতির অন্তরকে হেদায়াতের জন্য উন্মুক্ত করেছ; আবার আরেকটি জাতির অন্তরকে হেদায়াতের বেলায় সংকীর্ণ করে দিয়েছ। সুতরাং হে প্রভু, আমার অন্তরকে ঈমানের জন্য খুলে দাও। ঈমানকে আমার অন্তরে পছন্দনীয় করে দাও। কুফর, শিরক, গুণাহ ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা অন্তরে ঢেলে দাও। আমাকে নেককার দলের অন্তর্ভূক্ত করে নাও।

প্রভু, আপনি সব কিছু পরিচালনা করেন, সবকিছু আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল। সুতরাং মৃত্যুর পর আমাকে উত্তম জীবন দান কর। এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে আপনার নৈকট্যশীল করে দাও।

হে প্রভু, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আপনার উপর ভরসাবিহীন অতিক্রান্ত করে, আমাকে তার অন্তর্ভূক্ত না করে আপনার উপর ভরসাকারী বানাও।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

অতপর বললেন, এসব বিষয় আল্লাহর কিতাবে আছে।

(এহয়াউল উলুম উর্দূ তরজমা ৪র্থ খণ্ড, ৬৭২ পৃষ্টা)

কাফনের ব্যাপারে বললেন, যে কাপড় এখন পরনে আছে তা ধৌত করে অন্য কাপড়ের সাথে মিলিয়ে নিবে।

আয়েশা (রা:) বললেন, পরনের কাপড়তো পুরাতন, কাফনের জন্য নতুন কাপড় হওয়া উচিত। উত্তরে তিনি বললেন, জীবিতরা মৃতদের তুলনায় নতুন কাপড়ের অধিক হকদার। আমার জন্য এই পুরাতন কাপড়ই যথেষ্ট।

পরলোক গমন

মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেলে হযরত আয়েশা (রা:) কাছে এসে এই কবিতা আবৃত্তি করলেন। তোমার জীবনের কছম, শ্বাস যখন দীর্ঘায়িত হয় এবং বক্ষ সংকীর্ণ হয় তখন মানুষের সম্পদ কোন কাজে আসে না।

হযরত আবু বকর (রা:) তা শুনে চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বলেন, এমন বল না; বরং এভাবে বল لَقَدْ جَاءَتْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ অর্থ: মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যসহ আগমন করেছে। এই মৃত্যুই আসল যা থেকে তুমি পলায়ন করতে।(মিনহাজুল কাসিদিন)

যখন শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন তখন আয়েশা (রা:) কাঁদতে লাগলেন। আবু বকর (রা:) বললেন, বেটি! তুমি কেঁদো না। আয়েশা বললেন, আপনার মরণের সময় যদি ক্রন্দন না আসে তাহলে কার মরণে ক্রন্দন আসবে? আবু বকর (রা:) বললেন, এই মুহুর্তে আমার প্রাণ বাহির হওয়ার চাইতে অধিক প্রিয় আর কারো প্রাণ বাহির হওয়া নয়। এমন কি মাছির প্রাণ বাহির হওয়া আমার প্রাণ বাহির হওয়ার চাইতে প্রিয় নয়। (মৃত্যু যেহেতু আমার কাছে প্রিয় তাহলে তুমি কিসের উপর কাঁদবে?)

তারপর বললেন, হ্যাঁ! ভয় হল এ ব্যাপারে যে, মরণের সময় ইসলাম চলে যায় কিনা? অতপর বললেন, আজ কোন দিন? আয়েশা (রা:) বললেন, সোমবার। তখন বললেন, আমার আশা আজ রাতই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। তাঁর শেষ আশা পূর্ণ হল।

সোমবার দিন শেষ হওয়ার পর মঙ্গলবার রাত ৬২ বছর বয়সে ১৩ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে এই ধরা ত্যাগ করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

দাফন-কাফন

ওসিয়ত অনুযায়ী রাতের বেলায় দাফন-কাফনের প্রস্তুতি নেওয়া হল, তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইছ (রা:) গোসল দিলেন। উমর (রা:) জানাযার নামাজ পড়ালেন। হযরত উছমান, তালহা, আ: রহমান ইবনে আবু বকর, হযরত উমর কবরে নামালেন। রাসুল (সা:) এর পার্শ্বেই তাঁর জীবনসাথি শায়িত হয়ে চিরস্থায়ী সঙ্গগ্রহণ করে জান্নাতে পৌঁছলেন। (তবকাতে ইবনে সাদ, খোলাফায় রাশিদিন ৫৩-৫৫)

হযরত উমর (রা:) এর হত্যাকাণ্ড

উমর (রা:) তার জীবনের শেষ হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সাবে মাথার নিচে চাদর রেখে শুয়ে পড়লেন। চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তাঁর কাছে চাঁদের জ্যোতি খুবই ভালো লাগল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, এই চাঁদ প্রথমে চিকন ছিল, তারপর ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করেছে। আবার হ্রাস হওয়া শুরু হবে। এই অবস্থা শুধু চাঁদের নয় বরং গোটা পৃথিবীর একি অবস্থা।

অতপর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার দায়িত্ব বেড়ে গেছে আর আমি দূর্বল হয়ে পড়েছি। হে আল্লাহ! রাষ্ট্র পরিচালনায় আমার থেকে কিছু ত্রুটি হওয়ার আগে আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে নাও।

মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছার একদিন পর তাঁর রুটিন অনুযায়ী রাত্রির শেষপ্রহরে মসজিদে গেলেন। তাঁর হাতে একটি চাবুক থাকত। যার দ্বারা লোকদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করতেন। মসজিদে পৌঁছে এই চাবুক দ্বারা নামাজের কাতার সোজা করার নির্দেশ দিতেন। তারপর নামাজ শুরু করতেন। আর নামাজে লম্বা লম্বা সুরা পড়তেন।

এ দিনও তিনি এরূপ করলেন। যখন নামাজ শুরু করলেন। সবেমাত্র তাকবীরে তাহরিমা বলছেন, এ সময় মুগীরা (রা:) এর গোলাম অগ্নিপূজক কাফির আবু লুলু, সে বিষ মিশ্রিত একটি খঞ্জর নিয়ে আগ থেকেই মসজিদের মেহরাবে লুকিয়ে ছিল। সে তার খঞ্জর দ্বারা উমর (রা:) এর পেট মোবারকে ক্রমাগত তিন বার আঘাত করল। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা:) অগ্রসর হয়ে সংক্ষেপে নামাজ পড়িয়ে সালাম ফিরালেন।

আবু লুলু চেয়েছিল মসজিদ থেকে যেকোন ভাবে পলায়ন করতে; কিন্তু নামাজের সারিগুলো প্রতিবন্ধক ছিল। তার বের হওয়াটা সহজ ছিল না, তাই সে আরো কয়েকজন ছাহাবীকে যখম করল। মোট তেরজন ছাহাবীকে যখম করল। ইতিমধ্যে নামাজ শেষ হয়ে গেল। আবু লুলুকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু যখন সে দেখল, ধৃত হয়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে নিজের খঞ্জর দ্বারা নিজেকে হত্যা করল।

এত বড় ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল কিন্তু কেউই নামাজ ভঙ্গ করলেন না। পূর্ণ নামাজ শান্ত চিত্তে শেষ হল। নামাজের পর উমর (রা:) কে উঠিয়ে তার বাসস্থানে

নেওয়া হল, কিছুক্ষণ পর তাঁর হুঁশ আসল, আর এ অবস্থায় ফজরের নামাজ আদায় করলেন।

উমর (রাঃ) এর হত্যাকারী

হযরত উমর (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে ডেকে বললেন, দেখতো আমাকে কে যখম করেছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে গেলেন, ফিরে এসে বললেন, মুগীরা (রাঃ) এর গোলাম এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।
উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন! আমিতো তার উপর অনুগ্রহ করার নির্দেশ করেছিলাম, তবে আল্লাহর শোকর কোন মুসলমানের হাতে আমার মৃত্যু হয়নি। তুমি আর তোমার পিতা মদীনা মুনাওয়ারায় অনারবী কাফেরদের সংখ্যা বেশী হতে চেয়েছ। (এ কথা বলার কারণ হল, হযরত ইবনে আব্বাসের গোলাম বেশী ছিল)
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আপনি যদি চান তাহলে সবগুলোকে হত্যা করব। উমর (রাঃ) বললেন, এ সকল গোলামরা যখন তোমাদের ন্যায় কথা বলতে লাগল, তোমাদের কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে লাগল, তোমাদের সাথে হজ্ব করতে লাগল, তখন কি তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে চাও?
এদিক দিয়ে মানুষের অবস্থা এমন হল, তারা শংকিত হয়ে পড়ল যে, আজকের দিন শেষ হওয়ার পূর্বে তাদের উপর কোন বিপদ নাযিল হয় কিনা? প্রত্যেকেই বলতে শুরু করল, কোন বিপদ আসে কিনা? কেউ বলছিল, আমার নিজের ব্যাপারে মৃত্যুর ভয় হচ্ছে, কেউ বলছিল, কোন ভয় নাই। ইত্যবসরে উমরের জন্য আঙ্গুরের রস নিয়ে আসা হল। যেই তা পান করলেন, সঙ্গে সঙ্গে উগ্‌লে বের হয়ে এল। এবার সবাই ঘাবড়ে গেলেন। সকলে বুঝে ফেললেন তিনি আর বাঁচবেন না।
এই আবু লুলু একবার উমর (রাঃ) এর কাছে অভিযোগ করেছিল যে, আমার মুনীব আমার জন্য টেক্স বেশী নির্ধারণ করেছেন। আপনি তা কমিয়ে দিন। উমর (রাঃ) টেক্সের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করে বললেন, তুমি কি কাজ কর? সে বলল, আমি ছুরি নির্মাণ করি। উমর (রাঃ) বললেন, এই কাজের কর্মকার তুমি ছাড়া গোটা আরবে আর কেউ নেই। অতএব কাজ অনুপাতে এ কর বেশী নয়।

55

অতপর উমর (রা:) বললেন, আমার জন্য একটি চাকু তৈরী কর। সে বলল, ঠিক আছে, আপনার জন্য এমন চাকু তৈরী করব যা হবে জগৎ বিখ্যাত।
উমর (রা:) বললেন, দেখ এই গোলাম তো আমাকে হত্যার ধমকি দিচ্ছে। তখন উপস্থিত কেউ বলল, হে আমীরুল মুমীনীন! আপনি আদেশ করলে এখনই তাকে গ্রেফতার করে নিব। উমর (রা:) বললেন, অপরাধের পূর্বে শাস্তি দেওয়া যায় নাকি? ঐ সময় থেকেই আবু লুলু একটি খঞ্জর বানিয়ে বিষ মিশ্রিত পানি দিয়ে ধার দেওয়া শুরু করল এবং তখন থেকে সে উমর রা: কে হত্যা করার ফন্দি করতে লাগল।

মদিনাবাসির পেরেশানী

হযরত উমর (রা:) এর উপর হামলার এ সংবাদে গোটা মদীনাতে কান্নার রুল পড়ে গেল। সকল মুহাজির-আনসার তাকে ঘিরে বসলেন। সকলেই বলছে, হায়! যদি সম্ভব হত তাহলে আমার জীবন আপনাকে দিয়ে দিতাম। যাতে ইসলামের খেদমতে আপনি জীবিত থাকেন।
চিকিৎসার চেষ্টা করা হল কিন্তু কোন কাজ হল না। যখন সাহাবায়ে কেরাম (রা:) বুঝে নিতে পারলেন যে, তিনি আর বাঁচবেন না তখন সকলে যেয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি কুরআন ও রাসুলের সুন্নাতের উপর আমল করেছেন।
ইত্যবসরে এক যুবক উপস্থিত হয়ে বলল, হে আমীরুল মুমীনীন! আপনাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। রাসুলের সংস্পর্শের কারণে ইসলামের মধ্যে আপনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন তা আপনার জানা। আপনি মুসলামান হলেন, অতপর ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন, এবার আপনার শাহাদাত নসীব হল।
উমর (রা:) বললেন, এটা চাই যে, এসব কথা আমার জীবনোপায়ে উপযুক্ত হয়ে যাক। এর দ্বারা আমার কোন লাভও হবেনা, ক্ষতিও হবে না।
যখন ঐ যুবক ফিরে যেতে লাগল, তখন দেখা গেল তার পাজামা জমিনে লেগে আছে। উমর (রা:) বললেন, এই ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে আস। যখন নিয়ে আসা হলো তখন উমর (রা:) বললেন, ভাতিজা তোমার কাপড় উঠাও, ফলে ধুলা-বালি থেকে কাপড় বাঁচবে আর তাকওয়াও হাছিল হবে।

শেষ কামনা

অন্তিম মূহুর্তে উমর (রা:) তাঁর ছেলে ইবনে উমর (রা:) কে ডেকে বললেন, উম্মুল মুমিনীন আয়শার কাছে যেয়ে আমার সালাম দিয়ে তাঁকে বলবে, আমার মনের আকাঙ্খা হল, আমার দুই সাথি মুহাম্মদ (সা:) ও আবু বকর (রা:) এর পাশে যেন আমি শায়িত হই। এতে যদি তাঁর কোন কষ্ট বা ক্ষতি হয় তাহলে জান্নাতুল বাকী আমার জন্য উত্তম।

হযরত ইবনে উমর (রা:) আয়েশার কাছে এই পয়গাম পৌঁছালেন। তিনি বললেন, এই স্থান তো আমি আমার নিজের জন্য নির্ধারণ করেছি। কিন্তু আমি তাঁকে অগ্রাধিকার দিলাম।

এই সংবাদ উমরের কাছে পৌঁছলে তিনি অত্যান্ত আনন্দিত হলেন। আল্লাহর শোকর, আমার মনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা তিনি পূরণ করলেন।

অতপর বললেন, শুন, হে আমার সন্তান! যখন আমি মারা যাব তখন আমার লাশ নিয়ে উম্মুল মুমিনীনের দরজার পাশে যেয়ে সালাম দিয়ে বলবে, উমর অনুমতি চায়, যদি তিনি অনুমতি দেন তাহলে হুজরার ভিতরে নিয়ে যাবে নতুবা মুসলমানদের কবরে নিয়ে দাফন করবে।

খলিফা নির্বাচন

উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা:) কয়েকজন মহিলা সঙ্গে নিয়ে উমরের সাক্ষাতে গেলেন। তাদেরকে দেখে অন্যান্য লোকেরা বের হয়ে গেল। হাফসা (রা:) তাঁর পিতা উমরে কাছে যেয়ে কিছুক্ষণ বসলেন। অতপর পুরুষরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। তার ক্রন্দনের আওয়াজ বাহির থেকে শুনা যাচ্ছিল।

লোকেরা গিয়ে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাদের ওসীয়ত করুন, কাকে খলিফা নিযুক্ত করব? উমর (রা:) বললেন, ঐ সমস্ত লোকদের চাইতে খলিফা হওয়ার যোগ্য আর কাউকে দেখছি না, যাদের অবস্থা ছিল এমন যে, রাসুল বিদায় কালেও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতপর তিনি হযরত আলী, উসমান, যুবায়ের, তালহা , সাদ, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের নাম উল্লেখ করলেন। এবং বললেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমরও তোমাদের সাথে থাকবে, কিন্তু খেলাফতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (একথা বলার কারণ

57

আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের হৃদয় যেন ব্যথিত না হয়) অতপর বললেন, যদি সা’আদকে খলিফা নিযুক্ত করা হয় তাহলে তো ভাল। আর নয় তো যেই খলিফা হবে তাকে সাহায্য করবে। এজন্য যে, আমি তাকে তাঁর অপারগতা এবং খেয়ানতের কারণে বরখাস্ত করিনি।
অতপর হযরত ছুহাইব (রা:) কে তাঁর স্থলে নামাজের ইমাম বানালেন এবং বললেন, আমার পরে তিন দিনের ভিতরে খলিফা নির্বাচন করবে।

হযরত উমর (রা:) এর ওসিয়ত

অন্তিম মুহুর্তে হযরত উমর (রা:) উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি আমার পরবর্তী খলিফাকে ওসিয়ত করছি, যে সমস্ত লোকেরা প্রথমে হিজরত করে এসেছিল তাদেরকে চিহ্নিত করবেন, তাদের ইজ্জত রক্ষা করবেন। সম্মান করবেন। আমি আনসারদের সাথেও সদাচরণের ওসিয়ত করছি। আনসাররা হল ঐ সকল লোক যারা ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা অর্জন করেছে। আমি এই ওসিয়তও করছি যে, শহরের আশপাশ লোকদের সাথেও ভাল ব্যবহার করবেন। কারণ তারা ইসলামের সহযোগী। গ্রাম্য লোকদের সাথে ভাল ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। কারণ এ লোকগুলো হচ্ছে আরবের মূল অধিবাসি এবং ইসলামের শিকড় তাদের অতিরিক্ত মালগ্রহণ করে তাদের মাঝে যারা নিঃস্ব তাদের মাঝে বণ্টন করবে। আল্লাহ ও তার রাসুলের অঙ্গিকার সংরক্ষণ করবে। জিম্মিদের সাথে কৃত চুক্তি পূর্ণ করবে। তাদের রক্ষার জন্য অন্যের সাথে লড়াই করবে। সামর্থের বাইরে কাজ তাদের থেকে গ্রহণ করবে না।
ওসিয়ত করার পর তার সন্তানকে ডেকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তালাশ করে দেখ আমার যিম্মায় কত ঋণ আছে। তিনি হিসাব করে বললেন, প্রায় ছিয়াশি হাজার। উমর (রা:) বললেন, আমার পারিবারিক সম্পদ থেকে যদি এই ঋণ আদায় হয়ে যায়, তাহলে তা দ্বারা ঋণ আদায় করবে। আর না হলে আদি বিন কাবের সন্তানদের কাছে সাহায্য চাইবে। যদি তাদের মাল দ্বারা ঋণ আদায় না হয়, তাহলে কুরাইশদের কাছে চাইবে। কুরাইশ ছাড়া অন্য আর কারো কাছে যাবে না।

58

মৃত্যু

ছেলেকে এই হুকুম করার পর, তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। এ সময় উমর (রা:) এর খোদাভীতির অবস্থা কেমন ছিল, পরবর্তী বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাবে। হযরত মিছওয়ার বিন মাখরামা (রা:) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা:) অন্তিমকালে বললেন, খোদার কছম! যদি আমার কাছে জমিন ভর্তি স্বর্ণ থাকত আর এর বিনিময়ে আল্লাহর আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যেত তাহলে তা আমি করতাম।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি বলেছেন, খোদার কছম! যদি আমার কাছে সারা দুনিয়া হত তাহলে আযাব থেকে নিস্কৃতির বদলা হিসাবে দিয়ে দিতাম। (মিনহাজুল মাকাছিদ পৃ: ৫৭৫)

২৭ জিলহজ্ব বুধবার দিনে আহত হন। আর মুহাররামের ৫ম দিন রবিবার ৬৩ বছর বয়সে পরলোকে পাড়ি জমান। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

জানাযার নামায

যখন জানাযার নামাজের জন্য তারঁ লাশ আনা হল, তখন আলী (রা:) বললেন, আমার আগে থেকে ইচ্ছা ছিল যে, আবু বকর-উমর উভয়ের দাফন যেন রাসুলের পাশেই হয়। কারণ রাসুল (সা:) প্রত্যেক কথার মধ্যে তাঁর নামের সাথে উভয়জনের নাম উল্লেখ করতে শুনেছি। হযরত আলী (রা:) বলেন- আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যে, আমার আমলনামাও যেন উমরের মত হয়।

হযরত সুহাইব (রা:) জানাযার ইমামতি করেন। এবং রাসুলের রওজায় আবু বকরের পার্শ্বে শায়িত করা হয়। রওজা মোবারকে মাত্র তিনটি কবর আছে। একটি হচ্ছে, রাসুল (সা:) এর, ২য়টি হচ্ছে আবু বকরের, ৩য়টি হচ্ছে উমরের। আবু বকরের মাথা মোবারক রাসুলের কাঁধ মোবারক বরাবর। আর উমর (রা:) এর কবর মোবারক রাসুলের পায়ের দিকে। (খুলাফায়ে রাশেদিন ১৫৮-১৬২ পৃষ্টা)

এক রেওয়ায়েতে এসেছে, নবী করীম (সা:) বলেছেন, উমরের মৃত্যুতে ইসলাম কাঁদবে। (এহইয়াউল উলুম খন্ড ৪ পৃষ্টা ৬৭৪)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল হযরত উমরকে স্বপ্নে দেখা। অবশেষে তাঁর শাহাদতের প্রায় ১বছর পর তাঁকে স্বপ্নে

দেখলাম। তিনি কপাল থেকে ঘাম ঝাড়ছিলেন আর বলছেন, আমি মুক্ত হয়ে গেছি। মরণের সময় আমার তো মনে হচ্ছিল যে, আমার উপর ছাদ সজোরে ধসে পড়েছে। যদি মেহেরবান আল্লাহ হেফাজত না করতেন তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। আল্লাহর দয়ায় আমি বেঁচে গেছি। (কিতাবুর রূহ)

হযরত উছমান (রাঃ)

উছমান (রাঃ) এর শাহাদাতের কাহিনি সুপ্রসিদ্ধ। শাহাদতের পূর্বে উছমান (রাঃ) এর রাষ্ট্রপরিচালনা গৃহ (সংসদ ভবন) ঘেরাওকারী দুস্কৃতিদেরকে বারবার বুঝানোর চেষ্টা করলেন, তাদের সামনে হৃদয়গ্রাহী ভাষণও প্রদান করলেন। উবাই ইবনে কাব রা. ভাষণ দিলেন। কিন্তু কোন কিছুই তাদেরকে প্রভাবিত করল না। ছুমামা ইবনে হাজাম (রাঃ) বলেন, যখন উছমান রাঃ দুস্কৃতিদেরকে বুঝাবার জন্য ঘরের ছাদে গেলেন এবং সমবেত লোকদেরকে সম্বোধন করছিলেন তখন আমি সাথে ছিলাম। তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা ঐ দুই ব্যক্তিকে নিয়ে আস যারা তোমাদেরকে এখানে একত্রিত করেছে। অতপর ঐ দুই জনকে ডাকা হল। তারা এভাবে আসল যেমন দুটি উট অথবা দুটি গাধা আসে। অতপর উছমান (রাঃ) ঐ দুজনকে দেখে বললেন,

আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের কছম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমাদের জানা আছে কি রাসুল (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেছিলেন, তখন এই মসজিদ সংকীর্ণ ছিল? রাসুল (সাঃ) বললেন, কে এই জমিন ক্রয় করে মসজিদে ওয়াকফ করবে? এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম জায়গা জান্নাতে পাবে। এই হুকুম তো আমিই পালন করেছি। এবার তোমরা কি আমাকে এই মসজিদে নামাজ পড়তে দিবে না?

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কছম দিয়ে বলছি! বলতো তোমরা কি জানো, রাসুল (সাঃ) যখন মদীনাতে আগমন করলেন, রুমা কূপ ছাড়া মিষ্ট পানির আর কোন কূপ ছিল না। তখন রাসুল (সাঃ) বলেছিলেন, কে এই কূপ ক্রয় করে মুসলমানদেরকে ওয়াকফ করবে? ফলশ্রুতিতে এর চাইতে উত্তম কূপ জান্নাতে মিলবে। তখন আমিই এই হুকুম পালন করেছি। তাহলে এবার তোমরা কি আমাকে এই কূপের পানি পান থেকে বঞ্চিত রাখবে?

তোমরা কি জান না, সম্বলহীন সৈন্যদেরকে আমিই সরঞ্জাম দিয়ে সমৃদ্ধ করেছি। সকলেই জবাবে বলল, খোদার কছম এগুলো সত্য।

কিন্তু দুস্কৃতিদের অন্তরে কোন রেখাপাত করল না। তারপর উছমান (রাঃ) উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদেকে কছম দিয়ে বলছি, বল তোমাদের কারো কি স্মরণ আছে, একবার রাসুল (সাঃ) পাহাড়ে উঠলেন তখন পাহাড় কম্পন শুরু করল, রাসুল (সাঃ) পা দ্বারা পাহাড়ে পদাঘাত করে বললেন, থেমে যাও হে হেরা! তোমার পিঠে এখন একজন নবী, একজন ছিদ্দিক, একজন শহিদ আছেন। এ সময় আমি রাসুলের সাথে ছিলাম। লোকেরা বলল, হ্যাঁ! একথা আমাদের স্বরণ আছে। অতপর আরো বললেন, আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, বল হুদাইবিয়াতে যখন রাসুল আমাকে দূত বানিয়ে মক্কাতে পাঠিয়েছিলেন, তখন রাসুল (সাঃ) তাঁর একহাতকে আমার হাত সাব্যস্ত করেননি? আমার পক্ষ থেকে নিজে বায়আত নেন নি? সকলে বলল, এটাও সত্য।

(ইবনে হাম্বল, খণ্ড -১, পৃষ্টা-৫১)

এদিকে দুস্কৃতিকারিরা দেখল যে, হজ্বের মৌসুম হয়ে যাবে, কিছু দিনের ভিতর মানুষ হজ্ব শেষ করে মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করবে, ফলে সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাই তারা হত্যার পরামর্শ করতে লাগল, যা উছমান (রাঃ) নিজ কানে শ্রবণ করেছেন এবং সমবেত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে লোকেরা! তোমরা কোন অপরাধে আমাকে খুন করতে চাও? ইসলামী শরীয়তে শুধু তিন সুরতে রক্তপাতের বৈধতা দিয়েছে। ১. জিনা করলে, পাথর মেরে রক্তাক্ত করা। ২. কিছাছ স্বরূপ হত্যার দ্বারা রক্তাক্ত করা। ৩. মুরতাদ হয়ে গেলে হত্যার মাধ্যমে রক্তাক্ত করা। আমি তো জাহেলী যুগে জিনা করি নাই, ইসলামে প্রবেশ করেও জিনা করি নাই। কাউকে হত্যা করি নাই। ৩য় তো আমি মুসলমান হওয়ার পর মুরতাদও হই নাই। এখনো সাক্ষি দিচ্ছি, আল্লাহ এক, আর মুহাম্মদ (সাঃ) তার বান্দা ও রাসুল।

(ইবনে হাম্বল ৬২পৃষ্ঠা)

এত কিছু বলার পরও দুস্কৃতিকারিরা তার বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হল না।

প্রাণ উৎসর্গকারিদের পরামর্শ ও অনুমতি চাওয়া

প্রাণ উৎসর্গকারি কিছু লোক বিভিন্ন পরামর্শ দিল। হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা:) এসে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি তিনটি বিষয় থেকে একটি গ্রহণ করুন।

১. আপনার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারিদের একটি শক্তিশালী দল এখানে আছে তাদেরকে নিয়ে এদের মোকাবেলা করে এদেরকে বের করে দেন। আপনি সত্যের উপর আছেন, ওরা মিথ্যার উপর। মানুষ সত্যের পক্ষে থাকবে, যদি এটা গ্রহণ না করেন তাহলে

২. দরজার দিক ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে দেয়াল ভেঙ্গে এই বেষ্টনী থেকে বের হয়ে কোন কিছুতে সওয়ার হয়ে মক্কা চলে যান। সেখানে হরমের ভিতরে তারা লড়াই করবে না। নতুবা

৩. শামদেশে চলে যান, সেখানে প্রতিহতকারী লোক আছে, আর মুআবিয়া (রা:)ও আছেন।

হযরত উছমান (রা:) বললেন, আমি বাহির হয়ে লড়াই করে উম্মতে মুহাম্মদীর রক্তপাতকারী প্রথম খলীফা হতে চাই না। যদি আমি মক্কা মুআজ্জামা চলে যাই, তাহলে হতে পারে এ সকল লোকেরা হরম এলাকার মানহানি করবে, সেখানেও যুদ্ধ করবে। আর আমি হরম এলাকার সম্মান বিনষ্টকারী প্রথম ব্যক্তি হতে চাইনা। হিজরত ভূমি আর রাসুলের প্রতিবেশী হওয়া পরিত্যাগ করে শামেও যাব না। (ইবনে হাম্বল পৃষ্টা ৬৭)

হযরত উছমান (রা:) এর ঘর অনেক বড় ও প্রশস্ত ছিল, দরজা এবং ঘরের মধ্যে ছাহাবা ও সাধারণ মুসলমানদের বিরাট দল বিদ্যমান ছিল। যাদের সংখ্যা প্রায় ৭০০ হবে। এদের সর্দার ছিলেন, হযরত জুবায়ের (রা:) এর বাহাদুর সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের। তিনি উছমান (রা:) এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এই মুহুর্তে ঘরের ভিতর আমাদের উল্লেখযোগ্য একটা সংখ্যা আছে। অনুমতি যদি দেন তাহলে এ সকল দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তিনি বললেন, যদি একজন লোকেরও লড়াই করার ইচ্ছা থাকে তাহলে তাকেও আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমার জন্য যেন কোন রক্তপাত না হয়। (ইবনে সাআদ, খণ্ড-৩)

62

এ সময় ঘরের মধ্যে বিশজন গোলাম ছিল সবাইকে আজাদ করে দিলেন। (ইবনে হাম্বল পৃষ্টা ৭২)
হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা:) এসে বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আনসারগণ দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতির অপেক্ষায় আছে। তারা ২য় বার তাদের বিরত্ব প্রকাশ করতে চায়। বললেন, যদি লড়াই করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে অনুমতি নেই। এই মুহুর্তে আমার সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী হল, যে আমাকে রক্ষায় তলোয়ার উঠাবে না। হযরত আবু হুরায়রা অনুমতি চাইলেন, তখন উসমান (রা:) বললেন, আবু হুরায়রা তুমি কি আমাকে আর সমস্ত পৃথিবীকে হত্যা করতে পছন্দ কর? তিনি বললেন, না। উছমান (রা:) বললেন, তুমি একজনকে হত্যা করলে গোটা পৃথিবীকে হত্যাকারী সাব্যস্ত হবে। আবু হুরায়রা তা শুনে ফিরে আসলেন। (ইবনে সাআদ)

শাহাদাতের প্রস্তুতি

রাসুলের (সা:) ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী বিশ্বাস হয়ে গেল উছমান রা.এর শাহাদত নির্ধারিত হয়ে গেছে। (ইবনে হাম্বল পৃষ্টা ৬৬)
রাসুল (সা:) কয়েকবার এই বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করেছেন। সাথে সাথে ধৈর্য্য ও অটল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত উছমান (রা:) এই ওসিয়তের উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং সর্বদা শাহাদতের প্রতীক্ষায় ছিলেন।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা:) বলেন, যখন হযরত উছমান বন্দী ছিলেন, তখন আমি তাঁর সাক্ষাতে গেলাম। উছমান (রা:) বললেন, ভালো হয়েছে তুমি এসেছ। আজ রাত আমি রাসুল (সা:) কে স্বপ্নে দেখেছি। রাসুল (সা:) আমাকে বলছেন, হে উছমান! লোকেরা তোমাকে বন্দী করেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসুল (সা:) বললেন, তুমি কি পিপাসার্ত? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতপর দেখলাম, রাসুল (সা:) এক বালতি পানি তুলে ধরলেন। আমি এটা থেকে পেট ভরে পানি পান করলাম। এমনকি জাগ্রত হওয়ার পর পানির শীতলতা বুকে এবং কাঁধে অনুভব করলাম। রাসুল (সা:) বললেন, তুমি চাইলে তোমাকে তাদের উপর বিজয়ি হওয়ার জন্য সাহায্য করা হবে। আর চাইলে তুমি আমার কাছে এসে ইফতার করতে পার। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে ইফতার করাকে পছন্দ করি। (এহইয়াউল উলুম খন্ড ৪ পৃষ্টা ৬৭৪)

যে দিন তিনি শাহাদাতবরণ করেন, ঐ দিন তিনি রোজা ছিলেন। দিন ছিল শুক্রবার। স্বপ্নে দেখলেন, রাসুল (সাঃ) হযরত আবু বকরও উমর কে নিয়ে তার কাছে আগমন করেছেন। তাকে বলছেন, উছমান তাড়াতাড়ি কর আমরা তোমাকে ইফতার করানোর অপেক্ষায় আছি। জাগ্রত হয়ে উপস্থিত লোকদের সাথে স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। স্ত্রীকে বললেন, আমার শাহাদতের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে, দুস্কৃতিকারিরা আমাকে হত্যা করবে। স্ত্রী বললেন, এমন হবে না। উছমান বললেন, এমন হওয়া আমি স্বপ্নে দেখেছি।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুল (সাঃ) স্বপ্নে তাঁকে বলছেন, হে উছমান! আজ জুমআর নামাজ আমার সাথে পড়বে।

(ইবনে সাআদ, খণ্ড-৩, পৃষ্টা ৫৩-হাকেম খণ্ড-৩ পৃষ্টা ৯৯-১০৩তে উভয় স্বপ্ন উল্লেখ আছে। আর ইবনে হাম্বলে শুধু প্রথম স্বপ্নের কথা উল্লেখ আছে।)

উছমান (রাঃ) এর স্ত্রী নায়েলা বিনতে কারফাসা (রাঃ) বলেন, যে দিন হযরত উছমান (রাঃ) শহিদ হন, ঐ দিনের পূর্বের দিন তিনি রোজা ছিলেন। যখন ইফতারের সময় হল, তখন দুস্কৃতিকারীদের কাছে পানি চাইলেন। তারা পানি দেয়নি, ফলে তিনি ইফতার করেননি। এ অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলেন। সেহরির সময় আমি এক প্রতিবেশির কাছ থেকে পানি নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম এবং তাঁকে নাড়া দিয়ে জাগ্রত করলাম। তাঁকে বললাম, এটা পানের পানি। তখন উছমান (রাঃ) মাথা উঠিয়ে বললেন, স্বপ্নে দেখলাম আমি রোজাদার আর রাসুল (সাঃ) এই গৃহের ছাদের দিক দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। রাসুলের কাছে মিঠা পানি ছিল। রাসুল আমাকে বললেন, হে উছমান! পানি পান করে নাও। তখন আমি তৃপ্ত হয়ে পান করলাম। রাসুল বললেন, আরো পান কর, আমি পেট ভরে আবার পান করলাম। অতপর বললেন, জাতি অচিরেই তোমাকে অস্বীকার করবে। যদি তুমি লড়াই কর তাহলে বিজয়ী হবে। আর যদি তাদেরকে স্ব অবস্থায় ছেড়ে দাও তাহলে ইফতার আমাদের সাথে করবে। (মিনহাজুল কাসিদিন ইবনে জাওযী ৫৭৫)

অতপর উছমান (রাঃ) একটি পায়জামা চেয়ে পরিধান করলেন। যা কখনো পরিধান করেন নাই। এবং নিজের বিশটি গোলামকে ডেকে মুক্ত করলেন। আর কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে মগ্ন হয়ে গেলেন। (ইবনে হাম্বল ৭১)

64

শাহাদাত

দুস্কৃতিকারীরা উছমান (রা:) এর গৃহে হামলা করল। হযরত হুসাইন দরজার কাছে তাদের প্রতিহত করে আহত হন। চারজন দুস্কৃতিকারী দেওয়াল টপকে ছাদে আরোহণ করল, তাদের অগ্রভাগে ছিলেন হযরত আবু বকরের ছোট ছেলে মুহাম্মদ বিন আবু বকর। যিনি আলী (রা:) এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। তিনি বড় কোন মনসব পাওয়ার আশায় কাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যা না পাওয়ার কারণে উছমান (রা:) এর শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। তিনি অগ্রসর হয়ে উছমান (রা:) এর দাড়ি মোবারক ধরে সজোরে টান দিলেন।

হযরত উছমান (রা:) বললেন, ভাতিজা! তোমর বাবা জীবিত থাকলে এটা পছন্দ করতেন না। এ কথা শুনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর লজ্জিত হয়ে পিছু হটে যান। আর অন্য আরেক ব্যক্তি, কেনানা বিন বিশর অগ্রসর হয়ে কপাল মোবারকে লৌহখণ্ড দ্বারা সজোরে আঘাত করল। ফলে উছমান (রা;) কাত হয়ে পড়ে যান, তখন তার জবান থেকে بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ বের হল। সাওদান বিন হিরমান ২য় আঘাত হানলেন, যদ্দারা রক্ত ফোয়ারা প্রবাহিত হল,আর পাষণ্ড আমর ইবনুল হামাক বুকে উঠে বসে শরীরের বিভিন্ন স্থানে খঞ্জর দ্বারা লাগাতার নয়টি আঘাত করল।

এক বর্ণনায় এসেছে, উছমান (রা:) কে যখন যখম করা হল, তখন অবস্থা এমন হল যে, রক্ত তাঁর দাড়ি মোবারকে প্রবাহিত হচ্ছিল। আর তিনি বলছিলেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ হে প্রভু, এ সকল লোক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ আপনার হাওয়ালা করলাম, আমার সকল কর্মে আপনার সাহায্য চাই। আর আমাকে যে মুসিবতে আক্রান্ত করেছ, এ ব্যাপারে ধৈর্য্যধারণের তাওফিক চাই। ইত্যবসরে কোন এক পাষণ্ড অগ্রসর হয়ে তলোয়ার দ্বারা আক্রমণ করল। তাঁর বিশ্বস্ত বিবি হযরত নায়েলা (রা:) তার পাশে বসা ছিলেন, তিনি আক্রমণ হাত দ্বারা প্রতিহত করলেন, ফলে তাঁর তিনটি আঙ্গুল কেটে পৃথক হয়ে গেল। এই আক্রমণই যিন্-নূরাইন (রা:) এর আলোকিত জীবন নিভিয়ে দিল।

এ অসহায় মৃত্যুতে গোটা বিশ্ব কেঁদেছে। আসমান-জমিনের সকল বাসিন্দা এই নিষ্টুর হত্যায় অশ্রু প্রবাহিত করেছে। তাকদীরকর্তা বললেন, যে রক্তপিপাসু

তলোয়ার আজ খাপমুক্ত হল, তা কিয়ামত পর্যন্ত খাপমুক্ত থাকবে। ফিতনা ফাসাদের দরজা আজ উন্মুক্ত হল, কিয়ামত পর্যন্ত তা খোলা থাকবে।(ছহীহ বুখারীতে কিতাবুল ফিতানে এর ইঙ্গিত রয়েছে।)

শাহাদতের সময় উছমান (রা:) তেলাওয়াতে রত ছিলেন। কুরআন শরীফ খোলা ছিল, অন্যায় রক্ত যে আয়াতকে রঞ্জিত করেছে, তা হল-

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অচিরেই আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে এর বদলা গ্রহণ করবেন। আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। (বাকারাহ-১৩৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা:) ঐ সকল লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যারা উছমান (রা:) কে রক্তে গড়াতে দেখছেন, বলতো উছমান (রা:) যখন রক্তের মধ্যে গড়াতে ছিলেন তখন কি বলেছেন? লোকেরা বলল, তাঁকে এ কথা বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি কর। একথা তিনবার বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা:) বললেন, খোদার কছম! যদি তিনি অনৈক্যের দোয়া করতেন তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আর ঐক্য হত না। (এহইয়াউল উলুম)

আলা ইবনে ফুজায়েল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন উছমান (রা:) শহীদ হন তখন তাঁর আলমারি তালাশ করে একটি তালাবদ্ধ সিন্ধুক পাওয়া গেল। এটা খুলে একটি ছোট বাক্স পাওয়া গেল। তা খুললে একটি কাগজ পাওয়া গেল, যাতে লেখা ছিল এটি ওসমানের ওসিয়ত।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

উছমান ইবনে আফফান সাক্ষি দিচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি একক, তার কোন শরীক নাই। আর মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। জান্নাত জাহান্নাম সত্য। কিয়ামতের দিন সবাইকে পুণরায় জীবিত করা হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। আল্লাহ তাঁর ওয়াদার খেলাফ কিছু করেন না। আমরা তাঁর হুকুমে জীবিত হই এবং তাঁর হুকুমে মৃত্যুবরণ করি। আর তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হব ইনশা আল্লাহ। (মিনহাজুল কাসিদিন)

জানাযার নামাজ

শুক্রবার দিন আসরের সময় শাহাদতের ঘটনা ঘটে। দুই দিন পর্যন্ত তাঁর লাশ কাফন বিহীন পড়ে রইল। মদীনাতে এক বিপর্যয় আঘাত হানল। দুস্কৃতিকারীদের প্রভাব ছিল, তাদের ভয়ে কেউই প্রকাশ্যে দাফন করার সাহস

66

করতে পারল না। শনিবার দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে রাত আসল, সেই রাতে কয়েকজন ব্যক্তি জীবনবাজি রেখে কাফন দাফনের ব্যবস্থা করল। গোসলবিহীন রক্তরঞ্জিত কাপড়সহ শহীদ নির্যাতিত ব্যক্তির লাশ উঠালো। মাত্র ১৭ জন ব্যক্তি কাবুল থেকে মারাকিশ পর্যন্ত এলাকার শাসকের জানাযা পড়ল। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত, হযরত জুবাইর ইবনু আওয়াম (রা:) নামাজ পড়িয়েছেন আর ইবনে সাআদ এর মধ্যে বর্ণিত, হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম জানাযা পড়িয়েছেন। জান্নাতুল বাকীর পিছনে হাশে কাওকাব এর মধ্যে এই ধৈর্য্যশীল, সহনশীল, নির্যাতিত ব্যক্তির শরীর মাটিতে সোপর্দ করা হল। পরবর্তীতে এ স্থানের দেওয়াল ভেঙ্গে জান্নাতুল বাকীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এখনও জান্নাতুল বাকীর শেষপ্রান্তে মাজার বিদ্যমান আছে।

ছাহাবায়ে কেরামের পেরেশানী

ছাহাবায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমান এমন মহা বিপর্যয়মূলক সংবাদ শুনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কারো এমনটি ধারণাও ছিল না। দুস্কৃতিকারীরা একজন খলিফাকে হত্যার কাজে জড়িত হওয়ার দুঃসাহস করবে। রাসুলের হরমের অসম্মান করবে। এমনটা কারো ধারণায় ছিল না। এজন্য যেই এই সংবাদ শুনেছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

এমনকি যে সকল লোকেরা উছমান (রা:) এর খেলাফত পরিচালনার কর্মপদ্ধতির বেলায় কিছুটা দ্বিধার মধ্যে ছিলেন, তারাও এমন অসহায় নির্যাতিত অবস্থায় মৃত্যুর সংবাদে অশ্রু প্রবাহিত করেন। সকলের উপর পেরেশানী, ভয়-ভীতি ছেয়ে গেল। এমনকি যে সকল দুস্কৃতিকারী এই খুন দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেছে, তারাও তাদের পরিণাম চিন্তা করে নিজেদের কর্মের উপর অনুতপ্ত ছিল। কিন্তু দুশমনরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিছিয়ে ছিল, এ ব্যাপারে তারা সফল হল। ঐক্যের ধর্ম ইসলাম এবার শিয়া, সুন্নি, খারেজী এবং উছমানী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

হযরত আলী (রা:) মসজিদ থেকে বের হয়ে উছমান (রা:) এর ঘরের দিকে আসার সময় পথিমধ্যে শাহাদতের সংবাদ শুনে হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! উছমানের খুন থেকে আমি মুক্ত।

67

হযরত উমর (রাঃ) এর বোনজামাই সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল বললেন, হে লোক সকল! যদি উহুদ পাহাড় তোমাদের মন্দকর্মের কারণে ভেঙ্গে তোমাদের উপর পড়ে তাহলে তা অনুচিত হবে না।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) যিনি আগত ফিতনা সংক্রান্ত বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত ছিলেন এবং রাসুল (সাঃ) এর গোপন তথ্য সম্পর্কে বেশী অবগত ছিলেন, তিনি বললেন, উছমানের হত্যার মাধ্যমে ইসলামের দূর্গে ছিদ্র তৈরী হয়ে গেল, যা আর কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি গোটা সৃষ্টি উছমান (রাঃ) কে হত্যায় শরিক হত, তাহলে আদ জাতির ন্যায় আসমান থেকে পাথর বর্ষণ হত।

ছুমামা ইবনে আদী যিনি সানআর গভর্ণর ছিলেন। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্র কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আর বললেন, হায় আফসোস! রাসুলের সহচর চলে গেলেন।

আবু হুমাইদ সায়িদী (রাঃ) কছম করেন, যতদিন বেঁচে থাকব আমাকে হাসি মুখে দেখবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, হায়! আরবের শক্তি আজ শেষ হয়ে গেল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, উছমান নির্যাতিত হয়ে মারা গেছেন। খোদার কছম! তাঁর আমালনামা ধৌত কাপড়ের ন্যায় পবিত্র হয়ে গেছে।

হযরত যয়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) এর চোখে উছমান (রাঃ) এর শাহাদতের শোকের পানি প্রবহমান ছিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর যখন এই দুর্ঘটনার কথা স্বরণ হত তখন চিৎকার করে কাঁদতেন। (ইবনে সাআদ খণ্ড ৩য়, পৃষ্টা-৫৫/৫৬, যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের বর্ণনা বুখারীতে সাঈদ ইবনে যায়েদের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়ে আছে)

হযরত উছমান এর রক্তে রঞ্জিত জামা আর হযরত নায়েলার (রাঃ) কর্তিত আঙ্গুল শাম দেশে মুআবিয়া (রাঃ) এর কাছে পাঠানো হল। যখন এই জামা ও আঙ্গুল জনসম্মুখে প্রকাশ করা হল তখন চতুর্দিকে ক্রন্দনের আওয়াজ এবং 'প্রতিশোধ চাই', 'প্রতিশোধ চাই' আওয়াজ আসতে থাকল।

(খুলাফায়ে রাশেদীন পৃষ্টা-২১১-২১৭)

68

হযরত আলী (রাঃ) কে হত্যার কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র

নাহরাওয়ান যুদ্ধের পর কতক খারেজি হজ্ব মাওসুমে একত্রিত হয়ে সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার এক পর্যায়ে সবাই একমত হল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আলী, মুআবিয়া এবং আমর ইবনুল আস (রাঃ) এ তিনজন পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত ইসলামী দুনিয়া যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্তি পাবে না। সুতরাং তিনজন খারেজি তিনজনকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হল। আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম বলল, আমি আলী (রাঃ) কে হত্যার জিম্মাদারি নিলাম। এমনিভাবে নাযাল হযরত মুআবিয়াকে হত্যা করার এবং আব্দুল্লাহ হযরত আমর ইবনুল আসকে (রাঃ) হত্যার জিম্মাদারি নিল। এই তিনজন নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ি রওয়ানা হল। কুফায় পৌঁছার পর ইবনে মুলজিমের ইচ্ছাকে কিতাম নামী একজন সুন্দরী খারেজী রমণী আরো পাকাপুক্ত করে দিল। ঐ মহিলা তাকে ষড়যন্ত্রে সফল হলে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ওয়াদা দিল। আর আলী (রাঃ) এর রক্তকে মহর সাব্যস্ত করল।

অবশেষে ৪০ হিজরীর রমজান মাসে এই তিনজন একদিন সকাল বেলা তিনজন ছাহাবীর উপর আক্রমণ করল। আমীরে মুআবিয়া এবং আমর ইবনুল আস সহসাই বেঁচে গেলেন। আমীরে মুআবিয়া (রাঃ) এর উপর হামলা হালকাভাবে পড়ল। আর আমর ইবনুল আস এদিন ইমামতির জন্য আসেন নি। অপর এক ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হল। ঐ খারেজী আমর ইবনুল আস মনে করে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে আঘাত করল। কিন্তু আলী (রাঃ) এর নির্ধারিত হায়াত শেষ বিধায় তিনি হত্যার শিকার হলেন।

আলী (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড

আসবাগ হানযালী বলেন, যে দিন সকালে আলী (রাঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হন, ঐ দিন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। ইবনে তাইয়াহ ফজরের সময় এসে তাকে ডাকলেন। তিনি উঠতে বিলম্ব করলেন। আরো কিছুক্ষণ ঘুমালেন। ইবনে তাইয়াহ এসে দ্বিতীয়বার ডেকে ফিরে আসলেন, এবারও উঠতে বিলম্ব করলেন। যখন তিনি তৃতীয়বার আসলেন তখন তিনি উঠে চলতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন,

হে নিশ্চিন্ত মন! মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে আস, মৃত্যুকে ভয় কর না, যখন তা হবে তোমার মেহমান। এক পর্যায়ে তিনি মসজিদে আগমন করলেন এবং ইবনে

69

মুলজিমকে জাগ্রত করলেন। সে মসজিদে ঘুমিয়ে ছিল। যখন তিনি নামাজ শুরু করলেন এবং মাথা মোবারক আল্লাহর সামনে সিজদায় রাখলেন তখনই হতভাগা ইবনে মুলজিম জোরে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করল। মাথায় আঘাত লাগলো। অপরদিকে লোকেরা ইবনে মুলজিমকে গ্রেফতার করল। (তাবারী)

হযরত আলী (রা:) এ পরিমাণ যখম হলেন যে, বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকল না, তাই তিনি হাছান ও হুছাইন (রা:) কে ডেকে অত্যান্ত উপকারি কিছু নসিহত করলেন এবং মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার সাথে সহমর্মিতা ও সহযোগিতারও নির্দেশ করলেন।

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার পর আমরা হাছান (রা:) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করব কি? আলী (রা:) বললেন, এ ব্যাপারে আমি কিছু বলব না। এটা তোমরা সিদ্ধান্ত নিবে।

অতপর আলী (রা:) বিভিন্ন ওসিয়ত করলেন। হযরত হাছানকে গোসল দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, মূল্যবান কাপড় ব্যবহার করবে না। কারণ আমি রাসুল (সা:) কে বলতে শুনেছি, দামি কাফন ক্রয় কর না। কারণ তা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে মধ্যম পন্থায় নিয়ে চলবে। বেশী দ্রুত না; আবার একেবারে ধীরেও না।(তাবারী)

হযরত শুবা (রা:) বলেন, যখন আলী (রা:) উপর তলোয়ারের আক্রমন হল তখন তিনি বললেন আমার হত্যাকারীর কি হল? লোকেরা বলল তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আলী (রা:) বললেন তাকে আমার খাবার দান কর। আমার পানি পান করাও। যদি আমি জিন্দা থাকি তাহলে নিজে ফয়ছালা করব আর যদি শহীদ হই তাহলে তাকে তলোয়ার দ্বারা একটা আঘাত করবে। বেশী করবে না। (মিনহুজুল কাসিদিন)

তলোয়ার বিষ মিশ্রিত ছিল বিধায় আঘাতের প্রভাব সমস্ত শরীরে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ফলে এই দিনই অর্থাৎ ৪০ হিজরীর ২০ রমজান শুক্রবার রাতে হেদায়াতের বাতি, মর্যাদাপূর্ণ, সমস্ত ভালো গুণের অধিকারী, অনন্ত কালের জন্য অস্তমিত হয়ে গেল। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

হযরত ইমাম হাছান (রা:) নিজের হাত দ্বারা কাফন পরালেন, জানাযার নামাজে চার তাকবীরের স্থলে পাঁচ তাকবীর বললেন। গারা নামক কুফার একটি কবরস্থানে দাফন করা হল।(খুলাফায়ে রাশেদীন-২৯০-২৯১)

হযরত বেলাল (রা:) এর শেষ বিদায়ের চিত্র

যখন হযরত বেলাল (রা:) এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তাঁর স্ত্রী বলতে লাগলেন, وَاحُزْنَاهُ হায় আফসোস! তুমি চলে যাচ্ছো। আর বেলাল (রা:) বলতে লাগলেন, وَاطَرْبَاهُ غَدًانَلْقَى الْاَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَه কেমন আনন্দের কথা? কেমন মিষ্ট কথা? আগামীকাল প্রিয় বন্ধুবর মুহাম্মদ (সা:) এবং তার সাথিদ্বয়ের সাথে মিলিত হবো। (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৭২)

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা:) এর শেষ বিদায়

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা:) এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে তিনি বলতে লাগলেন, বাহির হয়ে দেখতো সকাল হয়েছে কিনা? তাঁকে বলা হলো, না এখনো সকাল হয়নি।

কয়েকবার এরূপ হওয়ার পর বলা হলো, হ্যাঁ এখন সকাল হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, মৃত্যুকে স্বাগতম! অদৃশ্য বিষয় দেখার সময় এসেছে। বন্ধু প্রয়োজন কালে এসেছেন। হে আল্লাহ, এতদিন আমি তোমাকে ভয় করতাম, আজ আমি তোমার রহমতের আশা রাখি। হে আল্লাহ, তুমি জানো, আমি দুনিয়াতে অনেকদিন বাঁচতে চেয়েছিলাম; তবে তা দুনিয়ার মহব্বতে নয়। এখানকার নদনদী, বাগ-বাগিচার ভালোবাসায় নয়; বরং গ্রীষ্মের মৌসুমে দুপুর বেলায় রোজার কারণে পিপাসার্ত হওয়ার স্বাদ আস্বাদনের জন্য এবং তোমার দ্বীনের জন্য কষ্টের মধ্যে সময় অতিক্রান্ত করা এবং তোমার যিকিরের মজলিসে শরীক হওয়ার জন্য। (ফাযায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা-৪৭২)

যখন তার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলো, ধীরে ধীরে তা বেড়ে গেল তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তার হুঁশ ফিরে আসলে চক্ষু খুলে বললেন, হে প্রভু! তুমি যে পরিমাণ চাও আমার গলা চেপে ধরো। তোমার ইজ্জতের শপথ, আমার অন্তর তোমাকে মহব্বত করে। (এহইয়াউল উলুম খণ্ড-৪, পৃষ্টা ৬৭৮)

আব্দুর রহমান ইবনে গানাম (রা:) বলেন, আমি মুআয ইবনে জাবালের মৃত্যুর তিনবছর পর স্বপ্নে একটি ডোরাকাটা ঘোড়ার পিঠে আরোহিত দেখলাম। পিছনে কিছু সাদাবর্ণের লোক সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় ডোরাকাটা ঘোড়ার উপর আরোহিত অবস্থায় ছিল।

71

আর হযরত মুআয ইবনে জাবাল বলছেন, হায়! আমার এই প্রতিদান এবং ইজ্জত সম্মানের কথা মানুষ যদি জানতো। অতপর তিনি তাঁর ডানে বামে তাকিয়ে বললেন, হে ইবনে রাওয়াহা, হে ইবনে মাযউন,
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَه وَاَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাতের ওয়ারিস বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা সেথায় দিব্যি আরামে অবস্থান করি। সৎকর্মশীলদের জন্য কতইনা উত্তম প্রতিদান! অতপর তিনি আমার সাথে সালাম মুসাফাহা করলেন।
(ইবনুল কায়্যিম রহ.এর কিতাবুর রূহ পৃষ্টা ৭১)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:) এর শেষ বিদায়ের অবস্থা

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা:) এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে বললেন, আমার পশমের জুব্বাটি নিয়ে আসো। এটা নিয়ে আসা হলো। যা অত্যান্ত পুরাতন, জীর্ণশীর্ণ ছিল। সাদ (রা:) বললেন, আমাকে এটা দ্বারা কাফন পরাবে। বদর যুদ্ধে এ জুব্বাটি আমার পরনে ছিল। (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৮০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:) পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আমর ইবনুল আস ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে তের বছরের বড় ছিলেন। রাসুল সা. থেকে হাদিছ শিখার অনুমতি তিনি লাভ করেছিলেন।
তাঁর মৃত্যু ৫৫ হিজরীতে তায়েফে হয়েছিল। এক বর্ণনামতে, ৬৫ হিজরীতে মিসরে হয়েছিল।
তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, তাকে ডেকে আন। তাঁকে আমি আমার মেয়ে সম্পর্কে একটা কথা বলেছিলাম, যা ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার ন্যায়। আমি চাইনা মুনাফিকির এক তৃতীয়াংশ নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করি। আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য রাখছি, আমি আমার মেয়েকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।
(ইবনে আবিদ দুনিয়া)

72

নেফাক সম্পর্কিত যে হাদিছটি সম্পর্কে তিনি ভীত ছিলেন তা হল-

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত উকবা ইবনে আমির জুহানি (রা:)

উকবা ইবনে আমির জুহানী (রা:) মুআবিয়া (রা:) এর পক্ষ থেকে মিশরের গভর্ণর ছিলেন। আর মিশরেই ৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাবরানীর বর্ণনায় উল্লেখ আছে, উকবা বিন আমির মৃত্যুকালে বলেছিলেন-

يَابَنِيَّ اِنِّىْ اَنْهَا كُمْ عَنْ ثَلَاثٍ فَاحْتَفِظُوْابِهَا' لَاتَقْبَلُوْا الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا مِنْ ثِقَةٍ' وَلَا تَدَيَّنُوْا وَلَوْلَبِسْتُمُ الْعَبَاءَ' وَلَا تَكْتُبُوْا شِعْرًا تَشْغَلُوْابِهِ قُلُوْبَكُمْ عَنِ الْقُرْاٰنِ

এই ওসীয়ত করেই মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:)

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা:) খায়বারের বছর মুসলমান হন। অতপর বসরায় স্থানান্তর হন। মৃত্যু পর্যন্ত বসরাতেই অবস্থান করেন। ৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এক বর্ণনা মোতাবেক, তার মৃত্যু ৫৩ হিজরীতে হয়েছে। তিনি ফকীহ ছাহাবী ছিলেন।

তিনি মৃত্যুকালে বলেছিলেন-

اِذَا اَنَا مِتُّ' فَشُدُّوْا عَلَى بَطْنِى عِمَامَةً وَاِذَا رَجَعْتُمْ فَانْحَرُوْا وَاَطْعِمُوْا

(তাবরানী)

হযরত আবু মালিক আশআরি (রা:)

আবু মালিক আশাআরী (রা:) তার মৃত্যুকালে বলেছিলেন-

يا سامع الاشعر يبن ليبلغ الشاهد منكم الغائب انى سمعت رسول الله صلى ' الله عليه وسلم يقول حلوة الدنيا مرة الاخرة ومرة الدنيا حلوة الاخرة

রাসুল (সা:) বলেছেন, দুনিয়ার মিষ্টতা আখেরাতের তিক্ততার মাধ্যম হয় আর দুনিয়ার তিক্ততা আখেরাতের মিষ্টতার কারণ হয়। দুনিয়াকে তিক্ত মনে কর, তিক্ত রাখ। তাহলে আখেরাতে মিষ্টতা নসীব হবে। (আহমদ, তাবরানী)

73

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা:)

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা:) ৭৭ বছর বয়সে ৫০ অথবা ৫৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টি শক্তি চলে যায়।

মৃত্যুকালে উম্মে মুবাশ্‌শির তাঁকে বললেন, আমার ছেলেকে আমার সালাম বলিও। অথচ তার ছেলে রাসুলের সাথে যুদ্ধের ময়দানে শাহাদতবরণ করেন। তখন কা'ব (রা:) বললেন, আরে তুমি কি রাসুলের হাদিছ শুন নি? রাসুল (সা:) বলেছেন, رُوْحُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ মুমীনের রূহ জান্নাতের গাছে গাছে উড়তে থাকে। এমনকি কিয়ামতের দিন সে পুনরুত্থান লাভ করবে। তখন উম্মে মুবাশ্‌শির বললেন, কেন শুনবনা? রাসুল (সা:) এমন বলেছেন তবে আমি ভুলে গেছি। (তাবরানী)

অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে-

نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ فِىْ طَيْرِخُضْر تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ মুমীনের রূহ সবুজ পাখির আকৃতিতে জান্নাতের ফলমুল খায়।

হযরত উতবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা:)

আমর ইবনে আউফ (রা:) বলেন, উতবা ইবনে আবু সুফিয়ানের মৃত্যুকালে আমি তাঁর নিকটে ছিলাম। মৃত্যুযন্ত্রণার সময় তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে যাওয়ার অবস্থায় একটি হাদিছ শুনাব, যা আমার বোন উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা:) শুনিয়েছেন। হুজুর (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ১২ রাকাত চাশতের নামাজ পড়বে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন।

(এই হল রাসুলের হাদিছ ও দ্বীন প্রচারের জোশ, মৃত্যুও তাদেরকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি)(ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৭৮)

হযরত সালমান ফারসি (রা:)

হযরত সালমান ফারসি (রা:) মরণকালে কাঁদতে লাগলেন। কেউ বলল, কান্নার কারণ কি? আপনি রাসুল (সা:) এর সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। রাসুল ইন্তেকালের সময় আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

74

সালমান ফারসি (রা:) বললেন, আমি না মৃত্যু ভয়ে কাঁদছি আর না দুনিয়া ছেড়ে দেওয়ার কারণে; বরং রাসুল (সা:) আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, মুসাফিরের মতো যেন আমরা দুনিয়া থেকে উপকার গ্রহণ করি। কিন্তু আমরা এ অঙ্গীকার পুরণ করিনি, এজন্যে কাঁদছি।

অথচ মৃত্যুর পর তাঁর ঘরে ১০ দিরহামের অধিক মাল-সম্পদ পাওয়া যায়নি। এই সামান্য সম্পদ অধিক মনে করে কেঁদেছেন। অতপর সালমান ফারসি সামান্য সুগন্ধি চাইলেন। বিবিকে বললেন, এই সুগন্ধি আমার বিছানায় ছিটিয়ে দাও। এখন আমার কাছে এমন একদল মাখলুক আসছেন যারা মানুষও নয়; জ্বিনও নয়। (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৭২)

সালমান ফারসি রা. ঐ সকল ছাহাবীদের একজন ছিলেন, যাদের প্রশংসা রাসুল করেছেন। বর্ণিত আছে, তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত আসক্ত। এরা হলেন হযরত আলী (রা:), আম্মার (রা:), এবং সালমান ফারসি (রা:)। এ সকল নাম রাসুল (সা:) বলেছেন। (তিরমীযী, হাকিম)

হাবীব ইবনে হাছান বলেন, সালমান ফারসী (রা:) মরণের সময় কাঁদতে লাগলেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি রাসুলের সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাহলে আবার কাঁদেন কেন?

তিনি বললেন, না আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদতেছি আর না দুনিয়ার লোভে বরং রাসুল (সা:) এর একটি অঙ্গীকার স্বরণ করে কাঁদছি। তা হল রাসুল (সা:) বলেছিলেন- لِيَكُنْ بَلَاغُ اَحَدِكُمْ كَزَادِالرَّكِبِ তোমাদের সম্বল যেন মুসাফিরের সম্বলের ন্যায় হয়। আমি অঙ্গীকার পুরণ করতে পারিনি। অথচ তাঁর মরণের পর ঘরে হিসাব করে দেখা গেল বিশ দিরহামের উপরে কোন সম্পদ নেই।

হযরত শা'বী রহ. বলেন, জলুলা বিজয়ের দিন একটি মিশকের থলে তাঁর হস্তগত হয়েছিল। এটা তার স্ত্রীর কাছে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। মৃত্যুকালে বললেন, ঐ মিশকগুলি পানির মধ্যে ঢেলে আমার বিছানার চতুর্দিকে ছিটিয়ে দাও। এখন আমার কাছে এমন কিছু মেহমান আসবে যারা মানুষও নয়; জ্বিন ও নয়। না আছে তাদের খাবারের প্রয়োজন। তাদের জন্য এই সুগন্ধি ছড়িয়ে দাও যাতে কমপক্ষে তারা সুগন্ধি পায়।

তাঁর স্ত্রী বুকায়রাকে বললেন, আমাদের বালাখানার সকল দরজা খুলে দাও। আজ আমার মেহমানরা আসবেন। কোন দরজা দিয়ে তারা প্রবেশ করবেন

জানা নেই। অতপর মিশক মিশ্রিত পানি চাইলেন। বললেন, এটা আমার বিছানায় ছিটিয়ে দাও। তারপর বললেন, তোমরা সবাই বালাখানার নিচে চলে যাও। কিছুক্ষণ পর এসে আমাকে আমার বিছানায় পাবে।
বুকায়রা বলেন, আমি কথামত নিচে চলে গেলাম। যখন উপরে উঠে দেখলাম, রূহ চলে গেছে। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন নিজ বিছানাতে শায়িত। (তাবকাতে ইবনে সাআদ)
তিনি বয়স্ক সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন। ৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) রাসুলের বিশেষ খাদিমদের একজন। صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادَةِ وَالسِّوَاكِ তাঁর মৃত্যুকালে হযরত উছমান রা. তাঁর সেবার জন্য গেলেন।
ইবনে মাসউদকে বললেন, আপনার কষ্ট কিসের? ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আমি আমার গুণাহকে ভয় পাচ্ছি।
উছমান (রা:) বললেন, আপনার কোন চাহিদা আছে কি?
তিনি বললেন, رَحْمَةُ رَبِّىْ আমার রবের রহমত পাওয়া আমার চাহিদা।
উছমান (রা:) বললেন, আপনি তো বায়তুলমাল থেকে কয়েকবছর যাবৎ ভাতা নিচ্ছেন না, এগুলো দিয়ে দেই।
ইবনে মাসউদ বললেন, আমার কোন প্রয়োজন নেই।
উছমান (রা:) বললেন, এগুলো আপনার মেয়েদের কাজে আসবে। ইবনে মাসউদ বললেন, হে উছমান! আপনি কি আমার মেয়েদের দারিদ্রতার ভয় করছেন? আমি তো তাদেরকে আদেশ করেছি, প্রত্যেক রাতে সুরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করবে। কেননা আমি রাসুলকে বলতে শুনেছি, যে প্রত্যেক রাতে সুরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে তাকে কখনও দারিদ্রতা স্পর্শ করবে না।
রাত হতে না হতেই ইবনে মাসউদ যিকির করতে করতে আল্লাহর সাক্ষাতে চলে গেলেন।
(ইস্তিয়াব, উসদুল গাবা, তাযকিরাতুল হুফফাজ)

76

হযরত আছিম বিন ছাবিত (রাঃ)

যখন হযরত আছিম বিন ছাবিত (রাঃ) শহিদ হলেন, তখন মুশরিকরা চাইল মাথা কেটে নিয়ে যেত। সালাফা নামক ব্যক্তি আছিমের মাথার খুলির মধ্যে শরাবপানের মান্নত করেছিল। সে এটা নিয়ে বিক্রি করে দিবে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এভাবে হেফাজত করলেন যে, ভিমরুল অথবা মৌমাছির পাল মুশরিকদেরকে নিকটে আসতে দেয়নি। তারা বলতে লাগল, রাতে যাওয়ার সময় আমরা মাথা নিয়ে যাব। কিন্তু তারা আসার আগেই আল্লাহ তায়ালার হুকুমে উপত্যকা পানি দ্বারা ভরপুর হয়ে গেল। আর পানি তাঁর মাথাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

হযরত আসিম রা. আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন,

اَنْ لَا يَمَسَّ مُشْرِكًا وَلَا يَمَسُّه مُشْرِكٌ হে প্রভু! আমি কোন মুশরিককে স্পর্শ করব না; আর কোন মুশরিক যেন আমাকে স্পর্শ না করে। আল্লাহ তার ওয়াদা পূর্ণ করলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধের পূর্বে রাসুলের খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল তের বছর। আমার পিতা রাসুল (সাঃ) এর সামনে আমার শক্তির প্রশংসা করলেন। রাসুল (সাঃ) আমার আপাদমস্তক অবলোকন করে আমাকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দিলেন না। বললেন, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

যখন যুদ্ধ হতে ফিরলেন তখন রাসুল (সাঃ) আমার দিকে নজর করে বললেন, হে সা'দ ইবনে মালিক! আমি বললাম, হ্যাঁ।

অতপর রাসুলের কাছে পৌঁছে হাঁটু মোবারকে চুমু দিলাম। রাসুল শোকপ্রকাশ করে বললেন- آجَرَكَ اللهُ فِىْ اَبِيْكَ আল্লাহ তোমার পিতাকে নিয়ে গেছেন। আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দান করুক।

রাসুলের সাথে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।তিনি ৭৪ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

আবু সাঈদ খুদরী রা. মৃত্যুর সময় নতুন কাপড় তৈরী করে আনালেন। তিনি তা পরিধান করতে করতে হাদিছ শুনালেন।

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِىْ ثِيَابِهِ الَّتِىْ يَمُوْتُ فِيْهَا

মৃতব্যক্তিকে তার কাফনের কাপড়সহ কবর থেকে উঠানো হবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হাদিছের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করার নিয়তে এ ওসিয়ত করে নতুন কাপড় চেয়ে পরিধান করেছেন। অথবা কাফনের কাপড় নতুন হওয়া সংক্রান্ত অন্যান্য হাদিছ বর্ণিত থাকার কারণে এটার উপর আমল করেছেন। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা তাঁরও জানা ছিল যে, এখানে মানুষের আমল উদ্দেশ্য। অধিকাংশ মুফাসসিরগণ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর তাফসীর করেছেন عَمَلُكَ দ্বারা। হাশরের ময়দান সম্পর্কে রাসুল বলেছেন,

يُحْشَرُ النَّاسُ جُفَاةً عُرَاةً মানুষকে উলঙ্গ অবস্থায় নগ্ন পায়ে হাশরের মাঠে উঠানো হবে।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা:) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের একজন। কুফা বিজয়ের পর হযরত উসমান গনী (রা:) তাকে কুফার শাসক নিযুক্ত করেন। দুপক্ষে সালিশ নির্ধারণ সংক্রান্ত ঘটনার পর এটার যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে কুফা ছেড়ে মক্কা শরীফে চলে আসেন। এক বর্ণনা মুতাবেক, তিনি মক্কাতে ইন্তিকাল করেন। সেখানে তাঁর দাফন করা হয়।

তিনি মৃত্যুর সময় মেয়েদেরকে নসিহত করলেন, রুটিওয়ালাদের ঘটনা তোমরা স্বরণ কর। ঘটনাটি হলো, একজন আবিদ ব্যক্তি তার ইবাদত খানায় সত্তর বছর যাবত ইবাদত করেছিলেন। একদা শয়তান মহিলার রূপধারণ করে তাঁর নিকট প্রকাশ হল। তখন এই আবিদ সাত রাত্রি তার সাথে অতিবাহিত করলেন। অতপর তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন এবং তওবা করলেন। তিনি তার ইবাদত খানা থেকে বাহির হয়ে মিসকিনদের সাথে থাকতে লাগলেন। এ সকল মিসকিনদের একটি রুটি সদকা করলেন। সকালবেলা ঐ আবেদ মৃত্যুবরণ করলেন। আল্লাহ তায়ালা সত্তর বছরের ইবাদতকে ঐ সাত রাতের সাথে তুলনা দিলেন। তখন সাত রাতের গুণাহের পাল্লা সত্তর বছরের ইবাদতের চেয়ে ভারী

হয়ে গেল। অতপর ঐ সাত রাতের সাথে এক রুটিকে ওজন করা হলো। রুটির পাল্লা ভারী হয়ে গেল। (জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম)

মৃত্যুকালে তিনি ছেলেদেরকে এবং খাদেমদেরকে হুকুম করলেন, তোমরা আমার কবর অধিক গভীর ও প্রশস্ত করে খনন কর।

তারা খনন করে এসে তাঁকে অবহিত করল। তখন তিনি বললেন, কবর দুই অবস্থা হতে খালি নয়, হয়ত কবর আমার জন্য প্রশস্ত করে দেওয়া হবে চতুর্দিকে ৪০গজ প্রশস্ত, অতপর জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। আমি সেখানে আমার বিবিদেরকে এবং আমার বালাখানা দেখব। আল্লাহ আমার জন্য যে সব নিয়ামত জান্নাতে তৈরী করে রেখেছেন তা আমি দেখতে থাকব এবং জান্নাতের ঘ্রাণ কিয়ামত পর্যন্ত আমার কাছে পৌঁছবে।

আল্লাহ না করুক! যদি অপর অবস্থা হয় তাহলে বর্শার ফলার থেকে চিকন বানিয়ে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হবে। সেখানে আমার সাথিদেরকে দেখব এবং পুনরুত্থান পর্যন্ত জাহান্নামের ধোঁয়া আমার কবর পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে।

তাঁর মৃত্যু ৫২ অথবা ৪২ হিজরীতে হয়েছে।

হযরত উবাদা ইবনে ছামিত (রা:)

হযরত উবাদা ইবনে ছামিত (রা:) গোত্রপতি ছাহাবদের একজন ছিলেন। আকাবায়ে উলা, ছানীয়া, ছালিছা তিনটির মধ্যে তিনি শরিক ছিলেন এবং সকল যুদ্ধে রাসুল (সা:) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রা:) এর খেলাফতকালে তাঁকে শামের বিচারক এবং শিক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি হিমছে অবস্থান করলেন। অতপর ফিলিস্তিনে স্থানান্তরিত হলেন এবং রামাল্লায় মৃত্যুবরণ করলেন।

এক বর্ণনা মোতাবেক, ৩৪ হিজরীতে ৭২ বৎসর বয়সে বায়তুল মাকদিসে হিজরত করেন। অপর আরেক বর্ণনামতে, হযরত মুআবিয়া (রা:) এর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। ওলিদ ইবনে ওবায়দা বলেন, আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে ডেকে একটি হাদিস শুনালেন-

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ
اُكْتُبْ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا اَنَا اَكْتُبُ؟ قَالَ اُكْتُبُ الْقَدْرَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ

আমি রাসুলকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং বললেন, লিখ। কলম বলল, কি লিখব? আল্লাহ বললেন, তাকদির এবং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যা হবে তা লিখ।(ইবনে আবি হাতীম, আহমদ, তিরমিযী)

আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি ওলিদ ইবনে উবায়দাকে বললেন, তোমার পিতা কি ওসিয়ত করেছেন?

ওয়ালিদ বললেন, পিতা আমাকে বলেছেন, يَابُنَىَّ اِتَّقِ اللهَ হে সন্তান! আল্লাহকে ভয় কর। এটি নিশ্চিত সাথে জেনে নাও যে, তোমরা তাকওয়া ও ঈমানের উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। ভালো মন্দ তাকদিরের উপর ঈমান না আনলে তাকওয়া এবং ইলিম তোমরা পাবে না।

অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভালো মন্দ তাকদীরের উপর কিভাবে ঈমান আনব? তার উদ্দেশ্য কি?

আমার পিতা বললেন, এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনে নেও, যা কিছু তোমার কাছে পৌঁছেছে তা ভুলে পৌঁছে নি। আর যা কিছু পৌঁছেনি তা কখনো পৌঁছবে না। এটা হলো তাকদীর। তাকদীরের উপর বিশ্বাস রেখে তোমার মৃত্যু হলে জাহান্নাম তোমার ঠিকানা হবে না। فَاِنْ مِتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ

অতপর এ হাদীস শুনালেন, রাসুল (সা:) বলেছেন-

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اُكْتُبْ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا اَنَا اَكْتُبُ؟ قَالَ اُكْتُبُ الْقَدْرَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ

ছানাবিহী (রা:) বলেন, যখন হযরত উবাদা (রা:) এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসল তখন আমি তার পাশে ছিলাম। আমার কান্না এসে গেল। উবাদা (রা:) বললেন, তুমি কান্না কর কেন? আল্লাহর কসম, যদি কিয়ামতের দিন আমাকে সাক্ষি হিসাবে ডাকা হয়, তখন আমি তোমার জন্য উত্তম সাক্ষি দিব। আমার সুপারিশের অনুমতি মিললে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব। আমার সামর্থ অনুপাতে তোমার উপকার করব।

অতপর বললেন, এখন যে হাদীস তোমাদের শুনালাম তা ছাড়া বাকি রাসুল থেকে শ্রবণকৃত সকল হাদীস আমি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি। আমি হুজুর (সা:) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ সাক্ষি দেয় জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম। (ফাজায়েলে সাদাকাত-পৃষ্টা ৪৭৭)

80

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে কুরাইয (রাঃ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে কুরাইয (রাঃ) এর মৃত্যুযন্ত্রণার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের লোকদেরকে বললেন, এই দুইজন রোজাদার। আমার মৃত্যুর কারণে তাদের খাবারে যেন বিলম্ব না হয়। ইফতার দেরি যেন না হয়।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলতে লাগলেন, কাউকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং দান করার পথ একমাত্র মৃত্যুযন্ত্রনাই বাঁধা দেওয়ার ছিল। কিন্তু এটাও তোমার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাঁর মৃত্যু এ অবস্থায় হলো যে, খানা তাঁর মেহমানের সামনে রাখা ছিল। (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্ঠা ৪৭৮)

হযরত আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস (রাঃ)

হযরত আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর চাচাত ভাই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় পরিবারের লোকরা কান্না শুরু করে দিল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর থেকে যবান দ্বারা কোন খারাপ শব্দ ব্যবহার করেনি এবং শরীর দ্বারা কোন খারাপ কাজ করেনি তার জন্য কোন কান্না কর না। (তার মৃত্যু মহা আনন্দের) (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা-৪৭৭)

হযরত ইকরামা রা.এবং তাঁর সাথি (রাঃ)

হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহল (রাঃ) মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন।
ইয়ারমুকের যুদ্ধে তাঁর বাহাদুরির ঝলক দেখিয়েছেন। ইয়ারমুক যুদ্ধে একবার মুসলমানরা কঠিন বিপদের সম্মুখিন হল। তখন তিনি তাঁর উৎকৃষ্ট ঘোড়া থেকে নেমে তরবারির খাপ ভেঙ্গে নিক্ষেপ করেন। খোলা তরবারি নিয়ে পায়ে হেঁটে রোমকদের সারির ভিতর পৌঁছে গেলেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ডেকে বললেন, হে ইকরামা, এরূপ কর না। নিশ্চয় তোমার মৃত্যু মুসলমানদের জন্য অনেক কষ্টকর হবে।

হযরত ইকরামা রা.বললেন, হে খালিদ, তুমি আমার থেকে দুরে থাক। আপনি জানেন আমার পিতা রাসুল (সাঃ) এর কঠিনতর দুশমন ছিলেন। অতএব আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আমার পূর্বের ভুলের কিছু কাফফারা আদায়

করতে চাই। আমি রাসুলের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছি অতএব আজকে আমি রোমকদের থেকে কখনো পলায়ন করব না।

অত:পর ইকরামা (রা;) উচ্চস্বরে বললেন, মৃত্যুর উপর বায়আত নিতে কে কে প্রস্তুত আছ? তখন হারিছ ইবনে হিশাম এবং যিরার ইবনে আজওয়ারসহ চারশত মুসলমান বায়আত করলেন। তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ খালিদ (রা:) এর তাবুর পাশেই সংগঠিত হল। এবং মুসলমানরা বিজয়ি হলো। ইয়ারমুকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের বড় একটি দল পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পানির পিপাসায় জীবন দিয়েছেন।

যখন পিপাসার্ত ব্যক্তির নিকট পানি পৌঁছল তখন আরেক জনের আহ শব্দ শুনে নিজে পানি পান না করে অপরজনকে পান করানোর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। হারিস ইবনে হিশাম, আইয়্যাশ বিন রাবেয়া (রা:) এবং ইকরামা (রা:) আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। হযরত হারিস (রা:) যখন পানি চাইলেন তখন পানি তার সামনে আনা হল। হারিছ রা. দেখলেন ইকরামা পানির দিকে তাকিয়ে আছেন। হারিছ ইশারা দিয়ে বললেন, ইকরামাকে আগে পানি দাও।

যখন পানি ইকরামার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তিনি দেখলেন, আইয়্যাশ বিন রাবিয়া পানির দিকে তাকিয়ে আছেন। ইকরামা ইশারা দিয়ে বললেন, তাঁকে পানি দাও। আইয়্যাশ (রা:) এর কাছে পানি নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। অতপর বাকী দুইজনের কাছে এসে দেখা গেল তারাও মৃত্যুবরণ করেছেন।

سَقَاهُمْ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِ الْكَوْثَرِ شَرْبَةً لَا يَظْمِأُوْنَ بَعْدَهَا

মাগাযি লেখকগণ লেখেন, হযরত ইকরামা, সুহাইল বিন আমর, সাহল ইবনে হারিছ, হারিছ বিন হিশাম, এবং মুগীরা গোত্রের কিছু লোক এভাবে পানি পিপাসায় প্রাণ হারান। যখন তাদের কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলো তখনই একে অপরের দিকে ইঙ্গিত করতেন।

হযরত ইকরামা (রা.) এর কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলে তিনি দেখলেন, সুহাইল ইবনে আমর পানির দিকে চেয়ে আছেন। ইকরামা বললেন, আগে সুহাইলকে পানি দাও। যখন সুহাইলের কাছে যাওয়া গেলো তখন তিনি দেখলেন, সাহল পানির দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি বললেন, আগে সাহলকে পানি দাও। মোটকথা: সকলেই একে অপরকে অগ্রাধিকার দিয়ে পানির পিপাসায় মারা গেলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা:) তাদের লাশের পাশ

দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতে লাগলেন, তোমাদের জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক, এই মৃত্যুর মুহুর্তেও অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়া তোমাদের থেকে দূর হয়নি।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ)

রাসুল (সাঃ) মক্কা শরীফের দারে আরকামে প্রবেশের আগে খাব্বাব ইবনে আরাত মুসলমান হন। তিনি মদীনায় হিজরত করেন। বদরী যুদ্ধাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, আরও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কুফা বিজয়ের পর সেখানে তিনি স্থানান্তরিত হন। ৩৭ হিজরিতে ৭৩ বছর বয়সে কুফাতে ইন্তেকাল করেন।

বলা হয়ে থাকে, তিনি কুফাতে ইন্তেকালকারী প্রথম সাহাবী। হযরত আলী (রাঃ) তার জানাযার নামাজের ইমামতি করেন।

গনীমতের মাল হিসাবে তিনি যা পেতেন তা ঘরের কোণে রেখে দিতেন। বিশ্বস্ত গরীবদেরকে বলে দিতেন, যার যে সময় যতটুকু প্রয়োজন এখান থেকে যেন নিয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও তিনি পরকালে হিসাব দেওয়ার ব্যাপারে ভীত ছিলেন। মৃত্যুকালে এই সম্পদের কথা মনে করে কেঁদেছেন এবং বলেছেন, আমার সাথিরা দুনিয়া থেকে এই অবস্থায় চলে গেল যে, দুনিয়াতে তারা কোন প্রতিদান পাননি। তাদের বিপরীতে আমি পেয়েছি। তাই আমার ভয় হয় এই মালের কারণে হিসাবের সম্মুখীন হতে হয় কিনা?

হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে দাফন দেওয়ার পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহ খাব্বাবকে রহম করুন। তিনি আবেগী হয়ে ইসলামগ্রহণ করেন এবং হিজরত করেন। মুজাহিদ অবস্থায় জীবন যাপন করেন। যারা উত্তম কর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

(ইসাবা, উসদুল গাবা, ইস্তিয়া'ব, তাহযীবুত তাহযীব, হিলয়াতুল আউলিয়া)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের একজন। রাসুল (সাঃ) যুদ্ধের বিভিন্ন সফরের সময় প্রায় তেরবার মদীনাতে তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করেন।

তিনি অন্ধ ছিলেন। তা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা:) যখন কাদেছিয়া যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনি প্রেরণ করেন তখন তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমও ছিলেন। বর্ম এবং অস্ত্র দ্বারা নিজের শরীরকে সজ্জিত করে মুসলমানদের ঝাণ্ডা উঠালেন।

কয়েকদিন পর্যন্ত তীব্র যুদ্ধ চলল। এমন যুদ্ধ পৃথিবীবাসী কমই দেখেছে। মুসলমানদের বিজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা: ইসলামের ঝাণ্ডাকে বগলে চেপে ধরে উঁচু করে শহীদ হয়ে পড়ে আছেন। (ইসাবা, তাবাকাতে কুবরা, সিফাতুছ ছাফওয়া, যায়লুল মাযিল)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা:)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা:) মুহাজিরদের মধ্যে জন্মলাভকারী প্রথম সন্তান। জন্মের পর তাঁর সম্মানিতা মাতা হযরত আসমা (রা:) তাকে নিয়ে রাসুলের কাছে আসলেন। রাসুল (সা:) তাকে তাহনীক (খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন) করালেন, বরকত দান করলেন।

৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে শহিদ করেছে। তাঁর শাহাদতের কাহিনি হায়াতুস সাহাবাতে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। শাহাদতের কিছু পূর্বে তাঁর মাতার (যিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন) কাছে পৌঁছে সালাম প্রদান করেন।

মা বললেন, এই কঠিন মুহুর্তে তুমি এখানে কেন আসলে? বললেন, পরামর্শ করার জন্য।

মা বললেন, কোন বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য? তিনি বললেন, আমার সঙ্গী মাত্র অল্প কয়েকজন অবশিষ্ট আছে, কিছু সময় তারা মোকাবেলা চালিয়ে যাবে। এদিক দিয়ে বনি উমাইয়া থেকে ধারাবাহিক প্রতিনিধি আসছে।

তারা বলছে, দুনিয়ার যাহা কিছু চাও আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ কর। বিনিময়ে হাতিয়ার ফেলে দাও।

হযরত আসমা (রা:) গর্জনের সাথে আওয়াজ দিয়ে বললেন, যদি তোমারা নিজেকে সত্যের উপর মনে কর, তাহলে তোমার সাথিরা যেভাবে তোমার ঝাণ্ডাকে তুলে শাহাদতবরণ করেছে তুমিও তাদের অনুসরণ করবে। কিন্তু তুমি যদি দুনিয়া চাও তাহলে তুমি তোমার এবং তোমার সাথিদেরও দুনিয়া আখেরাত ধ্বংস করবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা. বললেন, মা, আজ অবশ্যই আমি নিহত হবো। মা বললেন, হে সন্তান, বনু উমাইয়া যদি তোমাকে হত্যা করে, তোমার দ্বারা খেলা করে তাহলেও তোমার জন্য হাজ্জাজের হাতে সোপর্দ হওয়া থেকে এটা উত্তম হবে।

এটা শুনে আব্দুল্লাহ (রা:) আনন্দে বলে উঠলেন, কত মহান একজন মা আমার নসীব হয়েছে! এমন কথা শুনার জন্যই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমার আল্লাহ জানেন যে, আমার ভিতরে কোন ভয় বা দূর্বলতা নেই। হে আমার মা, যা কিছু তুমি পছন্দ করেছ তার দিকেই গমন করব। আমার শাহাদতের খবর পেয়ে তুমি আফসোস কর না। আমাকে আল্লাহর সোপর্দ করে দিও।

মা তখন শোকর আদায়ের নিমিত্তে বললেন-

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِىْ جَعَلَكَ عَلى مَا يُحِبُّ واُحِبَّ'اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِىْ جَعَلَكَ عَلى مَا يُحِبُّ واُحِبَّ

আমার মালিক যা পছন্দ করেন তোমার দিকে যেন পরিচালিত করেন। অতপর মা বললেন, হে সন্তান, তুমি আমার কাছে আস আমি তোমাকে চুমু দিব। তোমার শরীর বোলাব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা:) মায়ের হাত পায়ে চুমু দেন, চেহারা ফিরিয়ে ফিরিয়ে চুমু দিতে লাগলেন। মা বললেন, এটা কি? বললেন, আমার বর্ম। মা বললেন, শাহাদতের আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি তা পরিধান করতে পারে না। বের করে দাও। আর একটি পায়জামার উপর আরেক পায়জামা পরে নাও। যাতে তীরের আঘাতে পা জখম হলে কাপড় ছিড়ে যাওয়ার কারণে তোমার সতর দেখা না যায়। অতপর মা দোয়া করলেন ছেলের জন্য-

اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْ طُوْلَ قِيَامِه اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ قَدْ سَلَّمْتُه لِاَمْرِكَ وَرَضِيْتُ بِمَا قَضَيْتَ لَه

আল্লাহ বৃদ্ধা মায়ের দোয়া কবুল করলেন। যেই মা শত বছরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ বয়সেও তার কোন দাঁত পড়েনি। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে কোন ত্রুটি সৃষ্টি হয়নি। মা ও ছেলে উভয়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত করুন।

হযরত হুবাইব বিন যায়েদ বিন আসিম মাজনী (রা:)

হযরত হুবাইব বিন যায়েদ বিন আসিম (রা:) কে হুযুর (সা:) মুসাইলিমাতুল কাজ্জাবের কাছে চিঠি দিয়ে প্রেরণ করেন।

মুসাইলিমা যখন কিছুটা পড়ল তখন অত্যন্ত রাগন্বিত হল। সে হুবাইব ইবনে যায়েদের ব্যাপারে হুকুম করল, তাকে বন্দী কর এবং কাল সকালে আমার কাছে উপস্থিত কর।

পরের দিন সকালে যখন তাঁকে মুসাইলিমার সামনে উপস্থিত করা হলো তখন তার অনুসারীদের একটি দল সেখানে বিদ্যমান ছিল। বেড়ী পরিহিত অবস্থায় তাকে মুসাইলিমার সামনে উপস্থিত করা হলে সে তাঁকে বলল:

اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ হযরত হুবাইব বললেন نَعَمْ (হ্যাঁ)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ মুসাইলিমা রেগে জিজ্ঞেস করল:.

وَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ তুমি কি আমার ব্যাপারে পয়গাম্বর হওয়ার সাক্ষি দাও? হুবাইব (রা:) তখন কৌতুহলবশত বললেন, আমি কানে কিছু কম শুনি, তুমি কি বলছ আমি শুনতে পাচ্ছি না।

মুসাইলিমা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে জল্লাদকে হুকুম করল, তার শরীরের একটি অংশ কেটে দাও। যখন একটি অংশ কেটে জমিনে ফেলা হলো তখন মুসায়লামা আবার প্রশ্ন করল, اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ তুমি কি সাক্ষি দাও মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসুল? তিনি আবারও জবাব দিলেন,

نَعَمْ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ. অতপর মুসাইলিমা বলল, আমি আল্লাহর রাসুল একথা কি সাক্ষ্য দাও? সে জবাব পেল, তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি। তখন মুসাইলিমা আরেকটি অঙ্গ কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিল।

এভাবে প্রশ্ন আদানপ্রদান চলছে এবং হুবাইবের একেকটি অঙ্গ কাটা যাচ্ছে। এমনকি তার শরীরের অর্ধাংশ কেটে আলগ করে দেয়া হলো। বাকি অর্ধাংশ নিয়ে কথা বলছেন, এই অবস্থায় তাঁর রূহ ইল্লিয়ীনে পৌঁছে যায়। তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

যখন তাঁর মা নুসাইবা শাহাদতের সংবাদ শুনলেন, তখন বললেন, এমন মৃত্যুর জন্য আমার সন্তান জন্ম দিয়েছি। লালন-পালন করেছি। প্রস্তুত করেছি। এটাকে আমি আল্লাহর কাছে পুণ্যের বিষয় মনে করি।

(উসদুল গাবা, আনছাবুল আশরাফ, তাবকাতুল কুবরা, ইবনে হিশাম।)

হযরত আকসাম বিন সাইফী (রা:)

হযরত আকসাম (রা:) অধিক বয়স প্রাপ্ত সাহাবীদের একজন। ১৯০ বছর হায়াত লাভ করেন। রাসুলের সংবাদ যখন তিনি পেলেন তখন বিষয়টা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য দুইজন ব্যক্তি প্রেরণ করেন। তারা রাসুলের বিস্তারিত অবস্থা তাকে জানালেন এবং কুরআনের আয়াতও শুনালেন।

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

কুরআনের আয়াত শুনে আকসাম বিন সাইফী বললেন, তিনি তো উত্তম চরিত্রের আদেশ করেন। মন্দ কর্ম থেকে নিষেধ করেন। তাই তোমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। পিছু থাকা উচিৎ নয়।

এক বর্ণনায় এসেছে, ১০০ জনের বিরাট এক জামাত নিয়ে তিনি রওয়ানা হন। যাদের মধ্যে আকরা বিন হাবিছ এবং আবু তামীমা প্রমুখ ছিলেন।

যখন মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে চার রাতের দুরত্বে একস্থানে অবস্থান নিলেন। তখন আকসাম বিন সাইফীর ছেলে হুবাইশ যিনি এই ছফরে ছিলেন। সব পানির পাত্র ভেঙ্গে ভাসিয়ে দিলেন।

ছফরের এখনও চার রাত বাকি রয়েছে। সওয়ারিহীন, পানিহীন, দুই শত বছরের বয়স্ক আকসাম বিন সাইফী যখন তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী বুঝে নিলেন তখন সাথিদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের ছফর চালিয়ে যাও। এবং মুহাম্মাদ (সা:) এর কাছে যেয়ে তাঁকে জানাবে, আমি সাক্ষি দিয়েছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রাসুল। সাথিদেরকে এ হুকুমও করলেন, তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর অনুসরণ করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।

পথিমধ্যে আকসাম বিন ছাইফী মৃত্যুবরণ করলেন। আর কাফেলা হুজুর (সা:) এর কাছে পৌঁছে তাঁর সংবাদ দিল।

হযরত হাসান বিন আলী মুরতাযা (রা:)

আমিরুল মুমিনীন হযরত হাসান বিন আলী মুরতাযা (রা:) হিজরতের ৩য় বছর রমযানের মাঝামাঝি সময়ে জন্ম লাভ করেন। ৭ম দিনে রাসুল (সা:) দুম্বা দ্বারা

তার আকিকা করলেন এবং মাথামুণ্ডন করলেন। চুল পরিমাণ রূপা ছদকা করলেন। ৪৯ অথবা ৫০ হিজরীতে মারা যান।
উমাইর ইবনে ইসহাক বলেন, আমি আর আমার এক সাথি হাসান (রা:) এর কাছে গেলাম। হাসান (রা:) বললেন, কলিজার একটি টুকরা আমি বমি করে ফেলে দিয়েছি। আমাকে বার বার বিষ দেওয়া হয়েছে, এমন বিষ আমাকে ইতিপূর্বে আর দেওয়া হয়নি।
তার ভাই হুসাইন (রা:) জিজ্ঞেস করলেন, কে বিষ দিয়েছে? তিনি নাম বলেননি।
আব্দুল্লাহ বিন হাছান বলেন, হযরত হাসান অধিক বিবাহকারী ছিলেন। যাকেই তিনি বিবাহ করেছেন সেই তাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসত। তাঁর প্রতি আসক্ত ছিল। তাকে তিনবার বিষ প্রদান করা হয়েছিল। প্রথম পান করানো হলে তার বিষক্রিয়া দূর করা হলো। ২য় বার পান করানো হলো এবারও দূর করা হলো। ৩য় বার আর দূর করা গেল না। এবারের বিষক্রিয়ায় মারা যান।
ডাক্তার দেখে বলল, তাঁর নাড়িভূড়ি কেটে গেছে। তখন তার ভাই হুসাইন রা. বললেন, কে বিষ পান করিয়েছে? তিনি বললেন, জিজ্ঞেস করে কি করবে? তখন হুসাইন (রা:) বললেন, তোমাকে দাফনের আগেই তাকে হত্যা করব। তখন হাছান (রা:) বললেন, يَا اَخِى انَّمَا هٰذِه الدُّنْيَا لَيَالٍ فَانِيَةٍ এই দুনিয়া ধ্বংসশীল কিছু রাত । হত্যাকারীকে ছেড়ে দাও। যাতে এ অবস্থায় সে আর আমি আল্লাহর দরবারে হাজির হই। (তাহযীবুল কামাল)
হযরত হাছান (রা:) ৫০ হিজরীতে রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে এ পৃথিবী ছেড়ে সুমহান রবের দরবারে পৌঁছেন। তাঁর ইন্তেকালের সময় কিছু লোক পাশে ছিল। তারা তাকে কিছু ওসীয়ত করতে বললেন। তিনি বললেন, তিনটি কথা তোমদেরকে বলব। তা শুনে তোমরা আমার থেকে চলে যেও। আর আমাকে আমার যাওয়ার স্থানে একা যেতে দিও। অতপর বললেন,
১. অন্যকে যে কাজের হুকুম করবে আগে নিজে তা করবে।
২. অন্যকে কোন কাজ থেকে বাধা দেওয়ার আগে নিজে তা থেকে বিরত হও।
৩. তোমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ হয়তো তোমাদের জন্য উপকারি অথবা অপকারি (হয়তো তা জান্নাতের দিকে হবে নতুবা জাহান্নামের দিকে হবে) এই জন্য প্রত্যেকটি কদম উঠানোর আগে চিন্তা কর তোমার পা কোন দিকে যাচ্ছে। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৭৯)

88

মৃত্যুর সময় তাঁর ছোট ভাই হুসাইন (রাঃ) পাশে বসে কাঁদছেন আর বলছেন, হে ভাই, কে তোমাকে বিষ দিল? তার পরিচয় দাও, আমি প্রতিশোধ নেব, কিসাসস্বরূপ হত্যা করব।

হাছান (রাঃ) বললেন, আমার ধারণা মতে যে ব্যক্তি আমার হত্যাকারী আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। যদি সে ব্যক্তি না হয় তাহলে নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করতে আমি প্রস্তুত নই। খোদার কছম, হাছানের প্রাণ আল্লাহর কুদরতি হাতে। কিয়ামতের দিন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ করা হবে। কিন্তু আমি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যাবো না যতক্ষণ আমার হত্যাকারীকে ক্ষমা করা না হবে।

শান্তি বর্ষিত হোক সেই মহান ব্যক্তির উপর, যিনি তার হত্যাকারীকে রক্ষা করেছেন।

হযরত হাছান (রাঃ) কে ছয়বার বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু তা ক্রিয়াশীল হয়নি। সপ্তমবার আল্লাহর বাণী-

اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

আয়াতের প্রেক্ষাপট হিসাবে আল্লাহর সাথে মিলিত হন।(খাজিনাতুল আসফিয়া পৃষ্টা ৭২)

যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল তখন বললেন, আমার বিছানা বারান্দায় নিয়ে চল। বাহির করা হলে বললেন, হে আল্লাহ! এই মহা মুসিবতে আমি আপনার কাছে সওয়াবের আশা রাখি। এত বড় মুসিবত আর কখনো আমার উপর আসেনি।

হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ)

হযরত হুসাইন (রাঃ) এর পবিত্র জন্ম চতুর্থ হিজরীর শাবান মাসে হয়। নাসায়ীর বর্ণনাতে উল্লেখ রয়েছে, রাসুল (সাঃ) হাছান-হুসাইনের পক্ষ থেকে দুটি দুম্বা জবাই করে আকিকা করেন।

তাঁর বাসস্থান মদীনাতে ছিল। জঙ্গে জামাল, জঙ্গে ছিফ্ফিন ও খাওয়ারিজদের সাথে যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর পিতার সাথে ছিলেন। এমনকি পিতার মরণ পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন। যখন খেলাফতের দায়িত্ব মুআবিয়া (রাঃ) এর হাতে হস্তান্তর হল তখন তিনি মদীনায় চলে আসলেন। মুআবিয়ার খেলাফতকালে তিনি মদীনাতে ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর ইরাকবাসির আহবানে মদীনা থেকে মক্কা শরীফে আসেন।

89

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, হযরত হুসাইন (রা:) কুফা সফরের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। আমি বললাম, যদি লোকেরা আমার আর আপনার ব্যাপারে খারাপ ধারণা না করত তাহলে আমি শক্তভাবে আটকাতাম। সামনে এক কদম অগ্রসর হতে দিতাম না। তখন হুসাইন (রা:) বললেন, মক্কা শরীফে নিহত হওয়ার চাইতে অমুক অমুক স্থানে শহীদ হওয়া শ্রেয়।

ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, একদিন দুপুরবেলা স্বপ্নে দেখলাম, রাসুল দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর চুল মোবারক ও শরীর মোবারক ধুলায় ধূসরিত, আর তাঁর কাছে এক শিশি রক্ত ।

আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হউক, হে রাসুল! এটা কি? রাসুল (সা:) বললেন, এটা হুসাইন এবং তার সঙ্গিদের রক্ত। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ঐ দিনটাকে আমি স্বরণ রাখলাম। পরে খবর নিয়ে দেখলাম, ঐ দিন ঐ সময়ে হুসাইন রা. শাহাদতবরণ করেছেন। (আহমদ)

শাহাদতের পর যখন হুসাইন (রা:) এর মস্তক ইবনে যিয়াদের সামনে রাখা হল তখন ইবনে যিয়াদ হাতের লাঠি দ্বারা হুসাইন (রা:) এর নাক, ঠোঁট স্পর্শ করে বলল, এত সুন্দর চেহারা আমি কোন দিন দেখি নি! (বুখারী তিরমিযী)

আম্মারা বিন উমায়ের বলেন, যখন ইবনে যিয়াদ ও তার সাথিদের মস্তক মসজিদে রাহবার সামনে রাখা হলো (কুফার একটি জায়গার নাম রাহবা, সেখানে মসজিদের সামনে মাথা নিয়ে আসা হয়েছিল) তখন আমি দেখতে সেখানে পৌঁছলাম। হঠাৎ শোরগোল শুনা গেল, এসে গেছে, এসে গেছে।

আমি তাকিয়ে দেখি, একটা সাপ সকলের মাথা লাফিয়ে পার হচ্ছে। ইবনে যিয়াদের মাথার সামনে এসে তার নাক দিয়ে ঢুকে আবার বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার চিৎকার শুনা গেল, এসে গেছে, এসে গেছে। এভাবে তিনবার দেখা গেল। (তিরমিযী)

হযরত সাদ বিন রাবী (রা:)

উহুদ যুদ্ধে রাসুল (সা:) বললেন, সাদ বিন রাবীর অবস্থা কি হয়েছে জানা নেই। এক সাহাবীকে তালাশে পাঠানো হল। তিনি শহীদদের দলে তালাশ করলেন। জীবিত থাকতে পারেন, এ সম্ভাবনায় ডাকও দিলেন। অবশেষে চিৎকার দিয়ে বললেন, আমাকে রাসুল (সা:) সাদ বিন রাবীর খোঁজ নিতে

পাঠিয়েছেন। তখন ক্ষীণ দূর্বল একটা আওয়াজ ভেসে এল। সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে সাতজন নিহত ব্যক্তির মধ্যখানে পাওয়া গেল। কিছু শ্বাসপ্রশ্বাস বাকি আছে।
যখন ঐ সাহাবী নিকটে গেলেন, তখন সাদ বিন রাবী (রা:) বললেন, আমার পক্ষ থেকে রাসুল (সা:) এর কাছে সালাম পৌঁছাবে আর বলবে, আল্লাহ যেন আমার পক্ষ থেকে তাঁকে (সা:) এমন প্রতিদান দান করেন, যা কোন নবী এবং তার উম্মতকে দান করা হয়নি। আর মুসলমানদের কাছে আমার এই সংবাদ পৌঁছে দিবে যে, তোমাদের একজনেরও চোখ খোলা থাকাবস্থায় অর্থাৎ একজনও জীবিত থাকাবস্থায় যদি রাসুলের কাছে কোন কাফের পৌঁছে, তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন ওজর গ্রহণ করা হবে না। এ কথা বলে তার প্রাণ বের হয়ে গেল।
(হেকায়াতে ছাহাবা পৃষ্টা ১৯২)

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা:)

উহুদ যুদ্ধে মুহাজিরদের ঝাণ্ডা তাঁর হাতে ছিল। মুসলমানরা যখন অধিক পেরেশানীর কারণে ছত্রভঙ্গ হচ্ছিলেন তখন তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। এক কাফির তাঁর নিকটে এসে তলোয়ার দ্বারা তাঁর হাত কেটে দিল, যাতে ঝাণ্ডা পড়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজয় হয়ে যায়। কিন্তু তিনি সাথে সাথে অপর হাত দ্বারা ঝাণ্ডা ধরে নিলেন। ঐ কাফির তার অপর হাতটিও কেটে দিল। তিনি উভয় হাতের বাহুকে একত্রিত করে ঝাণ্ডাকে চেপে ধরলেন, যাতে ঝাণ্ডা না পড়ে। তখন তাঁর প্রতি তীর মারল, যদ্দরা তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু জীবন থাকতে ঝাণ্ডা পড়তে দিলেন না। তাঁর শহীদ হওয়ার পর আরেক ব্যক্তি সাথে সাথে ঝাণ্ডা উঠিয়ে নিল।
দাফন করার সময় তাঁর কাছে একটি চাদর ছিল। যদ্দারা পূর্ণশরীর ঢাকা যাচ্ছিল না। মাথা ঢাকলে পা খুলে যায়, পা ঢাকলে মাথা খুলে যায়। রাসুল (সা:) বললেন, মাথার দিক চাদর দ্বারা ঢেকে দাও, পায়ের দিক ইজখিরের পাতা দ্বারা ঢেকে দাও।
(হেকায়েতে ছাহাবা পৃষ্টা ৮৫)

91

হযরত খুবাইব (রাঃ)

হযরত খুবাইব (রাঃ) কে শুলে চড়ানোর সময় জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার কি কোন কামনা-বাসনা আছে? তিনি বললেন, পৃথিবী থেকে বিদায়বেলা এবং প্রভুর সাথে সাক্ষাতের নিকটবর্তী সময়ে আমাকে দুইরাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ দাও। সুতরাং তাঁকে সুযোগ দেওয়া হলো। তিনি প্রশান্ত চিত্তে দুইরাকাত নামাজ আদায় করে বললেন, মৃত্যুর ভয়ে আমি নামাজে বিলম্ব করছি তোমাদের এই ধারণা যদি অন্তরে সৃষ্টি না হতো, তাহলে আমি আরো দুই রাকাত পড়তাম। অতপর তাকে শুলে চড়ানো হলো।

শাহাদতের কিছু পূর্বে তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! এমন কোন ব্যক্তি নেই এখানে যে তোমার রাসুলের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিবে। আল্লাহ তা'য়ালা ওহীর মাধ্যমে ঐ সময়ে রাসুলের কাছে সালাম পৌঁছে দিলেন। রাসুল ওয়ালাইকুমুস সালাম ইয়া খুবাইব বলে জবাব দিলেন আর সাথিদেরকে জানিয়ে দিলেন, কুরাইশরা খুবাইবকে হত্যা করে ফেলেছে।

যখন হযরত খুবাইবকে শুলে চড়ানো হলো তখন চল্লিশজন কাফির চতুর্দিকে থেকে তীর দিয়ে হামলা করে শরীরকে থেঁতলে দিল। ঐ সময় কোন একজন কসম দিয়ে বলল, তুমি কি চাও তোমাকে ছেড়ে দেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে তোমার স্থানে হত্যা করি? খুবাইব রা. বললেন, খোদার কসম! আমি এটাও পছন্দ করি না যে, আমার প্রাণের বিনিময়ে একটি কাঁটাও রাসুলের শরীরে বিদ্ধ হোক। (হেকায়েতে ছাহাবা পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে হযরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কে বললেন, আসো আমরা উভয়ে মিলে দোয়া করি। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন চেয়ে দোয়া করবো অপর জন আমীন বলব। এই সময় দোয়া কবুল হওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

উভয়জন মাঠের একপার্শ্বে গিয়ে দোয়া করলেন। প্রথমে হযরত সাআদ (রাঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আগামিকাল যুদ্ধের ময়দানে একজন শক্তিশালি বাহাদুর ব্যক্তিকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিও, যে কঠিনভাবে আমার উপর

92

আক্রমণ করবে, আমিও তার উপর কঠিনভাবে আক্রমণ করবো। তাকে তোমার পথে হত্যা করে আমি বিজয়ী হবো এবং গণিমত হাসিল করবো।
আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ বললেন, আমিন। অতপর আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আগামিকাল যুদ্ধের ময়দানে প্রচন্ড বেগে আক্রমণকারী একজন বাহাদুরের মুকাবেলায় আমাকে দাড় করিও। আমি তাকে প্রবলবেগে আক্রমণ করবো। সেও আমাকে প্রবলবেগে আক্রমণ করবে। অতপর সে আমাকে হত্যা করে আমার নাক-কান কেটে দিবে। কেয়ামতের দিন যখন আমি আপনার সম্মুখে হাজির হবো, তখন আপনি আমাকে বলবেন, হে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ! তোমার নাক-কান কেন কাটা হলো? আমি বলবো, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসুলের পথে কাটা গেছে। অতপর তুমি বলবে, সত্যিই আমার পথে কাটা গেছে।
হযরত সাদ (রাঃ) বললেন, আমিন! পরের দিন যুদ্ধ হলো। উভয়ের দোয়া যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই কবুল হলো।
সাদ (রাঃ) বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের দোয়া আমার দোয়া থেকে উত্তম ছিল। বিকালবেলা দেখলাম, তাঁর নাক এবং কান একটি রশিতে বাঁধা রয়েছে। উহুদের যুদ্ধে তার তরবারিও ভেঙ্গে গিয়েছিলো। হুজুর (সাঃ) তাকে একটি ডাল দিলেন, যা তার হাতে গিয়ে তরবারি হয়ে গেল। অনেকদিন পর্যন্ত এ তরবারিটি ছিল। এবং দুইশ দিরহামে বিক্রয় হলো। (হেকায়েতে ছাহাবা পৃষ্টা ৮১)

হযরত হানযালা (রাঃ)

উহুদ যুদ্ধে হযরত হানযালা (রাঃ) প্রথম থেকে শরিক ছিলেন না। বলা হয়, তিনি নতুন বিবাহিত ছিলেন। স্ত্রীর সাথে মিলামিশা করে গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমনকি গোসলে তার মাথা ধৌত করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কানে মুসলমানদের পরাজয়ের আওয়াজ এসে পৌঁছল, যা সহনীয় নয়। সাথে সাথে তরবারি হতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে গিয়ে কাফিরদের উপর আক্রমণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।
শহীদ ব্যক্তি যদি জুনুবী (অপবিত্র) না হয়, তাহলে তাকে গোসল ছাড়াই দাফন করতে হয়। এ হিসাবে হানযালাওকে এরূপ করার কথা ছিল। কিন্তু রাসুল দেখলেন, ফিরিস্তারা তাকে গোসল দিচ্ছেন। রাসুল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে

93

ফিরিস্তা কর্তৃক গোসল করার কথা জানালেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, আমি হুজুর (সা:) এর কথা শুনে হানযালাকে দেখতে গিয়ে দেখি মাথা থেকে গোসলের পানি টপকাচ্ছে। রাসুল (সা:) যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অনুসন্ধান করে গোসল না করার বিষয়ে অবগত হলেন।
এটা পূর্ণ বিরত্ব। বাহাদুর ব্যক্তি তার ইচ্ছায় বিলম্ব হওয়াটাকে কষ্টকর মনে করেন। তাইতো গোসলের অপেক্ষাই করেননি। (হেকায়েতে ছাহাবা পৃষ্টা ৮৩)

হযরত আবু দারদা (রা:)

হযরত আবু দারদা (রা:) রাসুলের একজন সাহাবী। দামেস্কের ক্বাযী ছিলেন। তাঁকে এই উম্মতের বিচারক এবং কারীদের সরদার বলা হয়। এজন্য উসমান গনী রা. এর খেলাফতকালে দামেস্কের কুরআন শিক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। যে সকল সাহাবী কুরআন সংকলন করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন। তিনি দামেস্কে কুরআন শিক্ষার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। তাঁর কুরআন শিক্ষার মজলিসে হাজারের চাইতে অধিক মানুষ ছিল।
হযরত আবু দারদা (রা:) মূমুর্ষ এক ব্যক্তির কাছে যেয়ে শুনতে পেলেন, সে আলহামদুলিল্লাহ বলছে। তিনি বললেন, ভাই তুমি উত্তম কাজ করেছ। কারণ আল্লাহ যখনই কোন হুকুম প্রেরণ করেন তখন মানুষের উচিৎ তার প্রশংসা করা।
আবু দারদা (রা:) প্রায়ই কবরের পাশে বসতেন। তাঁকে বসার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি এই সমস্ত লোকের কাছে বসি এজন্য যে, তারা আমাকে আখেরাতের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। যদি আমি তাদের কাছে না আসি তারা গীবত করে না। (মিনহাজুল কাসিদিন)
৩২ হিজরীতে দামেস্কে যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল তখন তিনি অনেক কান্নাকাটি করলেন। উম্মে দারদা (রা:) তাকে বললেন, হে আবু দারদা! আপনি আমাদেরকে বলতেন আপনার নিকট মৃত্যু পছন্দনীয়।
আবু দারদা বলেন, আমার প্রভুর কসম! কেন মৃত্যু পছন্দ হবে না। অতপর কেঁদে কেঁদে বললেন, এখন হলো দুনিয়া চলে যাওয়ার শেষ মুহুর্ত। আমাকে লা-ইলাহা ইল্লাহুর তালক্বীন করতে থাক। তখন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত لا اله الا الله এর তালক্বীন করা হলো। (আল-মুহতাযারুন)

94

হযরত মুওয়াবিয়া ইবনে কুররা বলেন, হযরত আবু দারদা (রা:) এর একটি উট ছিল, সেটাকে দামুন বলা হতো। কোন ব্যক্তি ভাড়া হিসাবে উট নিতে চাইলে, তিনি বলে দিতেন, এই পরিমাণ বোঝা দিও, কারণ এর থেকে বেশী বোঝা বহনের শক্তি নেই।
মৃত্যুকালে তিনি উটকে সম্মোধন করে বললেন, হে দামুন! কিয়ামতের দিন আমার রবের সামনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর না। কারণ আমি সর্বদা তোমার ক্ষমতা অনুযায়ি বোঝা দিয়েছি। (ইবনে আসাকির)
মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মে দারদাকে বললেন, এই সময়ের জন্য আমল করতে থাক। অতপর নিজ সন্তান বেলালকে ডেকে বললেন, হে সন্তান! এই সময়ের জন্য আমল করতে থাক। আর আমার এই সময়ের কাহিনী জীবনভর স্বরণ রাখ। মৃত্যুকালে তিনি আরো বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমি রাসুল সা.এর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তোমরা এমনভাবে এবাদত কর যেন আল্লাহকে দেখছ। যদি তুমি তাকে না দেখে থাক তাহলে একথা চিন্তা কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। নিজেকে মৃত মনে কর। নির্যাতিত মানুষের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাক, কেননা তা কবুল করা হয়। তোমাদের মধ্যে যে এই সামর্থ রাখে যে, অনেক কষ্ট করে হলেও ফজর এবং এশা এই দুই নামাজে শরীক হতে পারবে তাহলে যেন শরীক হয়। আবু মুসলিম বলেন, আমি আবু দারদার কাছে আসলাম এমতাবস্থায় তাঁর প্রাণ যাওয়ার উপক্রম। আর তিনি বলছেন, মৃত্যুর জন্য আমলকারী কি কোন ব্যক্তি আছে? আজকের জন্য কি কোন আমলকারী আছে? আমার এই শেষ মুহুর্তের জন্য আমলকারী কি কেউ আছে? একথাগুলো বলতে বলতে তাঁর রূহ কবয করা হলো।
(মিনহাজুল কাসিদিন পৃষ্টা ৫৭৮)

হযরত আবু জর (রা:)

যখন হযরত আবু জর (রা:) এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি বললেন- হে মৃত্যু! তুমি তাড়াতাড়ি আমার গলা চেপে ধর। কেননা আমি আমার প্রভুর সাথে তাড়াতাড়ি সাক্ষাত করতে চাই।

95

হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা:)

হযরত মুআবিয়া (রা:) ইন্তেকালের সময় বললেন- হে আল্লাহ, এই গুণাহগার এবং বৃদ্ধের উপর রহম কর। আল্লাহ আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি তুমি ছাড়া কারো প্রতি ভরসা করে নাই তার প্রতি সহনশীল হও। এই কথাগুলি বলছেন আর ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। মুহাম্মাদ বিন উকাইর (রা:) বলেন, আমীরে মুআবিয়া (রা:) মৃত্যুকালে বলেছিলেন, হায়! যদি আমি রাষ্ট্রের কোন কিছুর মালিক না হয়ে কুরাইশ গোত্রের কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি হতাম। (তাহলে ভালই হত)

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি বললেন, আমাকে বসাও। বসানোর পরে তিনি আল্লাহ যিকিরে মাশগুল হয়ে গেলেন । অতপর নিজেকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হে মুআবিয়া, জীর্নশীর্ণ হয়ে মরণমুখে এখন আল্লাহকে স্বরণ করছ? অতপর চিৎকার করে কাঁদতে থাকলেন আর কবিতা আবৃতি করলেন-

هُوَ الْمَوْتُ لاَمُنْجِى مِنَ الْمَوْتِ وَالَّذِيْ
أُحَاذِرُ بَعْدَ الْمَوْتِ اَدْهى وَاَفْظَعُ

অর্থ: মৃত্যুতো আসবেই, কেউ তা থেকে পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর পর আগত যে বিষয়কে ভয় করি, তা অত্যন্ত ভয়াবহ। অতপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! কষ্ট হ্রাস কর। গুণাহ ক্ষমা কর। দয়া কর ঐ ব্যক্তির উপর যে তুমি ছাড়া কারো উপর ভরসা করে না।

অতপর নিজ সন্তানকে ডেকে বললেন, আলমারিতে রাখা রোমালের ভিতর রাসুল (সা:) এর জামা, চুল, নখ রয়েছে। আমার মৃত্যুর পর দাফনের সময় রাসুলের জামা যেন আমার শরীরে জড়িয়ে দেওয়া হয়। রাসুলের চুল মোবারক এবং নখ মোবারক আমার মুখে, নাকে, চোখের উপর রেখে দিও। অতপর আমাকে আমার ও আল্লাহর মাঝখানে ছেড়ে দিও। (কিতাবুল আ'কিবাহ পৃষ্টা ৯৪)

হযরত আমর ইবনুল আস (রা:)

হযরত আমর ইবনুল আস (রা:) এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে ঘরের আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে তার সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এগুলোকে কে গ্রহণ করবে? হায় এগুলো যদি পশু-প্রাণীর বিষ্টা হত।

96

মৃত্যুর সময় আরও ঘনিয়ে আসলে পাহারাদার খাদিমকে ডেকে বললেন, আল্লাহর কাছে তোমরা কি আমার কোন কাজে আসবে? তারা বলল, না। তখন বললেন, চলে যাও। কিছুক্ষণ পর ডেকে বললেন, পানি নিয়ে আস। পানি আনা হলে ভালোভাবে ওজু করে বললেন, আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো।
মসজিদে গিয়ে বললেন, আমার চেহারাকে কিবলামুখী করে দাও। কথামত কিবলামুখী করে দেওয়ার পর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হুকুম পালনের নির্দেশ করেছেন আমি অমান্য করেছি। আপনি যা আমানত দিয়েছেন তার খিয়ানত করেছি। আপনি সীমা নির্ধারণ করেছেন আমি তা লঙ্গন করেছি। হে আল্লাহ! আমি গুণাহ মুক্ত নই যে, কোন ওজর পেশ করব, নিজেকে সাহায্য করার মতো শক্তিও নেই। আমি ভুলকারী, তাই ক্ষমা চাই গুণাহের উপর; অহমিকা প্রদর্শন করতে চাই না। অতপর
لَا اِلٰهَ اِلَّااَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ পড়তে পড়তে ইন্তেকাল হয়ে গেল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) ৫৭/৫৮ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে মদীনাতে ইন্তেকাল করেন।
মৃত্যুকালে তাঁকে কান্নারত দেখে একজন বলল, কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার কারণে কাঁদছি না। বরং কাদতেছি এজন্য যে, দীর্ঘ সফর সামনে রয়েছে, (নেকির) সম্বল কম, রাস্তা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তাও জানা নেই। এই রাস্তা আমাকে জান্নাতে না জাহান্নামে পৌঁছাবে? এই দু-জায়গার কোনটিতে অবস্থান করব তাও জানা নেই। (বাগাবী)
মারওয়ান ইবনে হাকাম সাক্ষাৎ করতে এসে দোয়া করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমাকে আল্লাহ শিফা দান করুন। তখন আবু হুরায়রা রা. বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার সাক্ষাতের জন্য আসক্ত, অতএব আপনি আমাকে আপনার সাথে মিলিত হওয়াকে গ্রহণ করে নাও। এই দোয়া করা অবস্থায় মারওয়ান ঘর থেকে বের হতে না হতেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। (ইসাবা)
আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান বললেন, আমি আবু হুরায়রার কাছে গেলাম, তাঁকে আমি আমার বাজুতে নিলাম। এভং এই দোয়া করতে লাগলাম, হে

আল্লাহ! আবু হুরায়রা (রা.) কে শিফা দান কর। তখন আবু হুরায়রা এরূপ বলতে নিষেধ করলেন।

এমনকি বারবার নিষেধ করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে বললেন, তুমি যদি মরতে চাও মরে যাও। খোদার কছম, এমন এক সময় আসবে, একজন ব্যক্তি তার ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে যাবে এবং আফসোস করে বলবে, হায়! যদি এখানে আমি দাফন হতাম। (কতইনা ভালো হত) এই হাদিছটি আবু হুরায়রা থেকে তিনি উমায়র ইবনে হানি থেকে বর্ণনা করেছেন, যা মারফু সুত্রে বর্ণিত।

মৃত্যুকালে তিনি কয়েকটি ওসিয়ত করলেন ১. আমার কবরে তাবু টানিওনা ২. লাশের পিছনে আগুন নিয়ে যাবে না ৩. তাড়াতাড়ি দাফন করবে। (আহমদ নাসায়ী)

এক রেওয়ায়েতে আছে, তার মরনে বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনে মাহরান বলেন, আবু হুরায়রা মৃত্যুকালে বলেছেন, আমাকে তাড়াতাড়ি দাফন করবে। কেননা রাসুল (সাঃ) বলেছেন- যখন নেককারকে খাটিয়ার মধ্যে রাখা হয় তখন সে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। আর পাপীষ্টকে রাখা হলে সে বলে, হায়, আফসোস! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? (শরহু মাআনিল আছার)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) ওফাত সংক্রান্ত বিষয়ে আতিয়া আওফী তাঁর গোলামকে জিজ্ঞাস করলে গোলাম বলল, একজন শামীব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরের ফলা তাঁর পায়ে লাগে। তখন হাজ্জাজ তাঁকে দেখতে গেলেন।

হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) কে বললেন, আপনাকে কে তীর মেরেছে? তার নাম বলুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বললেন, তুমিই তীর মেরেছ। হাজ্জাজ বলল, এটা কেমন কথা?

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বললেন, তুমি হারাম শরীফে অস্ত্র প্রবেশের অনুমতি দিয়েছ।

মৃত্যুকালে তিনি ওসিয়ত করেছেন, হারাম এলাকায় আমাকে দাফন করবে না। কিন্তু হাজ্জাজের কারণে তার ওসিয়ত পালন করা যায়নি। (সিফাতুস সাফওয়া)

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা:) মৃত্যুকালে বললেন, দুনিয়ার জীবনে আমার একটি আফসোস বাকি রয়ে গেছে, তা হলো দুস্কৃতিদের বিপক্ষে আলী (রা:) এর সাথে যুদ্ধ কেন করলাম না? (ইসতেআব)

সায়িদ ইবনে জুবায়ের বলেন, ইবনে উমর বলেছেন, কোন বিষয়ের বেলায় আমার কোন আক্ষেপ নেই। শুধু মাত্র গরমের মৌসুমে রোযা রাখা ছুটে যাওয়ার আক্ষেপ, রাতের ইবাদত মুজাহাদা ছুটে যাওয়ার আক্ষেপ। আর ৩য় আক্ষেপ হলো, আলীর সাথে যুদ্ধে শরীক না হওয়ার আক্ষেপ। (আলমুহতাজারুন)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা:)

রাসুল (সা:) দারে আরকামে যাওয়ার পূবের্ই আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. মুসলমান হন। তাঁর সম্পর্কে লিখা হয়, তিনি ৮ম নাম্বারে ইসলামগ্রহণ করেন। আবু বকর (রা:) এর মাধ্যমে প্রথম যে ৫জন ইসলামগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা:) একজন।

তিনি হাবশায় হিজরতকারী সাহাবী। সকল যুদ্ধে রাসুলের সাথে ছিলেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। হযরত উমর (রা:) এর রাষ্ট্র পরিচালনার ৬জন শোরা সদস্যের অন্যতম।

আল্লাহর রাস্তায় অনেক ব্যয় করতেন। দিনে ৩০ জন গোলাম আযাদ করতেন। এতদ্সত্ত্বেও উম্মে সালামা (রা:) এর কাছ গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতেন, আমার ভয় লাগে, সম্পদের কারণে আমি ধ্বংস হয়ে যাই কিনা? তখন উম্মে সালামা (রা:) নসিহতস্বরূপ বলতেন, হে আমার ছেলে, দান কর। (উছদুল গাবা)

রাসুলের জামানায় তিনি অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। অত:পর বিভিন্ন জায়গায় ৪০ হাজার দিনার করে ছদকা করেছেন। আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ বাহিনীর জন্য ৫০০ বাহন দান করেছিলেন। ৩১ হিজরীতে ৭৫বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে তিনি ওসিয়ত করেছিলেন, আমার পক্ষ থেকে ৫০হাজার দিনার আল্লাহর রাস্তায় যেন ছদকা করা হয়। (আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত) বিশেষত বদরী সাহাবীদের বেলায় ওসিয়ত করেছেন যে, এখন পর্যন্ত ১০০ জন জীবিত আছেন, তাদের প্রত্যেককে যেন চারশত দিনার আমার পক্ষ থেকে

99

হাদিয়া দেওয়া হয়। এমনকি হযরত উছমান (রা:)ও এ হাদিয়া কবুল করেছিলেন।

মৃত্যুকালে ওসিয়ত করলেন, আমার পক্ষ থেকে ১০০০ হাজার ঘোড়া যেন আল্লাহর রাস্তায় দান করা হয়। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ৪জন, প্রত্যেককে আশি হাজার করে দিনার প্রদান করেন।

তিনি অত্যন্ত সুন্দর মানুষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদেন কেন? জবাবে বললেন, মুসআব ইবনে উমাইর আমার থেকে অনেক ভালো ছিলেন। রাসুলের জীবদ্দশায় তিনি মারা যান। ঠিকমত কাফনের কাপড় তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবও আমার থেকে ভালো। কারণ তিনি পূর্ণ কাফন পাননি। আমার ভয় লাগে আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় কিনা? অধিক সম্পদের কারণে সাথিদের থেকে আমি পিছু পড়ে যাই কিনা? (আল-ইস্তেআব)

নারীকুলের সর্দার হযরত ফাতেমা (রা:)

মুসনাদে আহমদের এক দুর্বল রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত সালমা (রা:) বলেন, ফাতেমা (রা:) এর মৃত্যুকালে আমি তাঁর সেবায় ছিলাম,

একদিন আলী (রা:) প্রয়োজনে বাহিরে যাওয়ার পর ফাতেমা আমাকে বললেন, হে আমার মা, আমার জন্য গোসলের পানি প্রস্তুত কর। তিনি গোসল করলেন। নতুন কাপড় তালাশ করে পরিধান করলেন। অতপর আমাকে বললেন, রুমের মধ্যখানে বিছানা বিছিয়ে দাও। যখন বিছানা বিছানো হলো তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে গালের নিচে হাত রেখে শুয়ে পড়লেন। আর বলতে লাগলেন, হে মা! আমি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি; আল্লাহর শুকুর আমি আগেই পাক পবিত্র হয়ে গেছি। এবার আমার শরীর থেকে আর কাপড় খুলতে হবে না।

এসব কথা বলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আলী (রা:) ঘরে ফিরে এসে তাঁর মৃত্যুর খবর পেলেন।

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবিবা (রা:)

উম্মে হাবীবা (রা:) মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে আয়েশা (রা:) কে আহ্বান করে বললেন, সতিনদের ভিতরে কিছু কিছু হিংসা থেকেই থাকে। আল্লাহর এগুলো

100

মাফ করেই দিয়েছেন। তোমাদের যে সমস্ত দোষ-ক্রটি হয়েছে, আমি এগুলো আমার পক্ষ থেকে মাফ করে দিলাম।
হযরত আয়েশা (রা:) বললেন, আপনি আমাকে আজকের দিনে খুশি করেছেন। আল্লাহ আপনাকে খুশি করুন! উম্মে সালামাকে রা. ডেকে তাঁকেও এরূপ বললেন।
(মুস্তাদরাকে হাকিম)
তাঁর মৃত্যু ৪৪ হিজরীতে হয়।

হযরত আছিয়া (রাঃ)

হযরত আছিয়া হলেন ফেরআউনের স্ত্রী। যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য ফেরআউনের স্ত্রীকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করছেন। যখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, আমার জন্য আপনার নিকটে জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বানান। ফেরআউন এবং তার কৃতকর্ম থেকে আমাকে মুক্তি দান করুন। এবং আমাকে অত্যাচারী জাতি থেকে মুক্তি দান করুন।
হযরত আছিয়া (রা:) মুসা (আ:) এর উপর ঈমান এনেছিলেন।
একদা রাসুল (সা:) জমিনে চারটি রেখা টেনে সাহাবীদের বললেন, তোমরা কি জান এই চারটি রেখা কি? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল (সা:) বললেন, জান্নাতি মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন, খাদিজা, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সা:), ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়া বিনতে মুযাহিম, মারইয়াম বিনতে ইমরান।
হযরত আছিয়া দোয়া করেছিলেন, আমাকে ফেরআউন ও তার কর্ম থেকে রেহাই দাও। এই আয়াতের তাফসীরে বায়হাকী (রাহ.) আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, ফেরআউন আছিয়া (রা:) এর দুই হাত পেরেক দিয়ে জমিনে গেড়ে দিল। আর কড়া দুপুরের সূর্যে তাঁকে ফেলে রেখে দিল।
ফেরআউন যেইমাত্র তাঁকে এই অবস্থায় রাখল, তখনই ফেরেস্তারা আছিয়াকে ছায়া দিতে শুরু করলেন। এদিকে তিনি দোয়া করতে থাকলেন, হে আমার প্রভু! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর প্রস্তুত করুন। এই দোয়া করা অবস্থায় কয়েক মুহুর্ত বেঁচে দুনিয়াতে জান্নাত দেখে নিলেন।

মাশেতা বিনতে ফেরআউন

মাশেতা বিনতে ফেরআউন সম্পর্কে মুসনাদে আহমদে হযরত আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা:) বলেন, মেরাজের রজনীতে একদা আমার নাকে অত্যান্ত সুগন্ধি অনুভব করলাম। জিব্রাইলকে বললাম, এই সুগন্ধি কিসের? জিব্রাইল বললেন, এটা মাশেতা বিনতে ফেরআউন ও তার সন্তানদের সুগন্ধি। আমি বললাম, তাঁদের ঘটনা কি? জিব্রাইল বললেন, একদা মাশেতা ফেরআউনের মেয়ের মাথা আচড়াচ্ছিল। হঠাৎ চিরুনী হাত থেকে পড়ে যায়। তখন সে বলল, বিছমিল্লাহ।

ফেরআউনের মেয়ে মাশেতার মুখ থেকে আল্লাহ শুনল। তখন বলল, আল্লাহ কে? আমার বাবা নাকি? মাশেতা বলল, না। বরং আমার, তোমার এবং তোমার বাবার রব হলেন,আল্লাহ।

ফেরআউন কন্যা বলল, আমার পিতা ছাড়া কি কোন রব আছেন? মাশেতা বলল, হ্যাঁ।

ফেরআউন কন্যা বলল, একথা কি আমার পিতাকে বলব? মাশেতা বলল, বলতে পার। ফেরআউন কন্যা তার পিতাকে এটা জানালো। ফেরআউন মাশেতাকে ডেকে বলল, আমি ছাড়া তোমার কি কোন রব আছেন? মাশেতা বলল, আসমানের রব হলেন আমার ও তোমার রব।

তখন ফেরআউন একটি ডেগে তামা গরম করার নির্দেশ দিল। যখন গরম হল, তখন মাশেতার সকল বাচ্চাদেরকে একের পর এক ডেগে ফেলা হল। একজনকে ফেলার পর ফেরআউন বলল, তুমি তোমার কথা থেকে প্রত্যবর্তন করবে কিনা? মাশেতা বলল, না।

এভাবে ফেরআউন একজন একজন করে সন্তান ফেলছে আর মাশেতাকে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি কি তোমার কথা থেকে ফিরবে না? মাশেতা বলতে লাগল, না।

একপর্যায়ে মাশেতা বলল, আমার একটি কথা আছে। ফেরআউন বলল, কি? মাশেতা বলল, আমার ও আমার বাচ্চাদের হাড্ডিগুলো যেন এক জায়গায় দাফন করা হয়। ফেরআউন বলল, অবশ্যই তা করব।

মাশেতার বাচ্চাদেরকে একে একে ডেগে ফেলা হচ্ছিল। সর্বশেষ তাঁর দুধের বাচ্চাকে যখন ফেলে দেওয়া হলো তখন দুধের বাচ্চার জবান আল্লাহ খুলে

দিলেন। দুধের বাচ্চা বলতে লাগলে, হে আমার মা! এই ডেগে প্রবেশ কর। নিশ্চয় দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তি থেকে অতি তুচ্ছ। অতপর সকল বাচ্চার সাথে তাঁকেও ডেকে ফেলা হল।

হযরত সুমাইয়া (রা:)

হযরত সুমাইয়া (রা:) সম্পর্কে ইমাম মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, আবু জাহল তার লজ্জাস্থানে বর্শা মেরে তাঁকে শহিদ করেছে।

তিনি পুরুষ-মহিলা সম্মিলিতভাবে সপ্তম নম্বারে ইসলাম গ্রহণকারীণী নারী। তিনি ইসলামের প্রথম শহীদ।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসুল (সা:) একদা আম্মার, ইয়াসির, সুমাইয়া (রা:) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাদেরকে মক্কার উত্তপ্ত বালুতে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল, রাসুল (সা:) বললেন, হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধর। তোমাদের প্রাপ্য হচ্ছে জান্নাত।

হযরত মুআজা আদাবিয়া (রা:)

হযরত মুআজা আদাবিয়া (রা:) হযরত আয়েশা রা. থেকে হাদিছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর ছাত্র হলেন হাছান বসরী, আবু কিলাবা প্রমুখগণ।

তিনি সকালবেলা জাগ্রত হয়ে বলতেন, আজকের দিনে আমি মারা যাব। রাত হলে বলতেন, আজ রাত আমার মরণের রাত। হাকাম বিন সিনান বাহেলী বলেন, তাঁর সেবিকা বলেন, হযরত মুআজা সারা রাত জাগ্রত থাকতেন আর নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, এখনো ঘুমের সময় হয়নি। কবরে হয়তো আক্ষেপের সাথে অথবা আনন্দের সাথে ঘুমাবে। সকাল পর্যন্ত এভাবে বলতেন।

তাঁর দৈনন্দিন আমল সম্পর্কে লিখা হয়, তিনি দিন-রাতে ৬শত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। এছাড়াও কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

তাঁর স্বামী আর সন্তান মারা যাবার পর বললেন, দুনিয়ার স্বাদ হিসাবে আমার বাচ্চা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। বরং জন্ম দেওয়া এজন্য ছিল যে, তারা নেক আমল করবে ফলে আমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করব। আশা করি, আল্লাহ আমাকে, আমার স্বামী ও সন্তানকে জান্নাতে একত্রিত করবেন।

রাওহ ইবনে সালামাহ ওয়াররাক বলেন, উকায়বা বর্ণনা করেছেন, হযরত মুআজার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কখনো কাঁদতেন, কখনও হাসতেন।
এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, কাঁদার কারণ হল, আজ থেকে নামাজ, রোযা, যিকির সবগুলো আমার থেকে ছুটে যাবে। আর হাঁসার কারণ হল, আমি আমার স্বামী আবু ছাইফকে দেখতে পাচ্ছি তিনি ঘরের আঙ্গিনায় এসেছেন। তাঁর পরনে সবুজ জামা কাপড় রয়েছে। তাঁর সাথে একদল লোক রয়েছে। এমন লোক দুনিয়াতে আমি দেখি নাই। আমি এখনি নামাজ পড়ে নিচ্ছি। পরবর্তী ফরজ নামাজের ওয়াক্ত আসার আগে আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিব।
দেখা গেল, বাস্তবেই পরবর্তী ওয়াক্ত আসার আগেই তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে যান। (ছিফাতুত ছাফওয়া)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) মুহাদ্দিছদের ইমাম এবং সুন্নাত ও শরীয়তের ধারক ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে রাক্কা থেকে বাগদাদে পাঠানো হল। একাধারে তিনদিন খলকে কুরআনের মাসআলা নিয়ে তাঁর সাথে তর্ক বিতর্ক হল। খলীফা ও তার দরবারের আলিমদের কথা হল কুরআন মাখলুক, ইমাম সাহেবের আকিদা ছিল এর বিপরীত। তাঁকে এই মাসআলা থেকে ফিরে আসার জন্য অনেক ধমকানো হলো। ভয় দেখানো হল। কিন্তু তিনি পরওয়া করলেন না। হকের উপর অটল রইলেন।
যখন তাঁকে কোন ভাবেই তার অবস্থান থেকে সরানো গেল না, তখন তাঁকে খলিফা মু'তাসিমের সামনে উপস্থিত করা হল। সেখানেও তিনি অটল রইলেন। ফলে খলিফার নির্দেশে তাঁকে ২৮টি চাবুক মারা হল। একজন বলিষ্ঠ জল্লাদ এসে শুধু দুটি চাবুক মারত। তারপর সে চলে যেত, আরেকজন আসত। সেও দুইটা চাবুক মারত, তারপর সেও চলে যেত। এভাবে চলতে থাকল, এদিকে প্রত্যেক চাবুকের প্রহারের সময় ইমাম সাহেব বলতেন, আমার সামনে কুরআন হাদিছের কোন প্রমাণ পেশ কর, আমি মেনে নিব।
তাঁকে প্রায় ছয়মাস কারাবন্দী করে রাখা হয়। এই সময়ে তাঁকে ৩৪টি চাবুক মারা হয়। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী রাহ.বলেন, আমি শুনেছি আহমদ ইবনে হাম্বলের শরীরে যে চাবুক মারা হয়েছিল, তার একটি আঘাত যদি হাতির শরীরে মারা হত, তাহলে হাতি চিৎকার করে পলায়ন করত। তাঁর এই অটলতার কারণে খলকে কুরআনের মাসআলা চিরতরে শেষ হয়ে গেল। সর্বদার জন্য উম্মতে মুসলিমা মহা ক্ষতি থেকে রেহাই পেল। (মুহাদ্দিসীনে ইজাম)

পরকালের যাত্রা

তিনি ৭৭ বছর জীবিত ছিলেন। ৯দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তখন সেবার জন্য লোকের ভিড় ছিল খুব বেশী। বাদশাহ অধিক লোকের সমাগমের খবর শুনে ইমাম সাহেবের বাড়ি ও রাস্তায় পাহারা এবং শারিরিক অবস্থার খবর শুনার জন্য সংবাদবাহক নিয়োগ করল। এদিকে সময়ে সময়ে ভিড় বাড়তেই থাকল। এমনকি রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। মসজিদের রাস্তা মানুষে ভরে গেল। বাজারে ক্রয়-বিক্রয় দুস্কর হয়ে পড়ল।

অসুস্থতার সময় ইমাম সাহেবের প্রস্রাবের মধ্যে রক্ত আসতে লাগল। ডাক্তার কারণ জানাল, অধিক দুঃশ্চিন্তা-পেরেশানির কারণে পাকস্থলি টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবারে স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়ে গেলো।

তাঁর ছাত্র মারওয়াযী বলেন, আমি তাঁকে ওজু করালাম। তিনি এই কষ্টের সময়ও আমাকে বললেন, আঙ্গুলগুলো খিলাল করে দাও। শুক্রবার দিনে অসুস্থতা আরো বেড়ে যায়। (মুহাদ্দিসীনে ইজাম)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলে বলেন, আমার পিতার ইন্তেকালের সময় আমি তাঁর কাছে বসা ছিলাম। ইন্তিকালের পর চোয়াল বাঁধার জন্য হাতে একটি কাপড় রাখলাম। যখনই তিনি বেহুঁশ হতেন তখন আমরা মনে করতাম এই বুঝি মারা গেলেন। কিন্তু যখন হুঁশ ফিরে আসত তখন বলতেন, এখনো সময় হয়নি।

৩য় বার যখন এরূপ হল, তখন আমি বললাম, আপনি কি বলছেন? তখন তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি তো টের পাচ্ছ না, অভিশপ্ত শয়তান যে আমার কাছে দণ্ডায়মান। সে ক্রোধান্বিত হয়ে দাঁত দিয়ে আঙ্গুল কাটছে আর বলছে, আহমদ! তুমি আমার হাত ছাড়া হয়ে গেলে। তখন আমি তাকে বলি, এখনো তোমার

হাত ছাড়া হইনি। যখন মৃত্যু হয়ে যাবে তখন তোমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাব।
২৪১ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়ালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শহরবাসি দলে দলে আসতে থাকল। কারো জানাযায় মানবকুলের এমন সমাগম দেখা যায়নি। জানাযার মুসল্লি সংখ্যা ছিল আট লক্ষ পুরুষ, ষাট হাজার মহিলা। (মুহাদ্দিসীনে ইজাম)

স্বপ্নে সাক্ষাৎ

আহমদ বিন লুবাদী বলেন, আমি স্বপ্নযোগে আহমদ বিন হাম্বলকে দেখে বললাম, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর বলেছেন, হে আহমদ! তুমি আমার কারণে ৬০টি চাবুক খেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, স্বরণ আছে। আল্লাহ বললেন, এর বিনিময় হিসাবে আমার চেহারা তোমার জন্য বৈধ করে দিলাম। আমার দিদারের স্বাদ আস্বাদন করতে থাক।
একজন সমবেদনা জ্ঞাপনকারী আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, হে আল্লাহ! কবরবাসির সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলের সংবাদ শুনব। আপনি তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেছেন?
ঐ ব্যক্তি বলেন, ১০ বছর পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন কবরবাসিরা কবর থেকে বের হয়ে এসেছেন আর প্রত্যেক ব্যক্তিই আমার সাথে প্রথমে কথা বলতে চাচ্ছেন। তারা প্রত্যেকেই বলছেন যে, তুমি ১০ বছর পূর্বে দোয়া করেছিলে যে, তুমি আমাদেরকে দেখবে আর এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যাকে মৃত্যুর সাথে সাথে ফেরেস্তারা তুবা বৃক্ষের নিচে অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে রেখেছেন।
আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক (রহ.) বলেন, এই সংবাদ তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে। (কিতাবুর রূহ)
মুহাম্মদ বিন খুজায়মা (রহ.) বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে তাঁর মরণের পর স্বপ্নে দেখলাম তিনি দম্ভভরে হাঁটছেন। বললাম, কোথায় যাচ্ছেন? বললেন, জান্নাতে। আমি বললাম, আল্লাহ কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন। আর মাথায় মুকুট পরিয়ে জুতা পায়ে পরিয়ে

বললেন, হে আহমদ! এই সম্মানের কারণ তুমি কোরআনকে মাখলুক বল নি। অতপর আল্লাহ আমাকে বললেন, সুফিয়ান সাওরী থেকে তোমার কাছে যে দোয়া পৌঁছেছে তা পড়। আমি পড়লাম।

يَارَبَّ كُلِّ شَيْءٍ' بِقُدْرَتِكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ' اِغْفِرْلِيْ كُلَّ شَيْءٍ' وَلَا تَسْئَلْنِى عَنْ شَيْءٍ.

অর্থ: হে প্রতিপালক, সকল বিষয়ের উপর আপনি ক্ষমতাবান। আমার সকল গুণাহ মাফ করে দাও। কোন বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা কর না। অতপর আল্লাহ বললেন, এই হলো জান্নাত, সেখানে চলে যাও। আমি তখন চলে গেলাম। (জহিরুল আসফিয়া পৃষ্ঠা-৩১৩)

ইমাম বুখারী (রহ.)

ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের ৪র্থ দিন শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে আদী বলেন, ইমাম বুখারী নিজে বলেছেন, আমার এক লক্ষ সহীহ হাদীস এবং দুই লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্ত ছিল।

আবু বকর আল কুলওয়াযানী (রহ.) বলেন, আমি ইমাম বুখারীর মত ব্যক্তি কখনও দেখি নি। তাঁর এত স্বরণশক্তি ছিল যে, উলামাদের কাছ থেকে কোন কিতাব নিয়ে তিনি একবার অধ্যায়ন করে কিতাবের সকল হাদিছ মুখস্ত করে নিতেন।

২১০ হিজরীর শেষ দিকে তিনি ইরাক গমন করেন। সেখানের বিভিন্ন শহর ঘুরে ঘুরে মাশায়িখদের থেকে হাদীছ গ্রহণ করেন। তিনি নিজে বলেন, আমি আটবার বাগদাদ গমন করি। প্রত্যেকবার আহমদ বিন হাম্বলের মজলিসে বসি। শেষবার প্রত্যাবর্তনকালে ইমাম আহমদ আমাকে লক্ষ করে বললেন-

يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ اَتَدَعُ الْعِلْمَ وَالنَّاسَ وَتَصِيْرُ اِلى خُرَاسَانَ ইমাম বুখারী বলেন, এখনো পর্যন্ত তার উক্ত কথাটি আমার স্বরণ আছে। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, মিসর, শাম গমন করেন।

ইমাম বুখারীর লেখালেখির শুরু হয় ১৮ বছর বয়স থেকে। স্বীয় কিতাব কিতাবুত তারীখ সম্পর্কে বলেন-

صَنَّفْتُ كِتَابَ التَّارِيْخِ اِذْ ذَاكَ عِنْدَ قَبْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اللَّيَالِىْ اَلْمُقْمِرَةِ

আমি ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি যত হাদিছ লিখেছেন সবগুলো কি মুখস্ত? ইমাম বুখারী বললেন, কোন হাদিছ আমার কাছে অস্পষ্ট নয়।
আবু জাফর ইমাম বুখারীর উক্তি নকল করে বলেন,
صَنَّفْتُ جَمِيْعَ كُتُبِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
আবু জাফর মুহাম্মদ বিন হাতিম বলেন, ওয়াররাক বলেন আমি বুখারীর সাথে সফরে ছিলাম। পূর্ণ সফরে আমরা এক রুমে ছিলাম। প্রচণ্ড গরমের সময় মাঝে মধ্যে আমরা পৃথক হতাম নতুবা সব সময় এক সাথে এক কামরায় ছিলাম। এ সময়ে আমি লক্ষ করলাম, প্রত্যেক রাতেই তিনি ঘুম থেকে ১৫ থেকে ২০ বার উঠতেন আর চকমকি পাথর (যে পাথর ঠুকে আগুন প্রজ্বলিত করা যায়) দ্বারা বাতি জালিয়ে হাদীছ লিখতেন।
ইউসুফ বিন মুসা মারওয়াজী বলেন, আমি একবার বসরার এক জামে মসজিদে ছিলাম। হঠাৎ একজন ঘোষক বলল,
يَا اَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ قَدِمَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِىْ হে জ্ঞান পিপাসুরা! মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী আগমন করেছেন। এ ঘোষণার সাথে সাথে মসজিদের নির্ধারিত স্থানের দিকে মানুষের দৌঁড় শুরু হল। আমি গিয়ে দেখলাম, এক জন যুবক মসজিদের একটি স্তম্ভের পিছনে নামাজ পড়ছে। নামাজ শেষ হতেই লোকেরা তাঁকে ঘিরে বসল।
২য় দিন অনুরূপ মজলিস কায়েম হল। তখন ইমাম বুখারী উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন-
يَا اَهْلَ الْبَصْرَةِ اَنَا شَابٌّ وَقَدْ سَأَلْتُمُوْنِىْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ وَساُحَدِّثُكُمْ بِأَحَادِيْثَ عَنْ اَهْلِ بَلَدِكُمْ تَسْتَفِيْدُوْنَ مِنْهَا
ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমি বসরায় ৫বার গমন করে সেখানকার আলিমদের থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি।
তিনি আরও বলেন-
مَا أَرَدْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ فِيْهِ ذِكْرُ الدُّنْيَا اِلَّا بَدَأْتُ بِحَمْدِ اللهِ وَالثَّنَايَا عَلَيْهِ
আমি দুনিয়াবী কোন কথা আল্লাহর গুণকীর্তি ও তারীফ করে শুরু করতাম।
আবু ইসহাক সিরমারী বলেন, কেহ যদি বাস্তবিকভাবে ফকীহ দেখতে চায় তাহলে ইমাম বুখারীকে যেন দেখে নেয়।
আবু জাফর বলেন, আমি ইয়াহইয়া বিন জাফরকে বলতে শুনেছি, যদি আমার হায়াত ইমাম বুখারীকে দেওয়া যেত তাহলে অবশ্যই দিয়ে দিতাম। কারণ

আমার মৃত্যুতে আমি একজনের মৃত্যু হবে। আর বুখারীর মৃত্যু হওয়া ইলম উঠে যাওয়ার নামান্তর।

নুআইম ইবনে হাম্মাদ বলতেন, ইমাম বুখারী এই উম্মতের ফকীহ।

আলী ইবনে হুজর বলতেন, খুরাসান অঞ্চল তিন ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে। আবু জুরআ, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, আব্দুল্লাহ দারেমী। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী হলেন বুখারী।

এক ব্যক্তি এসে বলল, يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ اِنَّ فُلَانًا يُكَفِّرُكَ অমুক তোমাকে কাফের বলে। তখন তিনি বললেন, اِذْ قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ اَحَدُهُمَا কেউ তার ভাইকে কাফের বললে, তাদের দুইজন থেকে একজনের উপর পতিত হয়।

আব্দুল মজিদ বিন ইবরাহিম বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বললাম, যারা আপনার প্রতি জুলুম করে, অপবাদ দেয়, কষ্ট দেয় তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন না কেন?

তিনি বললেন, রাসুল (সা:) বলেছেন, হাউজের পাড়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত ধৈর্য ধর। রাসুল আরো বলেছেন, مَنْ دَعَا عَلى ظَالِمِهِ فَقَدِ انْتَصَرَ

ইমাম বুখারী ২৫৬হিজরীতে ৬২বছর বয়সে ঈদুল ফিতরের রাত্রে মৃত্যুবরণ করেন।

সে যুগের অন্যতম বুজুর্গ আব্দুল ওয়াহিদ তুসী একদা স্বপ্নে দেখেন, রাসুল (সা:) সাহাবীদের নিয়ে কারো যেন অপেক্ষা করছেন। তিনি রাসুলকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা:) আপনি কারো অপেক্ষা করছেন? রাসুল বললেন, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারীর জন্য অপেক্ষা করছি।

আব্দুল ওয়াহিদ বলেন, এই স্বপ্নের কিছুদিন পর ইমাম বুখারীর মারা যাওয়ার সংবাদ শুনলাম। পরে খবর নিয়ে জানলাম, আমি যেই রাতে রাসুল (সা:) কে স্বপ্নযোগে অপেক্ষা করতে দেখেছি সেই রাতেই ইমাম বুখারী মারা গেলেন।
(বুসতানুল মুহাদ্দিসীন পৃষ্টা ১৮১)

মুহাম্মদ বিন বাশশার বুন্দার বলেন,

حُفَّاظُ الدُّنْيَا اَرْبَعَةٌ اَبُوْ زُرْعَةَ بِالرَّىْ وَمُسْلِمٌ بِنِسَابُوْرْ وَعَبْدُ اللهِ الدَّارِمِىُّ بِسَمَرْقَنْدْ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بِبُخَارا.

109

ইমাম মুসলিম (রহ.)

ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৬১ হিজরী সনের ২৫ রজব শনিবার দিন মৃত্যুবরণ করেন। রবিবার দিনে নিশাপুরের বাহিরে নাসিরাবাদে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লামা যাহাবী বলেন, তাঁর কবর মানুষের জন্য তীর্থস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়ে যায়।

তাঁর মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। কথিত আছে, একদা হাদিছের দরসে একটি হাদিছ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তাঁর স্বরণ হচ্ছিল না। তখন মজলিস থেকে উঠে ঘরে আসলেন। আর হাদিছ তালাশ করতে থাকলেন। এদিক দিয়ে এক টুকরি খেজুর তাঁর কাছে রাখা ছিল। তিনি তা থেকে খাচ্ছিলেন আর হাদিছ তালাশ করছিলেন। এক পর্যায়ে খেজুর শেষ হয়ে গেল তিনিও হাদিছ পেয়ে গেলেন। কিন্তু অধিক খেজুর খাওয়াই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। ইলমের প্রতি অতি মগ্নতার কারণে অধিক খাওয়ার বিষয়টা অনুভব করতে পারেননি। এ ঘটনার দ্বারা ইলমের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহের অনুমান হয়।

মৃত্যুর পর আবু হাতিম রাজী স্বপ্নে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আল্লাহ আমার জন্য জান্নাত বৈধ করে দিয়েছেন।

(জফরুল মুহাসসিলিন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফিন পৃষ্টা ১১৯)

ইবনে হাজার আসকালানী (রাহঃ)

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে ৮৫২ হিজরীর ২৮জিলহজ্ব শনিবার এশার নামাজের পর ইলম ও আমলের এই সূর্য অস্তমিত হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৯ বছর ৪ মাস ১০দিন। অধিক ডায়রিয়া হওয়া তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মৃত্যুকালীন অসুস্থতার দিনে প্রধান বিচারপতি সাআদ উদ্দিন দিরী খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আগমন করলেন। শারিরিক অবস্থা জানতে চাইলে তিনি আল্লামা যমখশরীর কবিতার চার লাইন আবৃত্তি করেন-

قَرُبَ الرَّحِيْلُ اِلى دِيَارِ الْاخِرَةِ+ فَاجْعَلْ اِلهِىْ خَيْرَ عُمْرِىْ آخِرَه
وَارْحَمْ مَبِيْتِىْ فِىْ الْقُبُوْرِ وَوَحْدَتِىْ+ وَارْحَمْ عِظَامِىْ حِيْنَ تَبْقى نَاخِرَةُ
فَاَنَاالْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ اَيَّامُهُ+ وَلَّتْ بَأَوْزَارٍ غَدَتْ مُتَوَاتِرَةُ

110

فَلَئِنْ رَحِمْتَ فَأَنْتَ اَكْرَمُ رَاحِمٍ+ فَبِحَارُ جُوْدِكَ يَا اِلٰهِىْ ذَاخِرَةٌ

(জফরুল মুহাসসিলিন বি আহওয়ালিন মুসান্নিফিন পৃষ্টা ১৮৫)

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ:)

কারবালার ঘটনার পর নবী খান্দানের অনেকেই শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন ঘটানোর জন্য চেষ্টা করেছেন। মুহাম্মদ যুন নাফস আয যাকিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় আর তাঁর পরামর্শে স্বীয় ভাই ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহ কুফাতে মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু করেছিলেন। ইমাম আবু হানিফা এক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করেন।

একথাও প্রসিদ্ধ আছে যে, খলিফা মানসুর আবু হানিফাকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব দিলে তিনি নাকচ করেন। ফলে খলিফা তাঁকে ১৪৭ হিজরীতে কারারুদ্ধ করে।

ঐতিহাসিকদের ধারণা, মানসুর আবু হানিফার বিরুদ্ধে যে শক্ত ব্যবস্তা নিয়েছিল, এটা বিচারের দায়িত্ব নাকচের কারণে নয়; বরং মুহাম্মদ বিন ইবরাহিমকে সহযোগিতা করার কারণে যা মানসুর অবগত ছিল। অবশেষে মানসুর আবু হানিফাকে অজগরের বিষ পান করায়। তিনি যখন বিষপান উপলব্ধি করলেন সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পড়ে গেলেন। আর এ অবস্থায় ১৫০ হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০ম খণ্ড, ১০৭পৃষ্টা, মুহাদ্দিসীনে ইজাম ৫৭ পৃষ্টা)

ইমাম মালেক (রাহ:)

ইমাম মালেক (রাহ:) জীবনের শেষভাগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এমনকি জুমআর নামাজ ও পাঁচ ওয়াক্তের জামাতের জন্যও বের হতেন না। আর এ কথা বলতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ওজর প্রকাশ্যে বর্ণনা করে না। এতদসত্বেও লোকসমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে কোন ভাটা পড়েনি। (তাযকিরাতুল হুফফাজ)

বর্ণিত আছে, একপর্যায়ে তিনি বলে ফেললেন যে, তার লাগাতার প্রস্রাবের ফোঁটা পড়তে থাকা রোগ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমি মসজিদে নববীতে গেলে রাসুলের সম্মান-ইজ্জতের ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয়ে যাবে। ২য়তো আমি চাচ্ছি না, অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করি।

ইমাম মালেক (রহঃ) ২২দিন অসুস্থ থেকে ১৭৯হিজরীতে ১৪ রবিউল আওয়াল শনিবার দিনে মারা যান। মৃত্যুপূর্বে তাশাহহুদ পাঠ করে আয়াত পড়লেন,
لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ
ইবনে কেনানা ও ইবনে যুবাইর তাঁকে গোসল দেন। তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া এবং তাঁর কাতিব হাবীব পানি ঢেলে দেন। ওসিয়ত মোতাবেক সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়। উমর ইবনুল আব্দুল আজিজ রহ.তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। (সিরাতে আইম্মায়ে আরবাআ)

হযরত ইমাম নাসায়ী (রাহঃ)

ইমাম নাসায়ী (রাহঃ) ৩০২ হিজরীতে জিলকদ মাসে মিসর ছেড়ে ফিলিস্তিনের একটি স্থান রামাল্লায় আসেন। যেহেতু শাম দেশে বনি উমাইয়ার শাসন দীর্ঘ দিন ধরে চলার কারণে সেখানে বাহ্যিক তাবেদারি বংশীয় মিত্রতার জোর বেশি ছিল। সাধারণ লোকেরা আলী (রা:) এর ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করত। তাই ইমাম নাসায়ী দামেস্ক চলে আসেন। দামেস্কের জামে মসজিদের মিম্বরে বসে আলী (রা:) এর বৈশিষ্ট ও গুণাগুণ শুনাতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ না যেতেই লোকেরা মুআবিয়া (রা:) এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা শুনানোর জন্য আবেদন করল। তিনি বললেন, মুআবিয়ার জন্য এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তিনি পাকড়াও ছাড়া মুক্তি পাবেন।
অন্য বর্ণনায় এসেছে, যা আগের বর্ণনার কাছাকাছি তিনি বলেছেন, মুআবিয়ার ফজিলতের বেলায় لَا اَشْبَعَ اللهُ بَطْنَه এ হাদীছ ছাড়া অন্য হাদিছ পৌঁছেনি।
সাধারণ লোকেরা একথা শুনে ক্ষেপে গেল। তারা ইমাম নাসায়ী শিয়া হওয়ার অপবাদ আরোপ করল। সেখানে তিনি কিছু আঘাতের শিকার হলেন। ফলে তিনি অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়লেন। লোকেরা যখন তাঁকে বাসস্থানে নিতে চাইল তখন তিনি বললেন, আমাকে মক্কা শরীফের দিকে নিয়ে চল। আমি সেখানে মরতে চাই। অবশেষে মক্কায় পৌঁছে তিনি ইন্তেকাল করেন।
তাঁর ইন্তেকাল ৩০৩ হিজরী ১৩ সফর সোমবার হয়। অন্য বর্ণনায়, শাবানের কথা পাওয়া যায়। রামাল্লাতেই দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৮ বছর। (মুহাদ্দিসীনে ইজাম ২৪৫-২৪৬)

112

ইমাম শাফেয়ী (রাহ:)

ইমাম শাফেয়ী (রাহ:) রাতকে তিন ভাগ করে কাটাতেন। এক অংশে ইলম শিক্ষা করতেন, ২য় অংশে ঘুমাতেন, ৩য় অংশে ইবাদত করতেন।

তিনি নামাজে রবের সামনে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতেন। অধিক বিনয় ও নম্রতার কারণে নিজেকে গুণাহগারদের অন্তর্ভূক্ত করে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ - لَعَلَّيْ اَنْ اَنَالَ بِهِمْ شَفَاعَةً

وَاَكْرَه مَنْ بِضَا عَتُه الْمَعَاصِيْ - وَاِنْ كُنَّا جَمِيْعًا فِيْ الْبِضَاعَةِ

তিনি অত্যন্ত কুরআন প্রেমিক ছিলেন। সারা বছরের রুটিন ছিল এভাবে যে, ২৪ ঘণ্টায় কুরআন শরীফ একবার খতম করতেন। রমজান মাসে দিনে এক খতম, রাতে এক খতম দিতেন। যখন তিনি তেলাওয়াত করতেন নিজেও কাঁদতেন, শ্রুতাদেরও কাঁদাতেন।

তাঁর সমসাময়িক এক ব্যক্তি বলেন, যখন আমরা কাঁদতে চাইতাম তখন একে অপরকে বলতাম, চল, ঐ মুত্তালিবি যুবক আলেমের কাছে যেয়ে কুরআন শ্রবণ করি। যখন আমরা তাঁর দরবারে যেতাম এবং তিনি কুরআন পড়া শুরু করতেন তখন দেখা যেত মানুষ তাঁর সম্মুখে কম্পিত হয়ে পড়তে শুরু করে। আর হাউমাউ করে চিৎকার করে। যখন এ অবস্থা হয়ে যায় তখন তিনি থেমে যান।

তাঁর পরিবারের লোকের দানশীলতার অবস্থা ছিল এমন যে, তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, মানবতার ভিত্তি হলো চারটি, উত্তম চরিত্র, দান, নম্রতা, ইবাদত।

মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কিছু সমসাময়িক ব্যক্তির নজরে ভালো লাগলো না। তাই তারা তাঁকে শিয়া হওয়ার অপবাদ আরোপ করল। খলিফা হারুনুর রশিদের মহলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হলো। ফলে ৩৪ বছর বয়সে তাঁর হাতে-পায়ে বেড়ী লাগানো হলো। এ অবস্থায় তাঁকে নয়জন বড় আলেমের সাথে হারুনুর রশিদের সামনে দাঁড় করানো হলো। একের পর এক ঐ নয় জনের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হলো।

যখন তাঁর পালা আসল তখন তিনি ইমাম মুহাম্মদ বিন হাছান (র:) যিনি হারুনুর রশিদের কাজী ছিলেন, তার সুপারিশে মুক্তি পান। ইমাম শাফেয়ীর বেলায় হারুনুর রশিদ ফয়সালা দিলেন তাঁকে ইমাম মুহাম্মদের কাছে সোপর্দ করে দাও। ইমাম মুহাম্মদ তাঁর সম্পর্কে বললেন-

وَلَهُ مِنَ الْعِلْمِ مَحَلٌّ كَبِيْرٌ وَلَيْسَ الَّذِيْ رَفَعَ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِهِ তাঁর ইলমী স্তর অনেক উঁচু। এই সময়ে তাঁর সমপর্যায়ের কেউ নি।

এটা শুনে হারুনুর রশিদ শুধু তাঁকে মুক্তি দিলেন এমন নয়, বরং ৫০ হাজার হাদিয়া দিলেন। যা তিনি গ্রহণ করেছেন।

তিনি অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকতেন। বিশেষত অর্শ্ব রোগে অধিক আক্রান্ত থাকতেন। মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় তাঁর ছাত্র মাজনী (রাহ:) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন- كَيْفَ اَصْبَحْتَ তিনি উত্তরে বললেন,

اَصْبَحْتُ مِنَ الدُّنْيَا رَاحِلًا وَلِلْاِخْوَانِ مُفَارِقًا وَلِكَأْسِ الْمَنِيَّةِ شَارِبًا وَعَلي اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَارِدًا

এই জবাব দিয়ে বললেন, আমি জানি না আমার রূহ জান্নাতে নেওয়া হবে, না জাহান্নামে নেওয়া হবে? অতপর তিনি সাহিত্যের প্রতি তার অধিক আগ্রহের কারণে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলেন-

وَلَمَّا قَسَا قَلْبِيْ وَضَاقَتْ مَذَاهِبِيْ + جَعَلْتُ رَجَائِيْ نَحْوَ عَفْوِكَ سُلَّمَا-

تَعَاظَمَنِيْ ذَنْبِيْ فَلَمَّا قَرَنْتُهُ + بِعَفْوِكَ كَانَ عَفْوُكَ اَعْظَمَا-

فَمَا زِلْتَ ذَاعَفْوٍ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ + تَجُوْدُ وَتَعْفُوْ مِنَّةَ وَتَكَرُّمَا-

যার মর্মার্থ হলো-

১. যখন আমার অন্তর কঠিন হয়ে গেল। রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে গেল, তখন আমি আপনার ক্ষমার প্রতি আকাঙ্ক্ষার সিঁড়ি লাগালাম

২. আমার গুণাহ অনেক; কিন্তু যখন আপনার ক্ষমার মোকাবেলায় গুণাহ রাখি তখন আপনার ক্ষমা বড় মনে হয়।

৩. আপনি দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা সর্বদা আমার গুণাহ ক্ষমা করতে থাকুন।
(মিনহাজুল কাসিদিন ৫৭৮)

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রাহ:) মৃত্যুকালে ওসিয়ত করলেন, আমার গোসল যেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকিম দেয়। যখন তিনি মারা গেলেন, তখন মুহাম্মদ কে অবহিত করা হলে তিনি আসলেন। এসে বললেন, তাঁর হিসাবের খাতা আগে আমাকে দেখাও। হিসাবের খাতা দেখে দেখা গেল, তাঁর জিম্মায় ৭০ হাজার দিরহাম ঋণ আছে। মুহাম্মদ বললেন, এই সকল ঋণ এখন আমার জিম্মায়। অতপর তিনি কাগজে নোট করে নিলেন আর বললেন, গোসল দেওয়ার ওসিয়ত দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৫১৮)

114

২০৪ হিজরীতে ৫৪ বছর বয়সে রজব মাসের শেষ তারিখে তার রূহ ইল্লিয়ীনে চলে যায়।

ইমাম আবু ইউসুফ

১১৩ হিজরীতে ইমাম আবু ইউসুফ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হেলাল আর-রায় (রাহ:) বলেন,

كَانَ اَبُوْ يُوْسُفَ يَحْفُظُ التَّفْسِيْرَ وَيَحْفَظُ الْمَغَازِيَ وَاَيَّامَ الْعَرَبِ- كَانَ اَحَدُ عُلُوْمِهِ الْفِقْهَ

আলী ইবনে মাদানী বলেন,

مَا أُخِذَ عَلي اَبِيْ يُوْسُفَ اِلَّا حَدِيْثُهُ فِيْ الْحِجْرِ وَكَانَ صَدُوْقًا

ইমাম আবু ইফসুফ মৃত্যুকালে বলেছেন,

كُلُّ مَا اَفْتَيْتُ بِهِ فَقَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ اِلَّا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ

এক বর্ণনায় এসেছে,

اِلَّا مَافِيْ الْقُرْانِ وَاَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ

তাঁর ছাত্র কাজী ইবরাহিম ইবনুল জাররাহ বলেন, আমি তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁকে দেখতে গেলাম, তখন তিনি বললেন, কোন মাসআলা নিয়ে আলোচনা কর। আমি বললাম, আপনার এই অবস্থার মধ্যেও আলোচনা করব? তিনি বললেন সমস্যা নেই।

অতপর বললেন, হে ইবরাহিম! হজ্জের মধ্যে কোন অবস্থায় রামিয়ে জিমার উত্তম; পায়ে চলা অবস্থায় না আরোহি অবস্থায়? আমি বললাম, আপনিই বলুন, কোনটি উত্তম? আবু ইউসুফ (রাহ:) বললেন,

اَمَّامَنْ كَانَ يُوْقَفُ عِنْدَهُ لِلدُّعَاءِفَالْاَفْضَلُ اَنْ يَّرْمِيَهَامَاشِيًا-وَاَمَّا مَا كَانَ لَايُوْقَفُ عِنْدَهُ فَالْأَفْضَلُ اَنْ يَّرْمِيَهَارَاكِبًا

ইবরাহিম বলেন, এই মাসআলা বর্ণনার পর যখন আমি চলে যাওয়ার মনস্থ করলাম তখন দরজার কাছে আসতেই আওয়াজ শুনলাম, তিনি মারা গেছেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

(কিমাতুজ্জামান)

115

ইমাম নাফে (রাহ:)

ইমাম নাফে (রাহ:) প্রসিদ্ধ সাত কারীর একজন । লায়স ইবনে সাদ বলেন, ইমাম মালেকের কাছে বিছমিল্লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ইলমে কেরাতে মদীনাবাসির ইমাম হলেন নাফে রহ.। প্রত্যেক জ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাস করা উচিৎ। সুতরাং এ ব্যাপারে নাফেকে জিজ্ঞাসা কর। মৃত্যুকালে তাঁর সন্তান তাঁকে বলল, আমাদেরকে ওসিয়ত করুন। তখন তিনি সুরা আনফালের আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

فَاتَّقُوْااللهَ وَاَصْلِحُوْاذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوْااللهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

যার অর্থ হলো, আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হুকুম মান্য কর যদি ঈমানদার হয়ে থাক।

তাঁর জন্ম ৭০ হিজরীর কিছু আগে বা পরে হয়েছিল। মৃত্যু ১৬৯ হিজরীতে হয়।

কুতবুল আকতাব শায়খুল হাদিছ যাকারিয়া রহ. এর শেষ আদর

হযরতের জীবনের শেষ দিনগুলোতে অসুস্থতার সময় আমাদের দারুল উলুমের একজন ছাত্রের একটি চিঠি আসল। চিঠিতে সে তার অবস্থার বিবরণ দিল। সাথে সাথে নিজের আযোগ্যতার কথা ও হযরতের সাথে সাক্ষাতের কথা তুলে ধরল। সুফী ইকবাল আমার অনুপস্থিতিতে হযরতকে চিঠি পড়ে শুনাল। হযরত শুনে খুবই খুশি হলেন। আর তাকে বললেন, ইউসুফ আসলে আমাকে অবহিত করবে। আমি তার চেহারায় চুমো দিব।

যখন আমি হাজির হলাম হযরত বললেন, এদিকে আস, আমি তোমাকে চুমো দিব। আমি আগ বেড়ে হযরতের কপালে হাতে চুমো দিলাম। হযরত বললেন, আমি চুমো দেওয়ার জন্য ডাকলাম। তোমার ছাত্রের চিঠি শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। তাকে আমার পক্ষ থেকে দোয়ার বাণী লিখে দাও। আর বলে দাও যে নিজেকে যোগ্যমনে করে, সে আসলে অযোগ্য।

116

আজরাইলের সাথে আলাপ

শায়খুল হাদিছ (রাহ:) মৃত্যুর কিছু পূর্বে পবিত্র হেজাজ ভূমি থেকে হিন্দুস্থান আসেন। একদিন দুপুর বেলা আহার কার্য সমাপ্ত করে মেহমান বিদায় দিয়ে ছোট একটি কুড়েঘরে চৌকিতে শুয়ে গেলেন। পাশের রুমে বিছানায় শুয়ে ছিলেন, মাওলানা আহমদ মুহাম্মদ লুলাত (রাহ:), গুজরাটের বাড়ওয়াদার শায়খুল হাদিছ ও মাহাদুর রশীদ, কানাডার মোহতামিম মাওলানা মাযহার। বারান্দার গেইট ভিতর থেকে লাগানো ছিল।

পাশে শুয়া উভয় সাথিও তখন সজাগ ছিলেন। উভয়জন শুনতে পেলেন যাকারিয়া (রাহ:) কারো সাথে যেন আলাপ করছেন। তারা আশ্চর্য হলেন। রুমে অন্য কেউ নেই, তাহলে তিনি কার সাথে কথা বলেন? এই মাত্র বিছানায় গেলেন এখনো ঘুমান নি। তাছাড়া ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে কখনও কথা বলতে শুনি নি। কঠিন রোগে আক্রান্ত থাকা অবস্থায়ও এরূপ কথা বলতে শুনি নি।

তারা দীর্ঘ আলাপ শুধু শুনছেন, কিন্তু কথা কিছু বুঝছেন না। অবশেষে আছরের নামাজের জন্য যাকারিয়া (রাহ:) বের হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি দীর্ঘক্ষণ কার সাথে আলাপ করেছেন?

হযরত তখন ওজুতে ছিলেন। মুখে পানি মেরে স্নেহভরে বললেন, তোমরা আলাপ-আলোচনা শুনেছ? অতপর বললেন, আজরাইল এসেছিলেন তার সঙ্গে কথা বলেছি।

জাগ্রত অবস্থায় আজরাইলের সাথে সাক্ষাৎ

যে দিন মারা যান সে দিন আমি (লেখক) তাঁকে ওজু করাচ্ছিলাম। হযরত বললেন, তুমি কে? বললাম, আমি ইউসুফ। তিনি বললেন, আজকে মালাকুল মাউত এসেছেন। আমি বললাম, স্বপ্নে দেখেছেন? বললেন, না। জাগ্রত অবস্থায় তিনি এসেছেন। হাসি তামাশার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেছেন।

জাগ্রত অবস্থায় তাঁর সাথে মালাকুল মাউতের এটা ২য় সাক্ষাত।

মরণের ত্রিশ বছর পূর্বে আজরাইলের সাথে তাঁর সাক্ষাতের ঘটনা মুফতি মাকবুল আহমদ সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি। তিনি বলেন (যাকারিয়া রহ.) আমার কপালে একটি ফোঁড়া বের হল ডাক্তারী চিকিৎসা চলছে।

117

এক পর্যায়ে একজন বলল, এই রোগের একটি চিকিৎসা আছে যা দ্বারা সমস্ত পুঁজ বের হয়ে যাবে। রমজান মাস ছিল। এখনো সেহরী খাওয়ার প্রচুর সময় বাকি আছে। ফোঁড়ার বেদনায় আমি মনে করলাম এখন মনে হয় আমার শেষ সময় এসেছে। পরিবারের লোকদের সেহরী খাওয়ার জন্য বারবার আদেশ করলাম। কারণ যদি আমি মারা যাই তাহলে তারা আর সেহরী খেতে পারবে না। এই তীব্র কষ্টের মুহুর্তে আমি একবার চোখ বন্ধ করি, আবার খুলি। মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র আজরাইল চলে আসবেন। মুলত এই তীব্র ব্যথা ফোঁড়া উপশমের কারণ ছিল। অবশেষে ব্যথা কমে গেল। আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলাম।

পরের দিন রুটিন অনুযায়ী যখন সকাল বেলা উপর তলায় অবস্থিত কুতুবখানাতে ছিলাম। পিছন দিক থেকে সিঁড়ির দরজা বন্ধ ছিল। এমতাবস্থায় একজন সুদর্শন ব্যক্তি আমার সামনে আসলেন। আমি বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি যার জন্য আপনি রাতে অপেক্ষা করেছিলেন। আমি বললাম, আমাকে এখন নিয়ে যান? উনি বললেন, এখন নয় ।

স্বপ্নযোগে সাক্ষাত

ইংল্যান্ডের ২য় সফরে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। ২য় দিন তার অবস্থা আমাদের কাছে আশংকাজনক মনে হল। এমনকি ইংল্যান্ড থেকে তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠানোর জন্য বিমানের কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা হয়ে গেল। কিন্তু যখন তিনি সুস্থ হয়ে দারুল উলুম (লন্ডন) ফিরে আসলেন তখন তিনি বললেন, আমার মরণের ব্যাপারে চিন্তা কর না। আমাকে কথা দেওয়া হয়েছে এখন আমি মরব না।

অতপর বললেন, আমি তোমাদেরকে স্বপ্নযোগে মালাকুল মউতের সাথে সাক্ষাতের ঘটনা শুনাব। একথা বলে তিনি বলতে লাগলেন যে, একদা আমি মক্কা শরীফে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। একদিন আমি স্বপ্নযোগে দেখলাম, এক সুদর্শন যুবক আমার কাছে এসেছেন। আমি বললাম, আপনি কে? সে বলল, আমি মালাকুল মাউত (আজরাইল)। অতপর আমি বললাম, আমাকে নিয়ে যান? আজরাইল বললেন, এখন নয়, আপনি মদীনাতে গেলে সেখানে আসব।

118

অতপর যখন মক্কা থেকে মদীনায় যাই তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার কাছে এসে তিনি ফিরে যাচ্ছেন। আমি বললাম, ভাই আপনি বললেন মদীনাতে আসলে আমাকে নিয়ে যাবেন, এখন তো আমি মদীনাতে আছি। তাহলে আমাকে নিয়ে যাওনা কেন? তখন তিনি হেসে বললেন, তোমার থেকে এখনও কাজ নেওয়া বাকি রয়ে গেছে।

মৃত্যুর পূর্বে যাকারিয়া (রাহঃ) ঘরের কোণের দিকে ইশারা করে বললেন, এখানে শয়তান দাঁড়ানো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি? (স্বাভাবিক নিয়মে সে এসেছিল। যা হাদীছে বর্ণিত আছে। শয়তান আসে ঈমান হরণের জন্য। কিন্তু যাকারিয়া (রাহঃ) এর কাছে আসার সাহস পাবে কোথা থেকে?)

মৃত্যুর তিন-চার দিন আগে মাওলানা নজীবুল্লাহ তাঁকে ইস্তেঞ্জা করাচ্ছিলেন। আমি বাথরুমের বরাবর সামনের রুমে ছিলাম। রাত তখন ১২ টা বাজে। হঠাৎ বাহির থেকে ২ বার কেউ যেন চিৎকার করে বলল, নজীবুল্লাহ। আমি দৌঁড়ে বাহিরে এসে কোন লোক পাইনি।

আম্মাজানের বেলায়ও এমনটা হয়েছে। তিনি কুরআন শরীফ খতম করে মৃতদের মধ্য থেকে কারো উপর ছওয়াব বখশাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে কেহ উচ্চস্বরে তাঁর নাম নিয়ে ডাকল। অথচ ঘরে তখন দুই তিন জন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই ছিল না। নিশ্চয় এটা অদৃশ্য ঘোষকের ডাক।

মৃত্যুকালীন অসুস্থতা

ডাঃ ইসমাঈল সাহেব মায়মনী হযরতের শেষ বিদায়ের অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করে লিখেন, ১৯৮২ সনের ২৬মে রবিবার দিবাগত রাতে হযরত যাকারিয়া রহ. কিছুটা বেহুঁশ ছিলেন। ২য় দিন ফজর থেকে পুরোপুরি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। রবিবার পূর্ণ দিন বেহুঁশ ছিলেন। যেই পার্শ্বে শুয়ানো হত ঐ পাশেই থাকতেন। নড়াচড়া, খানাপিনা, কথা বলা সব বন্ধ হয়ে গেল। ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করে দেখা গেল আশংকাজনক । তাঁর চিকিৎসা চলতে থাকল। রবিবার বিকালে বুখারী শরীফ খতম করা হলো। তাঁর ছেলে মাওলানা তালহা খতমের পর অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে দোয়া করলেন। মক্কা মুকাররামার শায়খ মোহাম্মদ আলাওয়ী মালেকীর এখানেও ইয়াসিন খতম করে দোয়া করা হলো।

119

১৭ মে সোমবার ও বেহুঁশ ছিলেন। তবে আগের দিনের মত নয়। কিছুটা শক্তি শরীরে ছিল। সকাল থেকে আল্লাহ আল্লাহ বলতে থাকলেন। জুহর পরে ইয়া কারীমু, ইয়া কারীমু বলতে থাকলেন। কখনও ইয়া হালিম, ইয়া কারীমুও বলতেন। ইয়া কারীমু শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত বলতে থাকলেন।
অসুস্থতার সময় আমি অযোগ্য অন্যান্য ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলাম। বিশেষত ডা: আশরাফ সাহেব, আইয়ুব সাহেব, সুলতান সাহেব, মনসুর সাহেব, আ: আহাদ সাহেব সহ আরো কয়েকজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলাম। রক্ত পরীক্ষার জন্য ডা: ইনসেরাম সাহেব অনেক সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু হার্টের দূর্বলতা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকল। রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা সময়ে সময়ে চলতে থাকল। এদিক দিয়ে খাবার বন্ধ ছিল। স্যালাইন পুশ করে খাবার দেওয়া শুরু হল। ২১মে জুমআর নামাজ হরম শরীফে জামাতে শরীক হয়ে মাদরাসায়ে শরয়ীয়ার প্রধান ফটকে আদায় করেন।

মৃত্যু

২৩ মে রবিবার সকাল পর্যন্ত শারিরিক অবস্থা কিছু ভাল দেখা গেল। জুহর পরে শ্বাসকষ্ট দেখা গেল। সাথে-সাথে চিকিৎসার মাধ্যমে দূর হয়ে গেল। মাগরিবের আধ ঘণ্টা পূর্বে আমি অধম ক্লিনিকে ছিলাম। ইত্যবসরে হযরতের খাদেম মৌলভী নজীবুল্লাহ ফোন করে বলল, হুজুরের শরীর খুবই খারাপ। আমি খবর পেয়ে সাথে সাথে উপস্থিত হলাম। দেখলাম শাসকষ্ট বহু বেড়ে গেছে। যদ্দরুণ তিনি বেশি দূর্বল হয়ে গেছেন। ঘন ঘন শ্বাস নিতে পারছেন না। সাথে সাথে আমি ইঞ্জেকশন পুশ করলাম। ফলে কিছুক্ষরে মধ্যে আরাম লাভ করেন। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসল।
এশার পর আমি ঘরে যাওয়া পর্যন্ত শারিরিক অবস্থা ভালো ছিল। হযরত কিছু কিছু কথাও বলছিলেন। কিন্তু পেরেশানীর বিষয় ছিল গতকাল যুহর থেকে এখনো পর্যন্ত প্রস্রাব হয় নি। সকাল যখন আটটা বাজে তখন ২য় বার শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। সাথে সাথে শ্বাসকষ্ট এবং প্রস্রাবের জন্য চিকিৎসা চলতে লাগল। জুহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে প্রস্রাব হল। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার জন্য ইঞ্জেকশন এবং অক্সিজেন দেওয়া হল।

দুপুর বারটা পর্যন্ত অস্থির অবস্থায় ছিলেন। কখনও বসাতে বলেন, কখন শুয়াতে বলেন, আবার কখনও বলেন, ঔষধ দাও। আবার উচ্চ আওয়াজে ইয়া কারীমু, ইয়া কারীমু বলেন। আমি অধম (ডা:ইসমাঈল) যেহেতু ধারাবাহিকভাবে কাছে বসা ছিলাম তাই মাঝে মধ্যে আমার হাতে চেপে ধরেন। প্রায় ১১ টার সময় যখন আলহাজ আবুল হাছান বালিশ উঁচু করলেন তখন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডা: সাহেব নাকি? আবুল হাছান বললেন, হ্যাঁ, ডা: ইসমাঈল সাহেব তা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। এটাই ছিল শেষ কথাবার্তা। অতপর তিনি ইয়া কারীমু, ইয়া কারীমু বলতে থাকলেন। জুহর পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল। জুহরের পর থেকে পুরোপুরি প্রশান্ত হয়ে যান। শেষ সময় পর্যন্ত শান্ত ছিলেন। আমি বারবার রগ, ব্লাড প্রেসার দেখছিলাম।

রূহ বাহির হওয়ার কিছু পূর্বে ছাহেবযাদা মাওলানা তালহা আমাকে বললেন, এটা কি শেষ মুহুর্ত? আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, হ্যাঁ, তখন তাঁর ছেলে উচ্চ আওয়াজে আল্লাহ আল্লাহ বলতে লাগলেন। এ সময় ২বার হাঁচি দেন। যদ্দরুণ চক্ষু এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়। আর প্রাণবায়ু চলে যায়। তখন সময় ছিল বিকাল ৫টা বাজে ৪০ মিনিট। অর্থাৎ মাগরিবের দেড় ঘণ্টা পূর্বে।

اِنَّالِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنُ اَللّٰھُمَّ آجِرْنَا فِيْ مُصِيْبَتِنَا عِوَضَنَا خَيْرًا مِنْهَاوَاِنَّابِفِرَاقِكَ
يَاشَيْخُ لَمَحْزُوْنُوْنَ

যার গোটা জীবন ছিল সুন্নতের প্রতি পাবন্দী, মরণটাও হলো আল্লাহর ইচ্ছায় সুন্নতের সাথে মিল রেখে। সোমবার মাগরিব ও আছরের মধ্যবর্তী সময়। মৃত্যুর সময় কাছে উপবিষ্ট লোকদের অবস্থা কেমন হয়েছিল তা বর্ণনার ভাষা নেই। মৃত্যুর সময় কাছে ছিলেন তাঁর ছেলে মাওলানা তালহা, আকিল, তাদের দুজনের সন্তান জাফর, আবুল হাছান, নজীবুল্লাহ, সুফি ইকবাল, মাওলানা ইউসুফ, হাকিম আ:কুদ্দুস প্রমূখগণ।

দাফন কাফন

সাথে সাথে দাফন কাফনের ব্যবস্থা শুরু হলো। ডা: আইয়ুব সাহেব ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আসার জন্য হাসপাতালে গেলেন। তাঁর ছেলেদ্বয় মাওলানা তালহা, আকিল ও অন্যান্যরা পরামর্শ করতে লাগলেন এশার পর দাফন করা হবে নাকি ফজর পর দাফন করা হবে? কারণ কিছু বন্ধু-আত্মীয় স্বজন মক্কা মুকাররামা থেকে খবর জানাল জানাযায় শরীক হওয়ার। যেহেতু সেখান থেকে

এশার সময় পৌঁছানো নিশ্চিত ছিল। তাই নির্ধারিত হলো এশার নামাজের পরপরই জানাযা হবে। ফজর পর্যন্ত বিলম্ব করা উচিত নয়। এ'লানও করে দেওয়া হলো। কিন্তু ঐ সকল আগত বন্দুরা মক্কা থেকে রওয়ানা দিয়ে পথিমধ্যে গাড়ি নষ্ট হওয়ার কারনে সময় মত না পৌছানোতে জানাযায় অংশ গ্রহন করতে পারেন নাই। ফলে তাদের সর্বদা আফসোস রয়ে গেল।

ফোনে সর্বত্র সংবাদ দেওয়া হলো। মাগরিবের পর গোসল দেওয়া হলো। মাওলানা আকিল ও মাওলানা ইউসুফ মোতালা সাহেবের দিক নির্দেশনায় গোসল দেওয়া হলো। গোসলের সময় খাদিমদের বিরাট দল উপস্থিত ছিল। সকলের কামনা ছিল গোসল কার্যে শরীক হওয়ার। গোসল কার্যে অংশগ্রহনকারিদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন, মাওলান ইউসুফ সাহেব, আবুল হাছান, মাওলানা নজীবুল্লাহ, হাকিম আব্দুল কুদ্দুস, শাহ আতা উল্লাহ বুখারীর ছেলে শাহ আতাউল মুহাইমিন, মাওলানা আহসান, কাজী আবরার, আব্দুল মজীদ, মুফতি আসলাম প্রমুখ।

ডা: মো: আইয়ূব যিনি ডেথ সার্টিফিকেট আনতে গিয়েছিলেন পুর্ণ ২ ঘন্টা পর এসে জানালেন সার্টিফিকেট পেতে কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে। তাই সাহেবযাদা মাওলানা তালহাও সঙ্গে গেলেন। কবরস্থানের লোকদেরকে কবর খননের নির্দেশ দেওয়া হলো। তারা বলল হাসপাতালের সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত কবর খনন করা যাবে না। এ সময় এশার মাত্র পৌনে দুই ঘন্টা বাকি ২য় বার পরামর্শ হলো যে এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে এশার পর জানাযা করা যাবে না। তাই ফজর পরে জানাযা হবে।

কিছুক্ষন পর সায়্যিদ হাবীব সাহেব আগমন করে বললেন আমি নিজে যেয়ে কবর খননের জায়গা বলে দিব। যাই হোক তার কথায় কবর খনন করা শুরু হলো। প্রায় ২০ মিনিট পর সার্টিফিকেট নিয়ে তারা হাজির হলো। এদিকে কবর খনন করা শেষ হওয়ার সংবাদও আসল। কবরস্থানের লোকেরা লাশ বহনের খাটিয়াও নিয়ে আসল। মোট কথা এশার আযানের ১৫মিনিট পুর্বে জানাযার প্রস্তুতি পুর্ণ হয়ে গেল। পুর্ব পরামর্শ অনুযায়ী লাশ বাবুস সালাম দিয়ে হরম সীমানায় নিয়ে আসা হলো। এশার ফরজের পরেই সেখানের রীতি অনুসরনে হরমের ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ যাহিম জানাযার ইমামতি করেন। লাশ বাবে জিব্রাইল দিয়ে জান্নাতুল বাকীর দিকে নিয়ে যাওয়া হলো।

122

ভিড় ছিল প্রচুর। এমন ভিড় অন্য কোন জানাযায় সচারাচর দেখা যায়নি। হযরতের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর কবর আহলে বয়তের সীমানায় হযরত সহারানপুরী (রাহ:) এর কবরের পাশে খনন করা হয়। সাহেবযাদা মাওলানা তালহা এবং আলহজ্ব আবুল হাছান কবরে নামেন এবং তাঁকে কবরে রাখেন।

মুতাআল্লিকীনদের ব্যাপারে হযরতের চিন্তা ফিকির

মৃত্যুর একদিন পুর্বে দেখা গেল যাকারিয়া (রাহ:) একজন একজন করে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি কর? সুফী ইকবাল, আলহাজ্ব আবুল হাছান ও এই অধমকে পৃথক পৃথক করে জিজ্ঞেস করলেন। সাহেবযাদা মাওলানা তালহা পার্শ্বের কামরায় ছিলেন। খাদিম পাঠিয়ে খবর দিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন কি কাজ করছ? প্রত্যেকেই বললেন যিকির-আযকার তেলাওয়াতে ছিলাম। তখন তিনি নিশ্চুপ হলেন। আমাকে জিজ্ঞাস করলেন। আমি উত্তর দেওয়ার আগে আবুল হাছান বললেন তিনি এক্ষুনি যেয়ে হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা দিবেন। তখন বললেন এটা কি কোন কাজ? মোটকথা শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন।

সুসংবাদ প্রাপ্তি

দাফনের পর হযরতের একজন মুরিদ স্বপ্নে দেখেন কেহ যেন বলছে তাঁর জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্য একজন সাথি ২য় দিন রওজা শরীফে সালাত সালাম পাঠকালে অনুভব করলেন যে, রাসুল (সা:) বলছেন তোমাদের শায়খ কে ইল্লিয়িনের সুউচ্চ স্থানে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এমন মানুষ লক্ষ কোটির মধ্যে কয়জন হবে?

(শায়খুল হাদিছ যাকারিয়া-মাওলানা আবুল হাসান নদভী-১৭৭-১৮২পৃষ্টা)

হযরত ইয়ায বিন কাতাদাহ আবশামী (রাহ:)

একদিন তিনি আয়নায় চেহারা দেখছিলেন। মাথার কিছু চুল সাদা দেখে বলতে লাগলেন চুল সাদা হয়ে গেছে এখন পরকালের কর্মে ব্যস্ত না হয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়াটা অনুচিত। এখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময়। এরপর থেকে অধিক হারে ইবাদত করতে লাগলেন।

কোন এক শুক্রবার দিনে জুমআর নামাজ আদায় করে বাড়ি ফিরছিলেন। আসমানের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, তোমার আগমন শুভ হউক, তোমার জন্য খুবই অপেক্ষমান। একথা বলে সাথিদেরকে বললেন আমি মারা গেলে মালহুব নামক স্থানে দাফন করবে। একথা বলতে বলতে পড়ে মারা যান। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮০ পৃষ্টা)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রাহ:)

আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রাহ:) মৃত্যুর সময় হেসে হেসে বলতে লাগলেন, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ অর্থ:এমন প্রতিদানের জন্য কর্মশিলদের কাজ করা উচিত। যখন তাঁর মৃত্যু একদম নিকটবর্তি হল তখন গোলাম নসরকে বললেন আমাকে মাটিতে শুইয়ে দাও। গোলাম কাঁদতে লাগল। বললেন কাঁদ কেন? আপনি কত আরামের সাথে জীবন অতিবাহিত করলেন আর এখন ফকিরদের মত জমিনে মাথা রেখে মরতে চাচ্ছেন।

তিনি বললেন চুপ থাক। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আমার মৃত্যু যেন ফকিরদের মত হয়।
(ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৭২ পৃষ্টা)

তারপর বললেন কলিমার তালকিন করার সময় একবার বলার পর আমার জবানে ভিন্ন কথা উচ্চারন হওয়া পর্যন্ত ২য় বার তালকিন কর না।
(এহইয়াউল উলুম খন্ড ৪ পৃষ্টা ৬৭৯)

১৮১ হিজরীতে রমজান মাসে মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যুর পর একজন নেককার ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন কেহ যেন বলছে ইবনুল মোবারক ফেরদাউসের উচুস্থানে পৌঁছে গেছেন। (বুসতানুল মুহাদ্দিসীন ১০৩)

ছখর বিন রাশেদ বলেন আমি ইবনুল মোবারক কে স্বপ্নে দেখে বললাম আপনি কি মৃত্যুবরন করেন নাই? বললেন কেন করব না? আমি বললাম আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? বললেন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি বললাম সুফিয়ান সাওরীর অবস্থা কি? বললেন হায় হায় উনি তো নবী ছিদ্দীক শহীদগনের সাথে আছেন। (কিতাবুর রূহ ইবনুল কায়্যিম ৫৬)

শফিক ইবনে ইবরাহিম বলেন ইবনুল মোবারক কে নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পর যখন বলা হত আমাদের সাথে বসবেন না? তিনি বলতেন আমি ছাহাবী তাবেয়ীদের সাথে বসব। কারণ জিজ্ঞাস করলে তিনি বলতেন উনাদের

124

কাছে ইলম আমলের নিদর্শন পাওয়া যায়। আর তোমরা শুধু মানুষের গীবত কর।

মৃত্যুকালে যখন অধিক হারে কালিমার তালকীন করা হলো তখন তিনি নিষেধ করলেন। আর বললেন যখন আমি একবার বলি তখন থেকে ভিন্ন কথা বলা পর্যন্ত ঐ আকিদার উপর অটল থাকি। ১৮১ হিজরীর রজব মাসে এক জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে সফরে মারা যান।

হযরত খায়র নুর বাফ (রাহঃ)

আবুল হুসাইন মালেকি বলেন আমি খায়ের নুর (রাহ:) এর সাথে কয়েক বছর কাটালাম। মৃত্যুবরনের আট দিন পুর্বে আমাকে বললেন বৃহ:স্পতিবার সন্ধাবেলা আমি মারা যাব। শুক্রবার জুমআর পরে আমাকে দাফন দিবে। খবরদার ভুলে যেওনা কিন্তু। আমি ভুলে গেলাম।

শুক্রবার সকাল বেলা এক ব্যক্তি তাঁর মরনের খবর জানালো। আমি দ্রুত গেলাম জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য। পথিমধ্যে তার ঘর থেকে প্রত্যাবর্তকারী লোকেরা জানাল জুমআর নামাজের পর দাফন হবে।

আমি তাঁর ঘরে পৌঁছে মৃত্যু কিভাবে হয়েছে জানতে চাইলে একজন বলল গতকাল মাগরিবের সময় বেহুশ হন। আবার হুশ ফিরলে ঘরের কোনার দিকে ইশারা করে বললেন একটু থামুন আপনি যে ভাবে একটি কাজের আদেশ পেয়েছেন আমিও সেভাবে একটি কাজের আদেশ পেয়েছি। তুমি যে কাজের আদেশ পেয়েছ তা সময় গড়িয়ে গেলে নি:শেষ হবে না। আমার উপর আরোপিত আদেশটি এই মুহুর্তে আদায় না করলে বাকি থেকে যাবে তাই একটু অপেক্ষা করুন।

অতপর ওজুর পানি চাইলেন। অজু করলেন, নামাজ পড়লেন। তারপর পা লম্বা করে চোখ বন্ধ করলেন। এই অবস্থায় মারা যান। কেহ স্বপ্নযোগে অবস্থা জিজ্ঞাস করল। বললেন এটা জিজ্ঞাস কর না। তোমার পঁচা, বাসি দুনিয়া থেকে মুক্তি মিলল।

(ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৮৩)

125

হযরত আহমদ বিন খাজরুবিয়াহ (রাহঃ)

মোহাম্মদ বিন হামিদ (রাহঃ) বলেন আমি আহমদ বিন খাজরুবিয়াহ (রাহঃ) এর মৃত্যুর সময় পাশে বসা ছিলাম। তাঁর মৃত্যুযন্ত্রনা শুরু হলো, তখন বয়স ছিল ৯৫ বছর। কোন একজন ব্যক্তি তাঁকে ঐ সময় মাসআলা জিজ্ঞাস করল। তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন বেটা ৯৫বছর যাবৎ একটি দরজা খুলতে চেষ্টা চালিয়ে আসছি এখন তা খুলতে যাচ্ছে। কিন্তু এখন চিন্তা হল সৌভাগ্যের সাথে খুলবে না দুর্ভাগ্যের সাথে খুলবে? এখন তোমার মাসআলার জবাব দেওয়ার সুযোগ কোথায়?

ইত্যবসরে পাওনাদারগণ জড়ো হল। তাঁর কাছে পাওনা ছিল ৭০০ দিনার (আশরাফী)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ ঋণদার কে আশ্বস্ত রাখার জন্য আপনি বন্ধকের আইন প্রচলন করেছেন। এতদিন আমি জীবিত ছিলাম বিধায় তারা পাওয়ার আশায় ছিল। এখন আমি চলে যাব অতএব আপনি ঋণ আদায় করে দিন।

তখনই দেখা গেল দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে আর বলছে আহমদের ঋণদাররা কোথায়? তারপর আগন্তুক সকল ঋণ আদায় করল। এদিক দিয়ে তাঁর প্রান বায়ু উড়ে গেল।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. এর স্বপ্ন

উমর ইবনুল আব্দুল আজিজ (রাহঃ) এর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক বলেন এক রাতে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ জাগ্রত হয়ে বললেন আমি একটি আনন্দময়ি স্বপ্ন দেখেছি। আমি বললাম বলুন স্বপ্নটি কি দেখেছেন? উমর বললেন সকাল পর্যন্ত বর্ণনা করব না। সকাল বেলা যখন তিনি মসজিদে যেয়ে নামাজ পড়ে আসলেন তখন আমি তাঁকে একা পেয়ে গনিমত মনে করে স্বপ্ন বর্ননার জন্য আবেদন করলাম। তিনি স্বপ্ন বর্ননা করলেন।

তিনি বলেন আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন ব্যক্তি আমাকে সবুজ শ্যামল সুপ্রশস্ত একটি ময়দানে নিয়ে গেল। ময়দানের দিকে তাকালে মনে হল যেন যমরুদের বিছানা বিছানো। হঠাৎ একটি শ্বেত বিল্ডিং দৃষ্টি গোচর হল। বিল্ডিংয়ের দিকে তাকাতেই দেখলাম একজন ব্যক্তি বাহির হয়ে চিৎকার করে বলছে, মুহাম্মদ

126

বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম মুহাম্মদ (সাঃ) (আল্লাহর নবী) বিল্ডিংয়ের দিকে যেয়ে প্রবেশ করলেন।
অতপর ২য় আরেক ব্যক্তি বের হয়ে চিৎকার করে বলল আবু বকর বিন কুহাফা কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর ও বিল্ডিংয়ের দিকে যেয়ে প্রবেশ করলেন।
৩য় নম্বারে আরেক জন বের হয়ে চিৎকার করে বলল উমর ইবনুল খাত্তাব কোথায়? তখন দেখলাম তিনিও বিল্ডিংয়ের দিকে যেয়ে প্রবেশ করলেন।
৪র্থ নম্বারে আরেক ব্যক্তি বের হয়ে বলল, উসমান বিন আফফান কোথায়? তখন দেখলাম উছমানও যেয়ে বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করলেন।
৫ম নম্বারে আরেক জন বের হয়ে বলল আলী বিন আবু তালিব কোথায়? তখন দেখা গেল তিনিও যেয়ে বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করলেন।
৬ষ্ট নম্বারে আরেক জন বের হয়ে বলল উমর বিন আব্দুল আজিজ কোথায়? তখন আমিও যেয়ে বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করলাম। আমি সোজা রাসুলের কাছে গেলাম এমতাবস্থায় রাসুলের চতুর্দিকে সাহাবায়ে কেরাম। আমি এ অবস্থা দেখে মনে মনে বললাম আমি কোথায় বসব? অবশেষে আমার নানা উমর বিন খাত্তাবের কাছ বসে গেলাম। আমি ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম রাসুলের ডানে আবু বকর বামে উমর। ২য় বার চোখ উচিয়ে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম আবু বকর ও রাসুলের মাঝে ৩য় আরেক জন ব্যক্তি বসা। আমি বললাম এই লোকটা কে? বলা হল উনি ইসা (আঃ)। হঠাৎ নুরের পর্দার পিছন থেকে আওয়াজ এল হে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, তুমি যেই রাস্তার উপর আছ থাক।
এক পর্যায়ে আমার বাহির হয়ে আসার অনুমতি মিলল। বাহির হওয়ার সময় পিছনে তাকিয়ে দেখি উসমানও বাহির হয়ে আসছেন আর বলতেছেন আলাহামদু লিল্লাহ আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। উসমানের পিছনে আলী (রাঃ)ও বের হয়ে আসছেন আর বলতেছেন, আলাহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেছেন।
অন্যত্র তিনি স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি রাসুল (সাঃ) কে আবু বকর ও উমর (রাঃ) এর কাছে বসা দেখলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আলী ও মুআবিয়া (রাঃ) কে ডেকে এনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হযরত আলী বের হয়ে আসলেন আর বলতে থাকলেন কাবার রবের কছম!

127

আমার বিবাদের মিমাংসা হয়ে গেছে। অতপর মুআবিয়া (রা:)ও বের হয়ে আসলেন আর বলতে থাকলেন কাবার রবের কছম আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। অপর এক ব্যক্তি উমর ইবনে আব্দুল আজিজ সম্পর্কে অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছেন। যা তিনি উমরের কাছে বর্ণনা করেছেন । ঐ ব্যক্তি বলেন আমি রাসুল (সা:) কে দেখলাম এ অবস্থায় যে, রাসুলের ডানে আবু বকর আর বামে উমর (রা:)। আর দুজন ব্যক্তি ঝগড়া করে আসতেছেন। এক পর্যায়ে রাসুল আপনাকে ডেকে বলছেন হে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ তুমি কোন কাজ করলে তা আবু বকর উমরের ন্যায় করবে। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাহ:) ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে স্বপ্ন শুনার পর তাকে কছম দিয়ে বললেন সত্যিই কি তুমি এ স্বপ্ন দেখেছ? লোকটি কছম করে বলল হ্যাঁ। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন।
(কিতাবুর রূহ ইবনুল কায়্যিম ৭০-৭১)

উমর ইবনুল আব্দুল আজিজের খোদাভীতি

হযরত মায়মুন বিন মেহরান বলেন, আমি একদা উমর ইবনে আব্দুল আজিজের সাথে কবরস্থানে গেলাম। যখন তিনি কবরসমুহ দেখলেন সাথে সাথে কাঁদতে শুরু করলেন। আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন হে মায়মুন, এই হল আমার বাপ দাদা বনী উমাইয়ার কবর সমুহ। আজ তাকিয়ে মনে হচ্ছে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের সাথে তাদের আদৌও কোন সম্পর্ক ছিল না। তুমি কি তাদের আরাম আয়েশের অবস্থা দেখ নাই? কিন্তু আজ তাদের উপর বিপদ আরোপিত হয়েছে। তাদের শরীর হয়ে গেছে কীট পতঙ্গের বাসস্থান। একথা বলে আবার কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন আল্লাহর শপথ, যে ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে, আমি তার চাইতে ভাগ্যবান আর কাউকে মনে করি না। (মিনহাজুল কাসিদিন ইবনুল জাওযী)

উল্লেখ আছে, তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন আগে ইবনু আবী যাকারিয়া অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে আসলেন। তখন তিনি ও আগন্তুক ব্যক্তি আখেরাতের আলোচনা করে কাঁদলেন। আর দোয়া করলেন হে আল্লাহ আমাদেরকে উঠিয়ে নাও। ইত্যবসরে উমর ইবনে আব্দুল আজিজের একটি ছোট বাচ্চা হোচট খেয়ে জমিনে পড়ে যায়। তখন তিনি বললেন হে আল্লাহ ঐ সন্তানটি আমার খুব প্রিয় তাকেও আমাদের সাথে মৃত্যু দিও। বর্ণনাকারী বলেন প্রায় এক সপ্তাহের মাথায় তিনজনই মারা যান।

128

মৃত্যুর প্রেরণা এবং পরলোকগমন

মায়মুন বিন মেহরান বলেন মৃত্যুর পুর্বের কিছুদিন আগ থেকে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.অধিক হারে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতেন। একজন তাঁকে বলল আল্লাহ আপনার দ্বারাতে রাসুলের অনেক সুন্নাত জিন্দা করে রেখেছেন অনেক বেদআতের মুলোৎপাটন করেছেন। অতএব এরূপ দোয়া করবেন না। তিনি বললেন আমি কি নেককার বান্দা ইউসুফ (আ:) এর মত হবো না। তিনি তো দোয়া করেছিলেন رَبِّ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ হে আল্লাহ মুসলমান অবস্থায় আমার মৃত্যু দান কর। আর নেককারদের অন্তর্ভূক্ত কর।

তাঁর মৃত্যু ১০১ হিজরীর রজব মাসে হিমসের অন্তর্গত দিরে সামআন নামক স্থানে হয়েছে। তাহার খেলাফত কাল ছিল ২ বছর পাঁচ মাস থেকে কিছু বেশি।

যেভাবে শহিদ হলেন

বয়স চল্লিশ বছর হতে না হতেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী এক গোলামের মাধ্যমে খানার মধ্যে বিষ মিশ্রিত করে তাঁকে পান করিয়ে দেয়।

মৃত্যুকালিন অসুস্থতার সময় একজন ডাক্তার এসে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে বলল তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। অতএব তাঁর বাঁচার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ তখন বললেন যাকে বিশ খাওয়ানো হয়নি তাঁর জীবনেরও কোন ভরসা করা উচিত নয়।

ডাক্তার বলল আপনি কি জেনে নিয়েছেন যে আপনাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে? তিনি বললেন খাবার যখন আমার পেটে গিয়েছিল তখনই আমি বুঝতে পেরেছি।

ডাক্তার বলল, আপনার মৃত্যু কোথায় জানি হয় এই ভয়ে আমরা আপনার চিকিৎসা করতে চাই। তিনি বললেন প্রভুর কাছে চলে যাওয়াই উত্তম। আমার কানের লতির কাছেও যদি আমার বেচে যাওয়ার নিশ্চয়তার কোন ঔষধ বিদ্যমান থাকে তাহলেও ঐ পর্যন্ত আমার হাত নিব না।

অতপর তিনি দোয়া শুরু করলেন اَللّٰهُمَّ خِرْ لِعُمَرَ فِىْ لِقَائِكَ এর কিছু দিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে লোকেরা চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নিয়ে আসল। ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানাল যে, আল্লাহর ভয়ে কলিজা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার কোন চিকিৎসা নাই।

বর্ণিত আছে, মৃত্যু নিকটবর্তি হলে তিনি কাঁদতে লাগলেন কোন একজন বলল কাঁদেন কেন? আপনার দ্বারাতে আল্লাহ অনেক সুন্নাত জিন্দা করেছেন বিদআত মুলোৎপাটন করেছেন। উত্তরে বললেন আমি কি হাশরের মাঠে দাড়াব না? সৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হব না? যদিও আমি পরিপুর্ণ ন্যায় ইনসাফ করেছি। (এহয়াউ উলুমিদ্দিন উর্দু ৪র্থ খন্ড)

অসুস্থতার সময় গোলামকে ডেকে বললেন তুমি খাবারে বিষ মিশ্রিত কেন করেছ? গোলাম বলল এক হাজার দিনার পুরুস্কার পাওয়ার লোভে। তখন গোলামকে বললেন এক হাজার দিনার বায়তুল মালে রেখে তুমি এমন স্থানে পলায়ন কর যেখানে তোমাকে কেউ দেখবে না।

মৃত্যুর সময় মাসলামা এসে বললেন আপনি কাফনের জন্য যে টাকা দিয়েছেন তা দিয়ে তো অত্যন্ত নিম্নমানের কাফন আনা হয়েছে। ভাল কাফনের জন্য অতিরিক্ত টাকার অনুমতি দেন। তিনি বললেন কাফনের কাপড় আমার কাছে নিয়ে আস। কাপড় আনা হল। তিনি কিছুক্ষণ কাপড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি আমার প্রভু আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে এর থেকে উত্তম কাপড় অতিসত্তর মিলবে। আর যদি অসুন্তুষ্ঠ হন তাহলে এই কাপড়ও দ্রুত সরিয়ে জাহান্নামের কাপড় পরিধান করানো হবে।

অতপর বললেন আমাকে বসাও, বসানো হলে তিনি বললেন হে আল্লাহ! আমাকে যা কিছুর আদেশ করেছ তা পালন করি নাই। যা থেকে নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থাকি নাই। আমার অপরাধ হয়েছে। এ কথা তিনবার বললেন। তারপর বলতে লাগলেন হে আল্লাহ যদি ক্ষমা কর তাহলে এটা হবে অনুগ্রহ আর শাস্তি দিলে তা অবিচার হবে না। অতপর لا اله الا الله বলেই মারা যান।

মৃত্যুর পুর্বের দিন দিরে সামআনে বসবাসরত একজন যিম্মির কাছে লোক প্রেরণ করেন তার কাছ থেকে নিজের কবর পরিমান জায়গা ক্রয়ের জন্য। যিম্মি বলল হে আমীরুল মুমিনীন, আমার জমিনে আপনার কবর হওয়াটা আমার জন্য বিরাট আনন্দের বিষয় আমি এই জায়গা আপনার জন্য হাদিয়া করলাম।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এভাবে হাদিয়া নেওয়াটা অপছন্দ করলেন। ফলে জোর করে ২ দিরহাম দিয়ে জমিন ক্রয় করলেন।

তাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে রাসুলের কবরের পাশে কবর দেওয়ার জন্য। যেমন ইবনে সাআদ প্রমূখ বর্ণনা করেন-

يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ اَتَيْتَ الْمَدِيْنَةَ فَاِنْ قَضى اللهُ مَوْتًا دُفِنْتَ فِىْ مَوْضَعِ الْقَبْرِ الرَّابِعِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ

হে আমীরুল মুমিনীন যদি মদীনাতে চলে যান তাহলে রাসুল (সা:) এর ও শায়খাইনের কবরের পাশে চতুর্থ একটি কবরের স্থান বিদ্যমান আছে। সেখানে আপনাকে দাফন দেওয়া হবে।

কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, জাহান্নামের আগুনের শাস্তি ছাড়া অন্য যে কোন শাস্তি আমি মেনে নিতে রাজি আছ। বিনিময়ে আমি চাই না যে আল্লাহ দেখুন আমার অন্তরে এই মনোভাব রয়েছে যে, আমি চতুর্থ কবরের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখি। একথা বলে মদীনার দিকে যাত্রার অনুমতি প্রত্যখ্যান করেন।

আপনার পরিবারের মৃত্যুর পুর্বে মাসলামা বিন আব্দুল মালিক উপস্থিত হয়ে বলেন مَنْ تُوْصِىْ بِاَهْلِكَ কাকে খলিফা হওয়ার ওসিয়ত করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন اِذَا نَسِيْتُ اللهَ فَذَكِّرُوْنِيْ আল্লাহর স্বরন থেকে গাফিল হয়ে গেলে আমাকে স্বরন করে দিও। মাসলামা আবার প্রশ্ন করলেন

مَنْ تَوْصِىْ بِاَهْلِكَ আপনার বংশ থেকে কার সম্পর্কে খেলাফতের ওসীয়ত করবেন? তখন জবাবে বললেন

اِنَّ وَلِيِّىَ اللهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَيَتَوَلّى الصَّالِحِيْنَ

বর্ণিত আছে মৃত্যুর আগ মুহুর্তে সবাইকে কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে তাকাতে লাগলেন।

তাঁর স্ত্রী বলেন আমি দরাজার কাছে দাড়ানো ছিলাম। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন ঐ সকল চেহারা ওয়ালাদের ধন্যবাদ যারা মানুষ ও নয় জিন ও নয়। অতপর আয়াত পড়লেন

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًا فِىْ الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

কয়েকবার এ আয়াত পড়লেন। তার পর মাথা নিচু করে নিলেন। আমি দরজার কাছে দীর্ঘক্ষন দাড়িয়ে থাকলাম আর এসব অবস্থা দেখতে থাকলাম। এক

পর্যায়ে আমি অনুভব করলাম তিনি নড়াচড়া করছেন না। তখন খাদেমকে ডেকে বললাম দেখতো কি হয়েছে? খাদিম ভিতরে প্রবেশ করে চিৎকার করে বলল তাঁর রূহ চলে গেছে। মৃত্যুকালে নিজেই নিজের চেহারা কিবলামুখি করে নেন। একহাত মুখের উপর অপর হাত চুখের উপর রাখা ছিল।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাহ:) এর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক বলেন আমার স্বামী মৃত্যুর সময় দোয়া করছিলেন, হে প্রভু আমার মৃত্যু মানুষের সামনে প্রকাশ কর না। কিছুক্ষণের জন্যও প্রকাশ কর না। এই দোয়ার ফলে দেখা গেলো যেদিন তিনি মারা যান ঐ দিন আমি তাঁর কাছ থেকে অন্য রুমে চলে যাই। তাঁর মধ্যে আর আমার মধ্যে একটি দরজা প্রতিবন্ধক ছিল। আমি পার্শের রুম থেকে শুনলাম তিনি পড়ছেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِيْ الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

এ আয়াত পড়ে তিনি নিরব হয়ে গেলেন।

যখন দীর্ঘক্ষণ যাবত কোন আওয়াজ শুনা যাচ্ছে না তখন তাহার গোলামকে দেখার জন্য পাঠালাম। সে কাছে যেয়ে চিৎকার করল। আমি দ্রুত গেলাম গিয়ে দেখলাম তিনি মারা গেছেন। মোটকথা আল্লাহ তাঁর দোয়াকে কবুল করেছেন। কিছুক্ষনের জন্যও তার মৃত্যুর অবস্থা প্রকাশ হয়নি।

(এহইয়াউল উলুম উর্দূ খন্ড ৪-৪৭৭-৪৭৮পৃষ্টা)

মৃত্যুর পুর্বে কোন একজন কিছু ওসিয়ত করার জন্য আবেদন করল। তিনি বললেন আমি তোমার ঐ অবস্থার জন্য ভয় করছি যে তোমারও একদিন এমন হবে। (এহইয়াউল উলুম উর্দূ খন্ড ৪-৪৭৭-৪৭৮ পৃষ্টা)

তিনি ১০১ হিজরীর রজব মাসে ৪০ বছর পুর্ণ হওয়ার আগে মারা যান। দিরে সামআর যে অংশটি জিম্মির কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন সেখানে তাঁর দাফন হয়। তাঁর জানাযার ইমামতি করেন মাসলামা বিন আব্দুল মালিক।

আব্দুর রহমান বিন কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর থেকে বর্নিত আছে। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ মরন কালে এগারজন ছেলে রেখে যান। যাদের জন্য পরিত্যাক্ত সম্পদ ছিল ১৭ দিনার। পাঁচ দিনার দ্বারা কাফন দেওয়া হল, ২ দিনার দ্বারা কবরের জায়গা ক্রয় করা হল। বাকি টাকা সন্তানদের মধ্যে বন্টন করা হলে জন প্রতি ১৯ দিরহাম করে পেয়েছেন।

132

আব্দুর রহমান বলেন পরবর্তিকালে আমি উমর বিন আব্দুল আজিজের সান্তানদের একজনকে এমনও পেয়েছি আল্লাহ তাকে এমন সম্পদ দান করেছেন যে তিনি একা জিহাদের জন্য ১০০ ঘোড়া মুজাহিদ বাহিনীকে দান করেছেন। অপর দিকে হিশাম বিন আব্দুল মালিক এর এক সন্তানকে সদকা গ্রহন করতে দেখেছি।

তাহার কাফন পারানোর সময় মাসলামা বিন আব্দুল মালিক কাছে দাড়ানো ছিলেন। মাসলামা বলতে লাগলেন হে আমীরুল মুমিনীন আপনি আমাদের মধ্যে নেককার লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। আর পরবর্তি লোকের মধ্যে আপনার জন্য উত্তম আলোচনা রেখে গেলেন।

হাছান বছরী (রাহ:) যখন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনলেন তখন বললেন

مَاتَ الْيَوْمَ خَيْرُ النَّاسِ আজকের দিন সবচেয়ে শ্রেষ্ট লোকটি মারা গেলো।

মুহাম্মদ বিন মা'বদ বলেন একদিন আমি রুম সম্রাজ্যপতির কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি খুব চিন্তিত। বললাম আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন তুমি কি কোন খবর পাও নাই। আমি বললাম না। তখন তিনি বললেন সৎ লোকটি মারা গেল।

আমি বললাম কে? বললেন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ।

অতপর রূমের বাদশা বলল, আমার বিশ্বাস যদি ঈসা (আ:) পরে কোন ব্যক্তি মৃতকে জীবিত করতেন তাহলে উমর বিন আব্দুল আজিজ করতেন।

তিনি আরো বললেন যে, এ দরবেশের উপর আমি আশ্চর্যান্বিত হই না যিনি দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দরবেশ বনে গেছেন। বরং আমার আশ্চর্য লাগে ঐ ব্যক্তির প্রতি যার কদমের নিচে দুনিয়া ছিল। তারপর তা ছেড়ে দরবেশ হয়েছেন।

ইমাম মালেক (রাহ:) বর্ণনা করেন ছালেহ বিন আলী একদা শামে গমন করেন। সেখানে উমর বিন আব্দুল আজিজের কবর তালাশ করে কোন সন্ধান না পেয়ে একজন দরবেশের কাছে যান। তাঁর কাছে তিনি কবরের সন্ধান জানতে চাইলে দরবেশ বলল قَبْرَ الصَّدِيْقِ تُرِيْدُ মহা সত্যবাদীর কবর কি তালাশ করছ? এ প্রশ্ন করে দরবেশ বলল, هُوَ فِىْ تِلْكَ الْمَزْرَعَةِ তিনি ঐ ক্ষেতের মধ্যে আছেন।

ইমাম আওযায়ী বলেন আমি উমর বিন আব্দুল আজিজের জানাযায় শরীক ছিলাম। সেখান থেকে কুনসিরিন শহরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। পথিমধ্যে একজন দরবেশকে দেখলাম সে আরোহি অবস্থায় ২টি ষাড় হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে আমাকে দেখে বলল, আমি বুঝতে পারছি তুমি ঐ ব্যক্তির (উমর বিন আব্দুল আজিজের) জানাযায় শরীক হতে গিয়েছিলে।

আমি বললাম হ্যাঁ, তখন সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম তুমি তো ঐ ব্যক্তির ধর্মের অনুসারি নও। মুসলমানও নও।

রাহিব বলল আমি কাঁদার কারণ হলো ভূপৃষ্ঠে একটি নুর ছিল যা নিভে গেল।

লায়ছ বিন সাআদ থেকে বর্ণিত শামীদের একজন ব্যক্তি একদা শহিদ হল। সে প্রত্যেক শুক্রবার রাতে স্বপ্নযোগে তার বাবার সাথে সাক্ষাৎ করত। বাবা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।

একদা শুক্রবার রাতে সে তার বাবার সাক্ষাতে আসে নাই। পরের শুক্রবার রাতে যখন স্বপ্ন যোগে সাক্ষাত হল তখন বাবা বললেন গত সপ্তাহে আস নাই কেন?

ছেলে বলল সকল শহিদদের প্রতি আদেশ করা হয়েছিল উমর বিন আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর তাকে স্বগতম জানানোর। তাই গত শুক্রবার আসতে পারি নাই।

স্বপ্নে সাক্ষাৎ

আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ (রাহঃ) বলেন আমি আমার পিতাকে স্বপ্নযোগে একটি বাগানে দেখলাম। তিনি আমাকে আপেল দিলেন। আমি বললাম কোন আমল আপনি উত্তম পেয়েছেন? বললেন ইস্তেগফার। আমি এই স্বপ্নের তাবীর করলাম যে, আমার ছেলে জন্ম হবে।

মাসলামা বিন আব্দুল মালিক বলেন আমি উমর বিন আব্দুল আজিজকে স্বপ্নে দেখে বললাম, আমার মন চায় আপনার মরনের পর আপনার অবস্থা কেমন হয়েছে তা জানতে। উমর বললেন হে মাসলামা, এখন আমি মুক্ত-স্বাধিন। খোদার কছম আমি এখন আরামে আছি। আমি বললাম এখন কোথায় আছেন? বললেন জান্নাতে আদনের মধ্যে সুপথ প্রাপ্ত শাসকদের সাথে আছি।

134

হযরত আমর বিন শুরাহবীল

হযরত আমর বিন শুরাহবীল রহ.মৃত্যুর সময় বলতে ছিলেন আজ আমি মৃত্যুর প্রতি অনেক আগ্রহি। আমি নিজেকে অনেক হালকা মনে করছি। আমার উপরে কোন ঋণ নেই। আমি কোন ছেলে সন্তানও রেখে যাচ্ছি না। যারা বিপথগামী হওয়ার ভয় থাকবে। যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে তাড়াতাড়ি কবরের দিকে নিয়ে যেও।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসি আযদী (রাহঃ)

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসি আযদী (রাহঃ) সারা জীবন গুণাহের ভয়ে ভীত ছিলেন। যখন জিজ্ঞাস করা হত, অর্থাৎ তুমি সকাল কিভাবে অতিক্রম কর? তখন উত্তরে বলতেন, আমি সকাল অতিক্রম করি মৃত্যুকে নিকটবর্তি মনে করে। আকাঙ্ক্ষা আশা থেকে দুরে থাকি। নিজেকে বদআমল মনে করে।

তিনি তার মরণের সময় অধিক হারে মানুষ তাঁর সেবার জন্য আসতে দেখে খাদিমকে লক্ষ করে বললেন, اخبرنى ما يغنى عنى هؤلاء কাল কিয়ামতের দিন যখন গর্দান ও পা ধরে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তারা আমার কি কাজে আসবে? অথবা যখন আমাকে জাহান্নামে ফেলা হবে তখন তারা আমার কি উপকারে আসবে?

অতপর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَقَامِ سُوْءٍ قُمْتُهُ وَمِنْ كُلِّ مَقْعَدِ سُوْءٍ قَعَدْتُهُ وَمِنْ كُلِّ مَدْخَلِ سُوْءٍ دَخَلْتُهُ وَمِنْ كُلِّ مَخْرَجِ سُوْءٍ خَرَجْتُهُ وَمِنْ كُلِّ عَمَلِ سُوْءٍ عَمِلْتُهُ وَمِنْ كُلِّ قَوْلِ سُوْءٍ قُلْتُهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ ذَالِكَ كُلِّهِ فَاغْفِرْهُ لِىْ وَاَتُوْبُ لَكَ مِنْهُ فَتُبْ عَلَىَّ وَاَلْقِى اِلَيْكَ بِالسَّلَامِ قَبْلَ اَنْ يَّكُوْنَ لِزَامًا.

এই দুআ করা অবস্থায় তাঁর প্রাণবায়ু জান্নাতে চলে গেল।

ফুজালা বিন দীনার বর্ণনা করেন আমি মৃত্যু কালে মুহাম্মদ বিন ওয়াসি এর কাছে ছিলাম, যখন তাঁকে মৃত্যুর কাপড় পরানো হল তখনও তিনি বলতে ছিলেন,

مَرْحَبًا بِمَلَائِكَةِ رَبِّىْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

ফুজালা বলেন, সে সময় আমি এমন এক সুগন্ধ অনুভব করলাম যা কোন দিন পাইনি। (আল মুহতাজারুন)

হযম (রহ.) বলেন তাঁর শেষ কালিমা ছিল,

يَا اِخْوَتَاهُ تَدْرُوْنَ اَيْنَ يُذْهَبُ بِىْ وَاللهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَى النَّارِ اَوْ يَعْفُوَ عَنِّى

(তারীখে বুখারী, আত তারীখুস সাগীর)

আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন হানী আন নিসাপুরী

তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ) এর ছাত্র ছিলেন। মৃত্যু কালে রোজা ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলে ইসহাক কে ডেকে জিজ্ঞাস করলেন সুর্য কি ডুবে গেছে? ছেলে বলল না এখনো ডুবে যায়নি। ছেলে আরও বলল এই অবস্থায় ফরজ রোজা ছেড়ে দেওয়া জায়িজ। আর আপনি তো নফল রোজাদার।

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ এই আয়াত তেলাওয়াত করে পানি পান না করেই জান্নাতে চলে যান।

আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, বাগদাদে একমাত্র আবদাল তিনিই ছিলেন।

তিনি ২৬৫ হিজরী ৫ রবীউস সানী মাসের বুধবারে মৃত্যুবরণ করেন।

(صفة الصفوة)

হযরত মাকহুল শামী (রাহঃ)

একদা তাঁর অসুস্থতার সময় এক ব্যক্তি কাছে যেয়ে বলল, আল্লাহ আপনাকে সুস্থতা দান করুন। প্রতি উত্তরে তিনি বলিলেন এমন দুআ কখনো কর না। যে সত্তার কাছে পুর্ণ কল্যানের আশা রাখা হয় তার কাছে চলে যাওয়াই উত্তম ঐ ব্যক্তিদের কাছে থাকার চেয়ে যাদের মন্দতা থেকে নিরাপদ থাকা যায় না।

(ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা:৪৮২)

মৃত্যুকালে তিনি হাঁসতে লাগলেন। কেউ তাকে বলল এখন কি হাঁসার সময়? তিনি বলিলেন হাঁসব না কেন? যেগুলোর জন্য আমি সবসময় ভিত থাকতাম সেগুলো থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাচ্ছি এবং সেই সত্ত্বার কাছে যাওয়ার সময় এসেছে যার কাছে দ্রুত যেতে আগ্রহি ছিলাম।

(ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮৯)

হযরত আমির বিন আব্দুল্লাহ বিন কয়েস (রাহঃ)

তিনি একজন তাবিয়ি ছিলেন। তাঁর ২৪ ঘন্টার আমল ছিল যে দিনে রাতে ১০০ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, তোমাকে এরূপ আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মৃত্যু কালে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে কারণ জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বললেন আল্লাহর বাণী

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (আল্লাহ একমাত্র মুত্তাকীনদের আমল কবুল করেন) এই আয়াত স্বরন করে আমি কাঁদতেছি (কিতাবুল আকিবাহ)

তাঁকে মৃত্যুর সময় কাঁদতে দেখে অন্য আরেকজন বলল আপনি এত সাধনা করা সত্ত্বেও কাঁদতেছেন? তিনি বললেন আসলে আমি মৃত্যুর ভয়ে অথবা দুনিয়ার লোভে কাঁদতেছি না বরং আমি এ দু:খে কাদতেছি যে, আজকের গরমের দুপুর বেলা রোজা বিহীন অতিক্রান্ত হবে এবং শেষ রাতে তাহজ্জুদ মিছ হবে। (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৭৮)

আব্দুল মালিক বিন আত্তাব লাইসি (রাহঃ) বলেন, আমি আমির বিন কায়েস কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে জিজ্ঞাস করলাম কোন আমলটিকে আপনি উত্তম পেলেন। আমির বললেন যে আমলের দ্বারা আল্লাহর রাজী খুশি উদ্দেশ্য ছিল।
(কিতাবুর রূহ পৃষ্টা ৬৯)

তাঁকে জিজ্ঞাস করা হলো নামাজে আপনি কি ধ্যান করেন? তিনি বললেন আমি এই ধ্যান করে থাকি যে এখন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে দন্ডয়মান, পরবর্তি অবস্থা আমার কি হবে তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকি।

তিনি আরো বলেন আল্লাহর প্রতি যে আমার মহব্বত আছে এটাই আমার সকল মুছিবত কে সহজ করে দেয়। আমি তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট অবস্তায় সকাল-সন্ধা অতিক্রম করি।

যিয়াদ নামেরী বর্ণনা করেন আমির বিন কয়েস (রাহঃ) মরনের সময় বলতে ছিলেন

لِمِثْلِ هٰذَا الْمَصْرَعِ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ' اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ تَقْصِيْرِىْ
وَتَفْرِيْطِىْ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْ ذُنُوْبِيْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

এই বাণীগুলো মৃত্যু পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতে লাগিলেন।

ইয়াযীদ রুকাশী বলেন, তিনি মৃত্যুর সময় কেঁদে কেঁদে বলেছেন।

هٰذَاالْمَوْتُ غَايَةُ السَّاعِيْنَ وَاِنَّالِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

হুমাম বিন ইয়াহয়া থেকে বর্ণিত, আমিরকে মৃত্যুর সময় কান্নার কারণ জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বলেন এই ১টি আয়াত স্বরন করে কাঁদছি। তা হলো
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (আল মুহতাযিরুন)

হযরত আলী বিন সালেহ (রাহঃ)

আব্দুল্লাহ বিন মুসা বলেন যখন আলী বিন সালেহের ইন্তেকাল হলো তখন আমি সফরের মধ্যে ছিলাম। সফর থেকে যখন ফিরে আসলাম। তখন আমি তাঁর ভাই হাসান বিন সালেহ এর কাছে শোক জানাতে গেলাম। ওখানে যেয়ে আমার কান্না এসে গেল।

তখন হাসান বিন সালেহ বলিলেন, কান্নার পুর্বে তাঁর মৃত্যুর পদ্ধতি শুন। যখন তার সাকরাত শুরু হলো তখন তিনি আমার কাছে পানি চাইলেন। আমি পানি নিয়ে গেলে তিনি বললেন আমি তো পানি পান করে নিয়েছি। আমি বললাম কে তোমাকে পানি পান করালো? তিনি বললেন রাসুল (সাঃ) ফেরেস্তাদের এক বিরাট দল নিয়ে আমার কাছে আগমন করেছেন এবং আমাকে পানি পান করিয়েছেন। আমার ধারনা হলো হয়তো তিনি অন্যমনষ্কতার কারণে এরূপ কথা বলেছেন। তাই আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য বললাম ফেরেস্তাদের কাতারগুলো কিভাবে ছিল? তখন তিনি এক হাতকে আরেক হাতের উপরে উঠিয়ে বললেন এভাবে এক কাতারের উপর আরেক কাতার ছিল। (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৭৯)

হযরত হাবীবে আযমী (রাহঃ)

তিনি সুপ্রসিদ্ধ একজন সুফি ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গেলেন। কেউ তাঁকে বলল আপনার মত বুযুর্গ এভাবে বিচলিত হওয়া থেকে অনেক দুরে থাকার কথা।

তখন তিনি বললেন আমার সামনে দীর্ঘ সফর রয়েছে। সামান সাথে কম আবার ইতিপুর্বে রাস্তাও দেখি নাই, তদুপরি মুনিবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে হবে যাকে পুর্বে দেখি নাই। এমন ভীতিকর পরিবেশ দেখব যা পুর্বে দেখি নাই। মাটির নিচে কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে কোন বন্ধু কাছে থাকবে না। তা ছাড়া আল্লাহর সামনে দন্ডয়মান হওয়ার ভয়তো আছেই। যদি আল্লাহ আমাকে

138

জিজ্ঞাস করেন এ হাবীব তোমার ৬০ বৎসরের এমন এক তাসবীহ আমাকে দেখাও যেখানে শয়তানের কোন দখল ছিল না, তখন আমি কি জবাব দিব? (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৮)

ফাতাহ বিন সাঈদ (রাহ:)

আবু সাঈদ মুসেলী (রাহ:) বলেন ফাতাহ বিন সাঈদ ঈদুল আযহার নামাজ পড়ে কিছু বিলম্বে ঈদগাহ থেকে বাড়ি ফিরেন। প্রত্যাবর্তন কালে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন কুরবানীর গোস্ত পাকানোর ধোয়া বের হচ্ছে। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন হে আল্লাহ! লোকেরা কুরবানীর মাধ্যমে আপনার নৈকট্যতা লাভ করছে। হায়! আমি কোন জিনিসের কুরবানী করব? একথা বলে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে যান। তখন আমি পানি ছিঠিয়ে দিলাম ফলে তাঁর হুশ ফিরে আসল। তখন আবার একথা বলতে শুরু করলেন।

যখন শহরের গলিতে প্রবেশ করলেন আবার আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন হে আল্লাহ! আমার দু:খ, চিন্তা, পেরেশানী আপনার জানা। এই যে গলিতে গলিতে চক্কর দিচ্ছি তাও আপনার জানা। হে আল্লাহ আর কত দিন আমাকে এ জগতে বন্দি করে রাখবে? একথা বলে আবার বেহুশ হয়ে পড়ে যান। আমি আবার পানি ছিটালাম ফলে হুশ ফিরল। কিছুদিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন। (ফাজায়েলে সাদাকাত)

হযরত মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (রাহ:)

তিনি মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন। কেউ তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাস করল উত্তরে বললেন আমি গুণাহের জন্য কাঁদতেছি না। কারণ আমি জীবনভর কোন গুণাহ করি নাই। হ্যাঁ আমি কাঁদছি এজন্য যে, আমার পক্ষ থেকে এমন কোন কাজ প্রকাশিত হয়েছে যা আমার দৃষ্টিতে সঠিক কিন্তু আল্লাহর কাছে এটি মন্দ। অতপর কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য এমন কিছু কথা প্রকাশ করবেন যা তারা ধারনা করেনি। এ আয়াত পড়ে বললেন এটাই হচ্ছে আমার ভয়। এমন কোন কথা প্রকাশ করবেন যা আমার ধারনাতেই নেই।

(ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৭৮)

139

আবু শুআইব সালেহ বিন যিয়াদ (রাহঃ)

আমর ইবনে উবাইদ (রাহঃ) বলেন, আবু শুআইব সালেহ এর যখন মৃত্যু যন্ত্রনা শুরু হল তখন আমি তাঁকে দেখার জন্য গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন আমি কোন সুসংবাদ শুনাব? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন আমি অপরিচিত একজন ব্যক্তিকে দেখে বললাম আপনি কে? সে বলল আমি মালাকুল মাউত। আমি তাকে বললাম আমার সঙ্গে নম্র ব্যবহার কর, তখন তিনি বললেন আপনার সাথে নম্র ব্যবহার এর আদেশ করা হয়েছে।

(ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৮০)

হযরত মুহাম্মদ বিন আসলাম তুসী (রাহঃ)

আহমদ বিন কাসেম বলেন, আমার মুর্শিদ মুহাম্মদ বিন আসলাম তুসী (রাহঃ) মৃত্যুর ৪দিন পুর্বে বললেন আসো আমার সাথে। আল্লাহ তা'য়ালা আমার উপর কেমন অনুগ্রহ করেছেন এই সুসংবাদ আমি তোমাদেরকে শুনাব। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর অনুগ্রহ আমার উপর হল, যে আমার কাছে কোন রূপ্য মুদ্রা নেই যার হিসাব দিতে হবে এখন তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ কর। মৃত্যু পর্যন্ত কাউকে প্রবেশ করতে দিবে না।

তিনি আরো বললেন, এই চাদর এবং চট আর ওজুর পাত্র এবং কিতাব ছাড়া আর কোন কিছু আমার কাছে নাই। যা উত্তরাধিকারিদের মধ্যে বন্টন করা যাবে। তবে শুনো ঐ থলিতে ৩০টি রূপ্য মুদ্রা আছে এগুলো আমার একজন ছেলেকে তার এক আত্মীয় দান করেছিল। যেহেতু রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, সন্তানের সম্পদ এগুলো পিতার সম্পদ। এ হাদীসের আলোকে এ সম্পদগুলো আমার জন্য হালাল। এই টাকা দিয়েই আমার জন্য সতর ঢাকা পরিমান কাফনের কাপড় খরিদ করবে, কাফনের জন্য অবশিষ্ট কাপড় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করবে আমার ব্যবহারি চট এবং চাদর। এভাবে কাফনের তিনটি কাপড় পুর্ণ হয়ে যাবে। আর আমার এই ওজুর পাত্রটি কোন নামাজি দরিদ্র ব্যক্তিকে সদকা করে দিবে। এই ওসিয়ত করার পর ৪র্থ দিন ইন্তেকাল করলেন।

(ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টাঃ ৪৮৫)

140

হাসান বিন হাই (রাহঃ) এর ভাইয়ের ঘটনা

হাসান বিন হাই বলেন আমার ভাই আলী যেই রাত্রিতে ইন্তেকাল করলেন সে রাত্রিতে তিনি আওয়াজ করে আমার কাছে পানি চাইলেন। তখন আমি নামাজের নিয়ত বেঁধে ফেলেছিলাম। অবশেষে সালাম ফিরিয়ে তাঁর কাছে পানি নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন আমিতো পানি পান করে নিয়েছি।

আমি বললাম ঘরে আমি আর তুমি ছাড়া আরতো কেউ নেই। কে তোমাকে পানি পান করালো? তিনি বললেন এই মাত্র জিব্রাইল (আ:) এসে আমাকে পানি পান করিয়েছেন। আর জিব্রাইল বলে গেছেন তুমি আর তোমার ভাইকে আল্লাহ তার নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (জিব্রাইলের এই কথাটি কুরআনের একটি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। তা হল সুরা নিসার ৯নং রুকুর আয়াত) আয়াতের অর্থ যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে তারা আল্লাহ পাকের নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা। নবী সিদ্দীক শহীদ সালেহদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৭৯)

আবু ইয়াকুব নাহর জুরী (রাহঃ)

আবুল হাসান মাযানী বলেন, আবু ইয়াকুব (রাহঃ) এর মৃত্যু যন্ত্রণার সময় আমি তাঁকে কালিমার তালকিন দিচ্ছিলাম। তখন তিনি আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন তুমি আমাকে কালিমার তালকিন করাচ্ছ? ঐ সত্ত্বার শপথ যার কখনো মৃত্যু আসবে না আমার আর ঐ সত্ত্বার মাঝখানে শুধু মাত্র বড়ত্ত্বতা ও সম্মানের পর্দা বাকি আছে। এ কথা বলে তাঁর রূহ বের হয়ে যায়।

মুযানী (রাহঃ) নিজের দাড়ি ধরে বলতেন আমার মত একজন নাপিত একজন ওলীকে তালকিন করানো কতইনা লজ্জার কথা। তিনি যখনই ঐ ঘটনার কথা স্বরণ করতেন, তখন কাঁদতেন। (ফাজায়েলে আমল পৃষ্টা ৪৮৩)

হযরত আবু আলী রুদবারী (রাহঃ)

আবু আলীর বোন ফাতিমা বলেন, আমার ভাইয়ের মৃত্যুর সময় তার মাথা আমার কুলে ছিল। তিনি চোখ খুলে বলতে লাগলেন আসমানের দরওয়াজা খুলে দেওয়া হয়েছে আর জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। আর একজন ঘোষক বলতেছেন আমরা তোমাকে এমন এক স্থানে পৌঁছিয়ে দিব যার কল্পনা

141

তোমার অন্তর কখনো করেনি। যদিও তুমি এত উচুস্থানের আকাঙ্ক্ষা কর নাই তথাপি আমরা তোমাকে এমন সুউচ্চস্থানে পৌঁছিয়ে দিব। যেখানের হুররা তোমার সাক্ষাতের আগ্রহি তোমার জন্য উৎসর্গ।
অতপর তিনি দুটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যার অর্থ হলো: তোমার সত্যতার শপথ আমি আমার মহব্বতের চক্ষুকে তুমি ছাড়া অন্য কারো দিকে উঠাই নাই। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাকে নিজের অসুস্থ চক্ষু দ্বারা অস্থির করে দিয়েছ। আর ঐ সকল গন্ডদেশ দ্বারা যা লজ্জার কারনে লাল হয়ে গেছে। এই কবিতা পাঠ করতে করতে ইন্তেকাল করেন।
তিনি বলতেন হে প্রভু আমি জান্নাত ও তার নিয়ামত চাই না বরং চাই তোমার সত্ত্বাকে। (কিতাবুল আকিবাহ)

হযরত আবু বকর বিন হাবিব (রাহ:)

ইবনুল জাওযী বলেন. আমার উস্তাদ আবু বকর বিন হাবিবের মরনের সময় ঘনিয়ে এলে ছাত্ররা বলল আমাদেরকে কিছু ওসিয়ত করেন। তখন তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয়ের ওসিয়ত করলেন।
(১) আল্লাহকে ভয় কর। (২) একাকি তার মোরাকাবাহ কর। (৩) মৃত্যুর ভয় অন্তরে রাখা। আমার একষট্টি বছর চলে গেল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমি দুনিয়া দেখি নাই। (খুব দ্রুত ঐ সময়টুক চলে গেছে)
অতপর পাশে বসা এক ব্যক্তিকে বললেন দেখ আমার কপাল ঘর্মাক্ত কিনা? সে বলল হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন এটা মৃত্যু ঈমানের সাথে হওয়ার নিদর্শন। (যেমনটা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে) অতপর তিনি ইন্তেকাল করেন। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮১)

হযরত রাবি বিন খাসয়াম (রাহ:)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) রাবি বিন খাসয়ামকে সম্বোধন করে বললেন
لَوْ رَآكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَحَبَّكَ রাসুল তোমাকে দেখলে খুশি হতেন।
তাঁর মৃত্যু ৬৪ হিজরীতে হয়।

তিনি রাতে ঘুমাতেন না। সারারাত জেগে ইবাদত করা তাঁর অভ্যাস ছিল। তাঁর একজন ছাত্র বলেন একদা তিনি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) এর সাথে ফুরাত নদীর কিনারা দিয়ে হাটতেছেন। একটি অগ্নিকুন্ডের কাছ দিয়ে গমন কালে আমার উস্তাদ রাবি বিন খাছয়াম আগুন দেখে কেপে উঠলেন। আর এ আয়াত তেলায়াত করলেন।

اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا، وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا

এ আয়াত পড়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। সাথে সাথে আমরা তাকে ঘরে নিয়ে আসলাম। তারপর থেকেই সারা জীবন মৃত্যুর প্রস্তুতি ও অপেক্ষায় রইলেন।

তাঁর মরণকালে কিছু লোক বলল আমরা আপনার জন্য ডাক্তার নিয়ে আসব না? এই প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুক্ষন নিরব রইলেন। অতপর বললেন কোথায় আদ-ছামুদ জাতি? কোথায় আসহাবে রাস ও মর্ধবর্তি অন্যান্য জাতি? আল্লাহ সবার জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। অনেক ভাবে তাদের বুঝানো হয়েছে কিন্তু তারা মানে নাই। অথচ তাদের মধ্যে চিকিৎসক ছিল অনেক। কিন্তু ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচতে পারে নাই।

অতপর তিনি বললেন আল্লহর শপথ! আমি কখনও নিজের জন্য ডাক্তারকে আহবান করব না। (মিনহাজুল কাসিদিন)

যখন তাঁর ইন্তেকাল হচ্ছিল তখন তাঁর মেয়ে কাঁদছিলেন। তিনি মেয়েকে সম্বোধন করে বললেন, হে মেয়ে কাঁদারতো কথা নয়, বরং এটা বল আজকের দিন কত খুশির যে অমার পিতা আজ কতকিছু পেয়েছেন। (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্টা ৪৭৯)

তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলে কাঁদতে শুরু করলেন। তখন তিনি বললেন হে আমার প্রিয় সন্তান قَدْ اَقْبَلَ عَلٰى اَبِيْكَ الْخَيْرُ একথা বলতেই রূহ আল্লাহর হাতে সোপর্দ হলো। (তাহযীবুত তাহযীব, হিলয়াতুল আউলিয়া, সিফাতুস সাফওয়া)

হরম বিন হাইয়ান আজদী আবদী (রাহ:)

হরম বিন হাইয়ান (রাহ:) এর মৃত্যুকালে তাকে ওসিয়ত করতে বলা হলো, তিনি বললেন আমি জানিনা কি ওসিয়ত করব? তবে আমার এই লৌহবর্ম বিক্রি করে আমার ঋণ আদায় করবে। যদি এর দ্বারা ঋণ পরিশোধ না হয় তাহলে ঘোড়া বিক্রি করবে। তারপরও যদি না হয় তাহলে গোলাম বিক্রি করবে।

143

অতপর বললেন আমি তোমাদেরকে সুরা নাহলের শেষ আয়াতের ওসিয়ত করছি।

أُدْعُ اِلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ' اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ' وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِه' وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ.

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসুল বলেছিলেন ধৈর্য্য ধারণ করব।

হাছান বসরী বলেন, যখন উনার ইন্তিকাল হলো আমরা দাফন করে কবরের কাছে থাকা অবস্থায় হঠাৎ এক খন্ড মেঘ এসে প্রবল বর্ষণ করল। আর ঐ দিনই এখানে তৃণলতা উৎপন্ন হয়ে গেল। (সিফাতুত সাফওয়াহ)

হযরত কাজি ইয়াছ বিন মুআবিয়া (রাহ)

তিনি বসরার বিচারক ছিলেন। আবু শাওযব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন

كَانَ يُقَالُ فِىْ كُلِّ مِأَةِ سَنَةٍ يُوْلَدُ رَجُلٌ تَامُّ الْعَقْلِ' فَكَانُوْ يَرَوْنَ اَنَّ اِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ مِنْهُمْ

প্রত্যেক শত বছর পুর্ণ হওয়ার পর একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহন করেন। সকলের এক্যমত যে, ইয়াস বিন মুআবিয়াহ ঐ সময়ের মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। (আল-জারহ ওয়াত তা'দীল)

ইয়াস বিন মুআবিয়া তাঁর ৭৬ বছর বয়সে একদিন স্বপ্নে দেখেন তিনি নিজে একটি ঘোড়ায় আরোহন করেছেন। আর তার পিতা অন্য একটি ঘোড়ায় আরোহন করেছেন। আর উভয়ে ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা করছেন। কিন্তু কারো ঘোড়া একটা থেকে অন্যটা সামনে অগ্রসর হচ্ছে না পিছু ও হটছে না। তাঁর পিতার মৃত্যু ৭৬ বছর বয়সে হয়েছিল। একরাতে ইয়াস নিজ বিছানায় শুয়ে পরিবারের লোকদেরকে বললেন জান কি আজ কোন রাত? তারা বলল না তিনি বললেন এই রাতে আমার আব্বা তাঁর ৭৬ বছর পুর্ণ করে বিদায় হয়েছিলেন। আজ রাতে আমার ৭৬ বছর পুর্ণ হয়েছে। তাই আজ রাত আমি মরে যাব। দেখা গেল ঐ রাতেই তিনি মারা যান।

رحم الله اياسا فقد كان نادرة من نوادر الزمان' واعجوبة من اعاجيب الدهرفى الفطنة والذكاء والبحث عن الحق والوصول اليه

(وفيات الاعيان)

144

সালামা বিন দিনার (রাহ:)

তাঁর মরণের সময় সাথিবৃন্দ ও খাদেমরা তাঁকে বলল নিজেকে কেমন অনুভব করছেন। তখন তিনি কুরআনের আয়াত পড়লেন
اِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا মৃত্যু পর্যন্ত এই আয়াত বারবার পড়লেন।
(তাবকাতে খলীফা, তারীখে বুখারী, আল-জরাহ ওয়াত তা'দীল)

হযরত তাউস বিন কায়ছান (রাহ:)

তাঁকে মুজাহিদ (রাহ:) বললেন আমি আপনাকে স্বপ্নযোগে কাবা শরীফে নামাজ পড়তে দেখেছি। এমতাবস্থায় রাসুল (সা:) কাবার দরজায় দাড়িয়ে তোমাকে বলছেন, اِكْشِفْ قِنَاعَكَ وَبَيِّنْ قِرَاءَتَكَ يَا طَاوُوْسُ
আব্দুল মুনঈম বিন ইদ্রিস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। ওহাব বিন মুনাব্বিহ এবং তাউস ইয়ামানী একাধারে চল্লিশ বছর এশার ওজু দ্বারা ফজরের নামাজ পড়েন।
আহমদ বিন আবিল হাওয়ারী বলেন, সুলায়মান বলেছেন আমি তাউসকে বিছানায় পার্শ বদল করে নামাজে দাড়াতে দেখেছি। আর একথা বলতে শুনেছি طَيَّرَ ذِكْرُ جَهَنَّمَ نَوْمَ الْعَابِدِيْنَ জাহান্নামের স্বরণ ইবাদতকারিদের ঘুম উড়িয়ে দেয়।
তিনি ১০৬ হিজরীর ১০ জিলহজ্ব ৪০তম হজ্ব করতে মুজদালিফায় যান। সেখানে এশা ও মাগরিব এক সাথে পড়ে জমিনে চিরকালের জন্য শুয়ে পড়েন।
(আত-তাবকাতুল কুবরা, তারীখে কবীর, আল-জরাহ ওয়াত তা'দীল)

কাছিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দীক (রাহ:)

তিনি সাত কারীদের একজন। প্রথম স্তরের তাবিয়ী ছিলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন
لَوْ كَانَ لِىْ مِنَ الْاَمْرِ شَىْئٌ لَوَلَّيْتُ الْقَاسِمَ الْخِلَافَةَ. খেলাফতের বিষয় আমার ইচ্ছাধিন হলে কাছিমকে খলিফা বানাতাম।
৭২ বছর থেকে কিছু বেশি বয়স যখন হলো তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। তথাপি হজ্বের সফরে বিরতি দেন নাই। পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে যখন বুঝলেন যে তাঁর মরণ নিকটবর্তি হয়েছে তখন নিজের সন্তানকে সম্বোধন করে বললেন যে কাপড়গুলো দ্বারা আমি নামাজ পড়তাম ঐ গুলো দ্বারা আমার কাফন দিও। ইহা ছিল তোমাদের সম্মানি দাদা আবু বকর (রা:) এর কাফন। অতপর বললেন আমাকে কবর দিয়ে বাড়িতে চলে যাবো। এখানে দাড়িয়ে كَانَ كَذَا وَكَذَا তিনি এমন ছিলেন, এরকম বলবে না । কারণ আমি কিছুই ছিলাম না। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ছিফাতুস সাফওয়াহ, তাবকাতে কুবরা।)

রাফি বিন মেহরান (রাহ:)

তাঁর নাম ছিল আবুল আলিয়া রাফি বিন মেহরান আর রায়াহী। রাসুল (সা:) এর মৃত্যুর দু'বছর পর মুসলমান হন। তিনি ৯৩ হিজরীর শাওয়ালে মারা যান। কোন এক অসুস্থতায় তাঁর পা কাটার প্রয়োজন হয়। ডাক্তার অস্ত্র পাতি নিয়ে এসে বলল আপনাকে আমি ঔষধ পান করিয়ে অবশ করব। ফলে পা কাটা অনুভব করবেন না। তিনি বললেন এর থেকে উত্তম পদ্ধতি আমার জানা আছে।

ডাক্তার বলল সেটা কী? তিনি বললেন একজন ভালো কারীকে নিয়ে আস। যে আমার সামনে কুরআন তেলাওয়াত করবে। যখন দেখবে আমার চেহারা লাল হয়ে গেছে, চোখ আসমানের দিকে উঠে গেছে তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই করবে। ডাক্তার অনুরূপ করে, আর অপারেশন করল। তিনির কোন কষ্ট অনুভুত হল না।

ডাক্তার তাঁকে প্রশ্ন করল কোন কষ্ট অনুভব করেন নাই? তিনি বললেন

لَقَدْ شَغَلَنِىْ بَرْدُ حُبِّ اللهِ وَحَلَاوَةُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَنْ حَرَارَةِ الْمَنَاشِيْرِ

অতপর কাটা পা নিজের হাতে নিয়ে বললেন

اِذَا لَقِيْتُ رَبِّىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَأَلَنِىْ هَلْ مَشَيْتُ بِكَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اِلى مُحَرَّمٍ
اَوْمَسَسْتُ بِكَ غَيْرَمُبَاحٍ لَاَقُوْلَنَّ لَا.

কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাস করেন তোমাকে নিয়ে আমি ৪০ বছর কোন হারাম কাজের দিকে গেছি কিনা? তাহলে আমি বলব না।

وَاَنَا صَادِقٌ فِىْ مَا اَقُوْلُ اِنْ شَاءَ اللهُ.

প্রত্যেক মাসে নিজের কাফন বের করে পরিধান করে আবার স্বস্থানে রেখে দেওয়া এটা তাঁর সর্বদা আমল ছিল। সতের বার ওসিয়ত লেখিয়েছেন।

প্রত্যেকবার তাতে সংশোধন করতেন। ৯৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

(সিয়ারে আলামুল নুবালা, তাবকাতে কুবরা, তাহযীবুত তাহযীব/আল-মাআরিফ ইবনে কুতায়বা)

আবু জুরআ রাযী (রাহ:)

اَبُوْ زُرْعَةَ الرَّازِىُّ كَانَ اِمَامًا حَافِظًا مُتْقِنًا ثِقَةً عَالِمًا بِالْحَدِيْثِ عَارِفًا بِالْمَشَايِخِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ

২০০ হিজরীতে জন্ম হয়। এবং ২৬৪ হিজরীতে রায় নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি বলতেন আমার এক লক্ষ হাদিস এমনভাবে মুখস্ত যেমনভাবে সুরায়ে এখলাছ জবানে মুখস্ত থাকে। আবু বকর মুহাম্মদ বিন উমর রাযী বলেন আবু যুরআ থেকে বড় হাফেজ এই উম্মতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁর সাত লক্ষ হাদিছ মুখস্ত ছিল। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার হাদিছ তাফসীর ও কেরাত অধ্যায়ের মুখস্ত ছিল। আবু হানীফা রহ.এর সকল কিতাব চল্লিশ দিনে পড়ে নিয়েছেন। فَكَانَ يَسْرُدُهَا مِثْلَ الْمَاءِ পানি যেভাবে দ্রুত প্রবাহিত হয় এভাবেই তিনি কিতাব গুলো দ্রুতপড়ে শুনাতেন।

জাফর তাসতারী বলেন আমি মা-শহরান নামক স্থানে আবু জুরআর কাছে গেলাম এমতাবস্থায় তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা চলছিল। পাশে আলেম উলামাদের এক বড় জামাত ছিল। তারা একে অপরকে তালকীনের হাদিছের দিকে ইঙ্গিত করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য হলো আবু জুরআকে কালিমার তালকীন দেওয়া। কিন্তু তাঁর মতো ব্যক্তিকে তালকীন দেওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করছেন। এক পর্যায়ে উলামায়ে কেরাম বললেন

تَعَالَوْا نَذْكُرِ الْحَدِيْثَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اَلضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ صَالِحٍ

এই পর্যন্ত পৌঁছে আর বলতে পারেন নাই। জবান আটকে গেল।

অতপর আবু হাতেম পড়া শুরু করলেন

حَدَّثَنَا بُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ صَالِح

এতটুকু বলেই আবু জুরআর জ্ঞানের ভয়ে তিনিও আগ বাড়তে পারলেন না। থেমে গেলেন।

147

অতপর মৃত্যুর যন্ত্রণা অবস্থায় আবু জুরআ রাযি বাকি অংশ নিজেই পড়তে শুরু করলেন।

حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِىْ غَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّااللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

এই হাদীস পড়া শেষ হতে না হতেই তিনি মারা যান।

আহমদ মুরাদী তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন আল্লাহ কেমন আচরণ করেছেন? উত্তরে আবু জুরআ বললেন, আল্লাহর সাথে যখন আমার সাক্ষাত হলো তখন আল্লাহ বললেন হে আবু জুরআ, কোন ছোট বাচ্চা আমার কাছে নিয়ে আসা হলে আমি তাকে জান্নাতে গমনের হুকুম দিয়ে থাকি। এবার বল ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কি হুকুম করব যে আমার বান্দাদের কাছে হাদিছ সংরক্ষণ করে পৌঁছিয়েছে? অতএব তুমি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাক।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ বলেছেন উবায়দুল্লাহকে তিনজন আবী আব্দুল্লাহর কাছে পৌঁছে দাও। আবু আব্দুল্লাহ হলেন আবু আব্দুল্লাহ সুফিয়ান সাওরী, আবু আবদুল্লাহ মালেক ইবনে আনাছ, আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল।

(তাহযীবুল কামাল)

আবুল হুসাইন বিন আল মুনাদী বলেন আবু জুরআ সোমবারে মারা যান। মঙ্গলবারে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যু ২৬৪ হিজরীর জিলহজ্ব মাসে হয়। জন্ম হয় ২০০ হিজরীতে।

হযরত ইউসুফ বিন হুসাইন (রাহ:)

আবু আবদিল খালিক বলেন ইউসুফ বিন হুসাইনের মৃত্যুর যন্ত্রণা অবস্থায় আমি পাশে ছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম তিনি দোয়া করছেন হে আল্লাহ আমি প্রকাশ্যে মানুষকে নসিহত করি আর গোপনে নিজের অন্তরকে দোষি সাব্যস্ত করি। হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও। এই কথা বলা অবস্থায় প্রাণ পাখি চলে যায়। (ফাজায়েলে সাদাকাত পৃষ্ঠা ৪৮৫)

কেহ তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে তাঁকে দেখে বললেন আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে? তিনি বললেন আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। ঐ ব্যক্তি বলল কোন

কারণে মাফ করা হয়েছে? তিনি বললেন আমি ভালো কথার সাথে অনর্থক কথা মিশ্রণ করি নাই।
(জহিরুল আসফিয়া, উর্দূ তরজমা তাযকিরাতুল আউলিয়া ৩০৪)

শায়খ যুন নূন (রাহঃ)

২০৫ হিজরীর ২২ শাবান তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় নিকটবর্তি হলে পরে একজন তাঁকে বলল এখন আপনি কি চান? তিনি বললেন মরার এক মুহুর্ত আগে যেন তাঁকে পরিচয় করি।
(এহইয়াউল উলূম পৃষ্ঠা ৬৭৯ খন্ড ৪)

আবু জাফর আ'ওয়ার (রাহঃ) বলেন আমি শায়খ যুন নূন এর কাছে উপস্থিত হলাম তখন তাঁর কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তারা জড় পদার্থের অনুগত্যের কথা আলোচনা করছিলেন। সেখানে একটি কাষ্ঠখন্ড ছিল।
শায়খ জিন নুন বলেন জড় পদার্থ ওলীদের অনুগত্য করে। যদি আমি ঐ কাষ্ঠখন্ডকে বলি এই ঘরের চতুর্দিকে চক্কর দাও তাহলে সে চলবে।
একথা বলতে না বলতেই দেখা গেল ঐ কাষ্ঠটুকরাটি চতুর্দিকে ঘুরে স্বস্থানে এসে উপস্থিত হল। যখন তিনি এ অবস্থা দেখলেন তখন কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ দিয়ে দিলেন। এবং ঐ কাট খন্ডের উপর তাঁকে গোসল দেওয়া হল। (জহিরুল আসফিয়অ ১১৮)
মৃত্যুকালে কোন এক ব্যক্তি তাঁকে ওসিয়ত করার জন্য আবদার করল। তিনি বললেন আমি আল্লাহ মায়া-মমতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। এখন অন্য কাজে আমাকে ব্যস্ত কর না। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮৩)
বর্ণিত আছে, যে দিন তাঁর মৃত্যু হয় ঐ দিন সাতজন ব্যক্তি রাসুল (সা:) কে স্বপ্নে দেখলেন। রাসুল (সা:) বলছেন আল্লাহর বন্ধু যুন নূন মিসরি আসছেন। আমি তাঁর অভ্যার্থনার জন্য এসেছি।
যখন তার জানাযা নিয়ে রওয়ানা করা হলো তখন দেখা গেল অনেক পাখি তাদের ডানা দ্বারা ছায়ার ন্যায় বেষ্টন করে নিয়েছে। এমন পাখি কেউ কখন দেখেন নাই। তাঁর সাথে সম্পর্ক রেখেছে এমন শত শত ব্যক্তি তাঁর কাছে তওবা করে মন্দ কাজ ছেড়ে দিয়েছে।
(ছাফিনাতুল আউলিয়া ১৬৭ পৃষ্ঠা)

149

শায়খ বিশরে হাফি (রাহ)

তিনি ২২৭ হিজরীর ১০ মুহার্‌রাম বুধবার ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার বাগদাদের বাহিরে একটি এলাকায় রয়েছে।

আব্বাস বিন দাহকান বলেন, বিশরে হাফি এমন এক ব্যক্তি তিনি যে অবস্থায় দুনিয়াতে এসেছেন অর্থাৎ খালি হাতে কাপড় বিহীন সে অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। মৃত্যুকালে এক ব্যক্তি এসে তার প্রয়োজনের কথা শুনাল। তিনি তাঁর যে কাপড় ছিল তা খুলে তাকে দান করলেন। আর নিজে অন্যজনের কাছ থেকে চেয়ে কিছু সময়ের জন্য কাপড় পরিধান করেন। আর এ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হন । (ফাজায়েলে সাদাকাত)

এত তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় তিনি ভিত সম্ভ্রস্ত হয়ে যান। কেহ তাঁকে লক্ষ্য করে বলল মৃত্যুকালে আপনার এত ভিতু হওয়া দ্বারা বুঝা যায় দুনিয়ার প্রতি আপনার আসক্ততা বেশি ছিল? বিশরে হাফি (রাহঃ) বললেন আসলে বিষয় এটা নয়। বরং আল্লাহর কাছে যাওয়াটা বড় কঠিন বিষয় (এজন্য আমি ভিত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি)। (কিতাবুল আকিবা)

তাঁর মৃত্যুর পর ঘর থেকে জ্বিনদের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনা গিয়েছিল। মৃত্যুর পর তাকে একজন স্বপ্নে দেখে বলল আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন আপনার সাথে? তিনি বললেন আমাকে ও আমার জানাযায় যারা শরীক হয়েছে সবাইকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তারাও ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে। (ছাফিনাতুল আউলিয়া ১৬২)

অপর এক ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে দেখে বলল আল্লাহ তায়ালা কেমন আচরন করেছেন? বিশরে হাফি রহঃ বললেন আমাকে ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেছেন দুনিয়াতে এত ভয় কেন করেছ? তুমি কি জাননা করুণা আমার গুণ।

আরেক ব্যক্তি এভাবে স্বপ্নে তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন খোদা তায়ালা কেমন আচরন করেছেন? বিশরে হাফি বললেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছেন হে ঐ ব্যক্তি যে আমার কারণে তৃপ্ত হয়ে খাও নাই, পান কর নাই, এবার তৃপ্ত হয়ে খাও পান কর।

অন্য এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলেন আল্‌রাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এবং অর্ধেক জান্নাত আমার জন্য বৈধ করে দিয়েছেন এবং বললেন হে বিশর আমি

মানুষের অন্তরে তোমার জায়গা করে দিয়েছি যদি তুমি আগুনের মধ্যেও সেজদা করতে তবুও এর শুকর আদায় হত না।

অন্য এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে এরূপ প্রশ্ন করলেন, বিশর বললেন আমার মরণের পর আওয়াজ আসল স্বাগতম হে বিশর, তোমার মরণ কালে ভূপৃষ্ঠে আমার আর কোন বন্ধু ছিল না।

(জহিরুল আসফিয়া ও তাজকিরাতুল আউলিয়া উর্দু তরজমা ১১২)

আসিম জাযরী (রাহ) বলেন আমি স্বপ্নযোগে বিশরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁকে বললাম আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বিশর বললেন জান্নাত থেকে। আমি বললাম আহমদ বিন হাম্বল কোথায় আছেন? তিনি বললেন এই মাত্র তাঁকে আব্দুল ওয়াহহাব ওয়াররাক এর সাথে আল্লাহর কাছে রেখে এসেছি। উভয়জন সেখানে খানা পিনা করতেছেন। আসিম বললেন তাহলে আপনার কি খাবারের প্রয়োজন নাই? বিশর বললেন আল্লাহর জানা আছে খাবারের প্রতি আমার অতিরিক্ত আগ্রহ নেই তাই আল্লাহ আমার জন্য তাঁর দর্শন বৈধ করে দিয়েছেন।

আবু জাফর সিকা (রাহঃ) অনুরূপ বিশরে হাফির সাথে স্বপ্নে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাস করলেন আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? বিশর বললেন আল্লাহ আমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। আর বলেছেন হে বিশর তুমি যদি আমার জন্য আগুনের অঙ্গারের মধ্যে সিজদা করতে তাহলেও তোমার প্রতি মানুষের অন্তরে যে, মহব্বত সৃষ্ঠি করে দিয়েছিলাম তার কৃতজ্ঞতা আদায় হত না।

আল্লাহ তায়ালা অর্ধেক জান্নাত আমার জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। আমি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে আরামের সাথে খানা পিনা করতে পারি। আমার জানাযায় যারা শরীক হয়েছেন সবাইকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন।

আবু জাফর বললেন আবু নছর তাম্মার এর অবস্থা কি? বিশর বললেন তাঁর ধৈর্য্যশীলতার কারণে সকল লোকের উপরের স্থান লাভ করেছেন।

আব্দুল হক (রাহঃ) বলেন অর্ধেক জান্নাত দ্বারা সম্ভবত জান্নাতের অর্ধ নিয়ামত উদ্দেশ্য। কারণ জান্নাতের নিয়ামত দুই প্রকার অর্ধেক হলো শারিরিক। বাকি অর্ধেক হলো আত্মিক। আলমে বরযখে আত্মিক নেয়ামত আস্বাদন করা হয়। কিয়ামতের পর যখন রূহ সমূহ শরিরে প্রবেশ করবে তখন রূহানী নিয়ামতের সাথে শারিরিক নিয়ামতও বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।

কেহ কেহ বলেন জান্নাতের নেয়ামতের ইলম আমল অনুপাতে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বিশরে হাফির ইলমী নেয়ামতের চাইতে আমলী নেয়ামতের অংশ বেশি (তাই বলেছেন অর্ধেক জান্নাত) (কিতাবুর রূহ ইবনুল কায়্যিম ৭৩/৭৪)

শায়খ নজমুদ্দীন কুবরা (রাহঃ)

তিনি ৬১৮ হিজরীর ১০ জুমাদাল উলাতে শাহদাতবরণ করেন। হালাকু খাঁ যখন খারিযমে পৌঁছে তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট থেকে কিছু বেশি।

একদা শায়খ নাজমুদ্দীন (রাহঃ) তাঁর সাথিবর্গ সাদ উদ্দীন হামবী, রাজী উদ্দীন আলী (রাহ) সহ অন্যান্যদেরকে ডেকে বললেন আগামিকাল ভোর বেলা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে চলে যাও। কারণ উদয়স্থল থেকে একটি আগুন বের হয়ে অস্তস্থল পর্যন্ত সবাইকে জ্বালিয়ে দিবে। এটি নির্ধারিত বিপদ যার প্রতিহতের কোন পথ নেই।

যখন কাফেরদের সৈন্যবাহিনি এসে পৌঁছল তখন তিনি হাতে বর্ষা নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। শত্রুকে হত্যা করতে করতে এক পর্যায়ে নিজেই শাহদাতের অমিয় সুধা পানি পান করেন।

বর্ণিত আছে শাহদতের সময় এক কাফির তাতারির ঢাল তাঁর হাত মোবারকে এসে যায়। কারো ক্ষমতা হল না তাঁর হাত থেকে ঢালকে ছিনিয়ে নিতে। অবশেষে কেটে পৃথক করা হলো। (খাজিনাতুল আসফিয়া ২০৯ ও সাফিনাতুল আউলিয়া ১৪১)

হযরত আওরঙ্গজেব আলমগিরী (রাহঃ)

১১১৮হিজরী পুর্ণ হওয়ার দুমাস বাকি থাকতে বাদশাহ আলমগীর (রাহ) এর শারিরিক অবস্থার খুবই অবনতি হলো। শরীয়তের হুকুমের প্রতি তার গুরুত্ত্ব এমন ভাবে স্বভাবে পরিনত হয়েছিল যে অধিক অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ৫ ওয়াক্তের নামাজ জামাতে আদায় করতে থাকেন। যখন অসুস্থতা ভয়ংকর রূপ ধারন করল তখন একনিষ্ঠ সহযোগি হামিদ উদ্দিন খাঁন আবেদন করলেন যদি অনুমতি দেন তাহলে একটি হাতি আর অত্যন্ত মুল্যবান হিরার টুকরা ছদকা করে দেই।

বাদশাহ বললেন হাতি সদকা করা হিন্দু ও নক্ষত্র পুজারীদের রীতি। সুতরাং এটা না করে প্রধান বিচারপতি বরাবর ৪ হাজার দিনার রূপ্যমুদ্রা পাঠিয়ে দাও

152

তিনি যেন হকদার দের মধ্যে তা বন্টন করেন। সাথে একথাও লিখে দিলেন আমাকে যেন মৃত্যুও পরে মাটির কাছে সোপর্দ করা হয়। সিন্ধুকে যেন রাখা না হয়।

বাদশাহ আলমগীর একটি দীর্ঘ ওসিয়ত নামা তৈয়ার করলেন যাতে দাফন কাফন সম্পর্কে ছোট একটি ওসিয়ত ছিল। তাহল টুপি সেলাই করে যে টাকা উপার্জন করছেন তা বেগম সাহেবার কাছে আছে। এগুলো দ্বারা কাফন দাফনের ব্যবস্থা করবে। কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ করা বাবত পারিশ্রমিক তিনশত পাঁচ রূপি সংরক্ষিত আছে। মরণের দিন এগুলো মিসকিনদের মধ্যে বন্ঠন করবে। যেহেতু শিয়া পন্থিদের মতে কুরআন লিপিবদ্ধ বাবত উপার্জন হারাম তাই এগুলো কাফনের খাতে ব্যয় করার আদেশ দেন নাই।

১১১৮ হিজরীর ২৮ জিলকদ জুমআর দিন ফজরের জামাতের পর কালিমার যিকির শুরু করেন। দিনের প্রথম প্রহর যেতে না যেতেই বিদায় নেন। মরণকালে বয়স ছিল ৯০ বছর ১৩ দিন।

খাজা মুহাম্মদ মাছুম (রাহঃ)

১০৭৯ হিজরীর রবীউল আওয়ালের চাঁদ উদয় হলে তিনি বললেন এই রবীউল আওয়াল মাসে হেদায়াতের আলো রহমতের নবীর খেদমতে হাজির হতে আমার মন চাচ্ছে। কিছু দিন যেতে না যেতেই অসুস্থতা তাঁকে পাকড়াও করল। তাঁর বিনয়, নম্রতা, নিজেকে তুচ্ছ মনে করার অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর আশপাশের সকল বুজুর্গের কাছে লিখে পাঠালেন, ফকীর মোহাম্মদ মাছুম দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। আপনারা কল্যানের দোয়া করবেন।

সায়্যিদ মির্জা নামক এক বুজুর্গ জবাবে দুটি কবিতা লিখে পাঠালেন, যার তর্জমা হল প্রত্যেক বৃদ্ধ ব্যক্তির এই পয়গাম আসে যে, হে বৃদ্ধ, নিশ্চিত জেনে রাখ উভয় জগতের বাঘ শিকারি এই রাস্তায় পিপিলিকার সাথে বন্দুত্বতা লাগানোর চেষ্টা করে।

১০৬৯ হিজরীর ৮ রবীউল আওয়ালে জুমআর দিন নামাজ আদায়ের জন্য জামে মসজিদে গমন করেন। নামাজের প্রতি অধিক আসক্ততা তাঁকে মসজিদে নিয়ে গেছে। নতুবা যাওয়ার কোন শক্তি ছিল না। মসজিদে থাকাকালেই তিনি

অনুধাবন করে নিয়েছিলেন তিনি আর বাঁচবেন না। তাই বললেন আগামিকাল এই সময় দুনিয়াতে থাকার ভরসা নাই।
৯ রবীউল আওয়ালের সুর্য উদয় হল। ফজরের নামাজ প্রশান্ত চিত্তে আদায় করে জায়নামাযে মুরাকাবাতে মাশগুল হয়ে গেলেন। মুরাকাবা থেকে অবসর হয়ে ইশরাকের নামাজ পড়ে বিছানায় আসলেন। শ্বাস প্রশ্বাশ বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু জিহ্বা নড়তে থাকল। কান লাগিয়ে শুনা গেল সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করছেন। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী ২৭৫)

খাজা খুর্‌দ (রাহঃ)

তিনি জীবনভর শিক্ষা-দীক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত মুজাদ্দিদ (রাহঃ) এর সোহবতে থেকে খেলাফত লাভ করেন। কয়েকটি কিতাবের হাশিয়াও তিনি লিখেন। তাঁর বড় ভাই মারা যাবার প্রায় এক বছর পর ১০৭৫ হিজরীর জুমাদাল উখরার ৫ তারিখে মারা যান।
শাহ ওলী উল্লাহ (রাহ) এর পিতা শাহ আব্দুর রহিম (রাহ) বলেন কুশক-নর মহল্লার একজন ব্যক্তি খাজা খুরদ (রাহঃ) এর কাছে আবেদন করল আপনি একটু তাওয়াজ্জুহ দিন যাতে দ্রুত ইলম অর্জন থেকে ফারিগ হতে পারি। খাজা (রাহঃ) বললেন আমি পরে জবাব দিব।
বাড়িতে তিনি ফিরে এসে একটি জবাব নামা পাঠালেন। যাতে লেখা ছিল আগামিকাল জ্ঞান অর্জন থেকে ফারিগ হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ। এই সু সংবাদ শুনে লোকটি আশ্চর্য হলো। ২য় দিন সকাল বেলা বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই প্রাণ মালিকের কাছে হস্তান্তর করেন। (আনফাছুল আরিফিন ৬১/৬২)
শাহ আব্দুর রহিম (রাহঃ) বলেন খাজা খুরদ (রাহঃ) শেষ বয়সে আমাকে বললেন সন্তান হওয়ার সম্পর্কের দিকে লক্ষ করে আমাকে খাজা বাকী বিল্লাহ (রাহঃ) এর কবর বরাবর দাফন করবেন না। বরং যেখানে জুতা খুলা হয় সেখানে দাফন করবেন কারণ আমি এর উপযুক্ত। আমি বললাম দাফনের কাজতো আপনার ওয়ারিছরা করবে আমাকে বলে তো কোন ফায়দা হবে না। তিনি বললেন আপনি তাদের শুনিয়ে দিবেন।
হযরত শাহ সাহেব (রাহঃ) বলেন আমি তার ওসিয়ত ওয়ারিছদেকে শুনালাম। কিন্তু তারা আমার কথায় কান দিল না।
(আনফাছুল আরিফিন ৯১ উলামায়ে দেওবন্দ কা শানদার মাযী ৩১০)

154

শায়খ আমান পানিপতি (রাহঃ)

বর্ণিত আছে শায়খ আমান (রহঃ) তাঁর বন্ধুর সাক্ষাতে দিল্লিতে আসতেন। শেষ বার সাক্ষাতে বন্ধুকে বললেন এবার লম্বা ছফর করব। তখন তাঁর বন্ধু শায়খ জাকারিয়া আজুদনী বললেন আমি আপনার সাথে ছফরে থাকব। শায়খ আমান বললেন জাহেরী সফর হলে তো তুমি থাকতে এটা জাহেরী সফর নয় বরং অন্য আরেক সফর। অতএব আমি তোমাকে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে রেখে গেলাম।

সেখান থেকে বাড়িতে পৌঁছে পিতার সব জিনিসগুলো দেখলেন তরপর কুরআন শরীফের দিকে চেয়ে বললেন হে সম্মানিত কিতাব, আমি তোমার থেকে সীমাহীন উপকার লাভ করেছি। এভাবে প্রত্যেক রূমে প্রবেশ করে আল বিদায় আল বিদায় বললেন। এ অবস্থায় তাঁর জ্বর এসে গেল। তখন তিনি বললেন বেশী করে পানি গরম করে নতুন একটি পাত্রে নিয়ে আস। যাতে সারা জিবনের ওয়াসওয়াসা দুর হয়ে যায়।

১২ রবীউস সানীতে তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলো। এ অবস্থায় তিনি বললেন তরীকতের মাশায়িখগণ দন্ডয়মান। একত্ববাদের ফাতওয়া জিজ্ঞাস করছেন। একথা বলে কালিমা পড়ে পড়ে মারা যান। (আখবারুল আখয়ার ৪৯৮)

শায়খ সাদিদুল্লাহ (রাহঃ)

তিনি মীর সায়্যিদ মুহাম্মদ গিছুদরাজ (রাহঃ) এর খলিফা ও নাতি ছিলেন। তাহার জন্ম ৮১১ হিজরীতে। মৃত্যু ৮৪৯ হিজরীতে হয়। আল্লাহর প্রতি এশক ভালোবাসাতেই তিনি ব্যস্ত থাকতেন।

বর্ণিত আছে তিনি ছোট বাচ্চা থাকা অবস্থায় সায়্যিদ মুহাম্মদ গিছুদরাজ (রাহঃ) ওজুর সময় মাথা মাছেহ করে টুপি খুলে এক জায়গায় রাখেন। ইত্যবসরে সাদিদুল্লাহ (রাহঃ) এসে টুপি উঠিয়ে নিজের মাথায় রেখে দেন। তখন গিছুদরাজা (রাহঃ) বললেন এটা হচ্ছে খিলআত। (খিলআত হলো বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত শাহি পোষাক অথবা পীর মুর্শেদ দ্বারা প্রাপ্ত নসিহত) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমানত অর্পনের পুর্ন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গেল।

তারপর থেকে সায়্যিদ গিছুদরাজ কাউকে মুরিদ করার পর ছাদীদুল্লাহর কাছে সোপর্দ করতেন। তবে যিকির আযকারের তালকীন নিজে বলে দিতেন।

প্রসিদ্ধ আছে ছাদীদুল্লাহ একজন মহিলার প্রতি আশেক হয়ে গিয়েছিলেন। সাথে সাথে নিজেকে কন্ট্রল করলেন। ভালোবাসা লুকিয়ে রাখলেন। অবশেষে তাকে বিবাহ করলেন। ঐ এলাকার রীতি অনুযায়ী সকাল বেলা স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত হলো। স্ত্রীর সুন্দর্যতার প্রতি একটি নজর দিলেন সাথে সাথে ঐ আল্লাহর বান্দি একটা শ্বাস নিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। বিবাহের মজলিস দু:খের মাজলিসে রূপান্তরিত হলো। শায়খ সাদিদুল্লাহ স্বীয় স্ত্রীর হাত ধরে কাছে বসার আগেই নিজের প্রাণ মালিকের কাছে সোপর্দ করলেন। লোকেরা উভয়জনকে একে অপরের পাশে দাফন করল। (আখবারুল আখইয়ার ৩৭১-৩৭২)

খাজা যিয়া উদ্দিন সুনামী (রাহ:)

বর্ণিত আছে খাজা যিয়া উদ্দিনের মরণকালে শায়েখ নিজামুদ্দীন তাঁকে দেখতে আসেন। তখন যিয়া উদ্দিন (রাহ:) খাদেমদেরকে নির্দেশ করলেন তাঁর পাগড়ি যেন নিজামুদ্দীন (রাহ:) এর পায়ের নিচে বিছিয়ে দেওয়া হয় যাতে তিনি (নিজামুদ্দীন) পাগড়ীর উপর হেটে আসেন। কিন্তু নিজামুদ্দীন ঐ পাগড়ি উঠিয়ে নিজের চোখে লাগান। অতপর সামনে এসে বসেন, কিন্তু যিয়া উদ্দিন (রাহ:) চোখ দিয়ে তার দিকে তাকান নাই।

খাজা নিজামুদ্দীন যখন বের হয়ে গেলেন তখন ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, খাজা যিয়া উদ্দিন ইন্তেকাল করেছেন। তখন নিজামুদ্দীন (রাহ:) অত্যন্ত আফসোস করে বললেন শরীয়তের পাহারাদার একজন জানবাজ ব্যক্তি ছিলেন শায়খ যিয়া উদ্দিন তিনি আজ চলে গেলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন। (আখবারুল আখইয়ার ২৩৫)

শায়খ শিহাবুদ্দীন খতিব হানসুয়ী (রহ:)

তাঁর ব্যাপারে শায়খ নিজামুদ্দীন (রাহ:) বলেন তিনি সকলের প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। সর্বদা সুরা বাকারাহ তেলাওয়াত করে ঘুমাতেন। তিনি নিজেই তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন একরাতে সুরা বাকরাহ পড়তে ছিলেন হঠাৎ করে ঘরের এক পার্শ থেকে আওয়াজ এল

156

তুমি আমাদের মাথা নিয়ে যাওয়ার জন্য চলে আস অন্যথায় আমাদের থেকে দুরে থাক। আমরা তো তোমার সাথে বন্ধুত্ব রাখি এবং তুমি আমাদের মাথা সম্পর্কে অপরিচিত।

যখন এই আওয়াজ আসল তখন ঘরের সবাই ঘুমে ছিল। আমি অত্যন্ত পেরেশান হলাম। কে এই আওয়াজ দিল? পরিবারের কারো প্রতি এমন ভাবার্থ মুলক কথা বলার আশা ছিল না।

২য় বার তিনি একি আওয়াজ শুনে বললেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার অধিকাংশ আদেশ নিষেধ সাধ্যমতো পালন করেছি। আমি আশা রাখি আমার সাথে কৃত ওয়াদা পূরন করবেন। আমার মরণকালে আজরাঈল অথবা অন্য কোন ফেরেস্তা যেন আমার নিকটে না থাকে শুধুমাত্র আমি ও আর আপনার সত্ত্বা যেন থাকে। আল্লাহ আমার প্রতি রহমত নাযিল কর।

(আখবারুল আখইয়ার ১৭৪)

শায়খ ইছহাক (রাহঃ)

তিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করেছেন। তিনি বলেছিলেন আমার একটি ছেলের বাবা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। যে দিন সে জন্মগ্রহন করবে সে দিন আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিব।

একদম বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তাঁকে একজন ছেলে দান করেন। ছেলে জন্মের পর খাদেমাকে ডেকে বললেন ঘরে যা কিছু আছে নিয়ে আস। খাদেমা বলল ঘরে কখনও কোন কিছু ছিল? যা এখন নিয়ে আসব। তিনি বললেন আজ যা পাও তা নিয়ে আস। খাদেমা ২ কেজি শস্য, দুটি কাপড় নিয়ে আসল। তিনি এগুলো দরিদ্রদেরকে দিয়ে দিলেন। অতপর খাদেমাকে বললেন একজন কবিকে ডেকে নিয়ে আস আমার কিছু কবিতা শুনতে মন চাচ্ছে। খাদিমা বলল তাকে পরিশ্রমিক দেওয়ার মতো কিছু তো নাই। তিনি বললেন আমার পাগড়ি চাদর দিয়ে তাকে খুশি করব।

ইত্যবসরে শুনা গেল তাঁর একজন বন্ধুর ঘরে কবিতার আসর বসেছে। তাই তিনি সেখানে চলে গেলেন আর কবিতা শুনে আল্লাহর প্রেমে কিছুক্ষণ কান্না করলেন। একপর্যায়ে অনিচ্ছায় সেখান থেকে ঘরে ফিরে বললেন আজ শুক্রবার নাপিত কে ডাক। নাপিত আসল। ক্ষুর কার্য করলেন। গোসল করলেন।

বন্ধুদের একে একে বিদায় দিলেন। অতপর তেলাওয়াতে বসে ১ মনযিল তেলাওয়াত করে চিরবিদায় গ্রহন করলেন। (খাজিনাতুল আসফিয়া ৩৭৭)

শায়খ জালালুদ্দীন গুজরাটি (রাহঃ)

তিনি শায়খ পিয়ারা (রাহঃ) এর অন্যতম মহান খলিফা। বড় বজুর্গ লোক ছিলেন। জন্মগত গুজরাটি ছিলেন। কিন্তু জীবন যাপন করেছেন বাংলায়।

আখবারুল আখইয়ার ও মাআরিজুল ওলায়াত গ্রন্থে লিখা হয়, তিনি নিজ খানকায় সিংহাসনে বাদশাহদের মত বসতেন। নিজের মুরিদ ও খাদিমদেরকে বাদশার মতো নির্দেশ দিতেন।

এক পর্যায়ে একজন বখাটে লোক সে সময়ের বাদশাহকে বলল আপনার রাজত্বে ভিন্ন আরেক বাদশাহি চালু হয়েছে। এটা যদি চালু থাকে তাহলে আপনার বাদশাহি নিঃশেষ হয়ে যাবে। সাথে সাথে বাদশাহ ফৌজ পাঠিয়ে জালালুদ্দীন ও তার মুরিদদেরকে হত্যা করার নির্দেশ করল।

বাদশাহর সৈন্যরা যখন খানকায় প্রবেশ করে মুরিদদের উপর তলোয়ার চালানো শুরু করল তখন জালালুদ্দীন (রাহঃ) ইয়া কাহহার বলতে শুরু করলেন। যখন তাঁর উপর হামলা চালালো তখন ইয়া রাহমান বলে আওয়াজ দিতে লাগলেন। এই অবস্থায় তার মাথা শরির থেকে পৃথক করা হলো। আর মাথা থেকে আল্লাহ আওয়াজ আসতে থাকল। তাঁর শাহাদতের এই ঘটনা ৮৮১ হিজরীতে হয়।

খাজা মওদুদ চিশতি (রাহঃ)

তিনি জন্মগত ওলী ছিলেন। সাত বছর বয়সে কুরআনের হিফজ সম্পুর্ণ করেন। আর ১৬ বছর বয়সে ধর্মিয় জ্ঞানের সকল শাখা সমাপ্ত করেন। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য কিতাব হলো মিনহাজুল আরেফীন, খুলাছাতুশ শারকিয়াহ। নিজ পিতার কাছ থেকে খেলাফতি লাভ করেন।

তিনি যখন মৃত্যুকালিন অসুস্থতায় শয্যাশায়ি হলেন, দিন দিন রোগ বাড়তে থাকল। যে দিন মৃত্যু হয় সে দিন দেখা গেল বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছেন। বারবার মাথা উঠাচ্ছেন। যেন তিনি কারো আগমনের প্রতিক্ষায় আছেন। হঠাৎ দেখা গেল নুরানী চেহারা বিশিষ্ঠ একজন ব্যক্তি প্রবেশ করলেন।

সালাম দিয়ে কিছু লেখা রেশমি কাপড়ের একটি টুকরা তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। খাজা মওদুদ লেখার দিকে তাকিয়ে চোখের উপর কাপড়টি রাখলেন। আর এ অবস্থায় প্রাণ আল্লাহর কুদরতি হস্তে অর্পন করেন।

কাফনের পর জানাযার নামাজের প্রস্তুতির সময় লোকেরা ভয়ানক একটা আওয়াজ শুনল। ফলে মানুষ ভিত হয়ে এলোমেলো হয়ে গেল। দেখা গেল অদৃশ্য কিছু লোক এসে প্রথমে তারা জানাযা পড়ল। তারপর জিন পরি এসে জানাযা পড়ল। অতপর অগনিত মুরিদ খুলাফাগণ ছোট বড় দলে বিভক্ত হয়ে জানাযা পড়েন।

জানাযার নামাজ পড়া শেষ হয়ে গেলে লাশের খাটিয়া ধরা ছোয়া ছাড়াই কবরস্থানে পৌঁছে যায়। এই কেরামত দেখে ইসলাম বিদ্বেষি হাজারো লোক মুসলমান হয়।

খাজা মওদুদ (রাহঃ) ৪৩০ হিজরীতে জন্মগ্রহন করেন আর ৫২৫ হিজরীর ১লা রজব ইন্তেকাল করেন। (খাজিনাতুল আসফিয়া ৫৩)

শায়খ মাসউদ গাজি শহিদ (রাহঃ)

শায়খ মাসউদ গাজী (রাহ:) ৪০৫ হিজরীর রজবের ২১ তারিখে আজমীরে জন্মগ্রহন করেন। আলী (রা:) এর বংশের লোক ছিলেন। তাঁর পিতা মীর ছাহু আলাবী সুলতান মাহমুদ গজনভীর সেনা প্রধান ছিলেন।

মাহমুদ গজনভী কর্তৃক সোমনাথের যুদ্ধে বিভিন্ন বাহিনীর মধ্য থেকে এক অংশের দায়িত্বশিল ছিলেন শায়খ মাসউদ গাজী। তাঁর সুষ্ঠ যুদ্ধ পরিচালনায় মাহমুদ গজনভী খুবই প্রভাবিত হন।

মুর্তিকে চুর্ণ-বিচুর্ণকারি হবে না বিক্রেতা হবে?

সোমনাথ বিজয়ের পর মাহমুদ গজনভী (রহঃ) সোমনাথের প্রসিদ্ধ মুর্তিটি নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো এই মুর্তিকে গজনীর মসজিদের সামনে ফেলে দেওয়া হবে। যাতে হিন্দুরা মুর্তি পুজা থেকে বিরত থাকবে।

হিন্দুরা সুলতান মাহমুদের এই ইচ্ছার কথা শুনার পর তাদের একটি প্রতিনিধি দল সুলতান মাহমুদের প্রধান ওজীর খাজা হাছান মাহমানদীর কাছে পাঠালো। তিনি যেন সুলতানের কাছে এই প্রস্তাব রাখেন যে, মুর্তি ভেঙ্গে হিন্দুদের

খোদাকে অপদস্থ না করে। এটাকে যেন তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন। বিনিময়ে মুর্তির ওজন বরাবর খাঁটি সোনা প্রদান করা হবে। খাজা হাছান মেহমান্দী এই মহা বিনিময়ের উপর রাজি হয়ে গেলেন। তিনি সুপারিশের জন্য সুলতান মাহমুদের দরবারে প্রবেশ করলেন।

মীর মাসউদ গাজী (রাহ:)ও তখন দরবারে ছিলেন। যখনই মাসউদ গাজী এই প্রসঙ্গ শুনলেন সাথে সাথে লোক ভর্তি দরবারে সাহসিকতার সাথে দাড়িয়ে বললেন, ওজীরে আজম কি চান যে, কিয়ামতের দিন আজর ঠাকুরকে মুর্তি নির্মাতা আর মাহমুদ গজনভীকে মুর্তি বিক্রেতা হিসাবে ডাকা হউক? আজ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে সুলতান মাহমুদকে মুর্তি ভঙ্গকারী হিসাবে ডাকা হয়। এখন তাঁকে মুর্তি বিক্রেতা হিসাবে ডাকা হবে।

তাঁর এই সাহসী বক্তব্যে সুলতান মাহমুদ সহ দরবারের সবাই প্রভাবিত হয়। ফলে হিন্দুদের প্লান পুর্ণ হল না।

হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন

কিছুদিন গজনীতে কাটানোর পর হিন্দুস্থানে ফিরে আসেন। এখানে এসে কয়েক হাজার সৈন্য প্রস্তুত করে মুলতান বিজয়ের দিকে ধাবিত হন। মুলতান ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করে দিল্লি বিজয় করেন। যা রাজা হিসপালের অধিনে ছিল। মাসউদ গাজী পুর্ণ জীবন জিহাদে ব্যয় করেন।

মিরআতে সিকন্দর নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে তিনি জন্মগত ওলী ছিলেন। দুনিয়ার কাজকর্মে জড়িত থাকলেও তাঁর আত্মশুদ্ধির বেলায় তিনি গাফেল ছিলেন না।

শাহাদাত বরণ

সুলতান মাহমুদ গজনভীর মৃত্যুর সংবাদ হিন্দুস্থানে পৌঁছার পর কাফেরদের সাহস বেড়ে যায়। ফলে অত্যন্ত শক্তি নিয়ে তারা মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা শুরু করে। মীর মাসউদ গাজী (রাহ:) তখন তাঁর পিতার সাথে মিলিত হয়ে কাফির বাহিনীকে প্রতিহত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঐ সময়ে তাঁর পিতা ২৪ শাওয়াল ৪৩২ হিজরীতে মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

হিন্দুরা যখন তাঁর মরণের খবর পেল তখন ভেঙ্গে যাওয়া মনবল তাদের আবার চাঙ্গা হলো। আবার হাঙ্গামা শুরু করল। চতুর্দিকে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা শুরু করল। মীর মাসউদ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তা প্রতিহত করতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

যুদ্ধের কাজ কর্ম নিজেই পরিচালনা করতে থাকলেন। এ যুদ্ধে তাঁর অনেক সাথি বিশেষ করে সায়্যিদ নাসরুল্লাহ, মিয়া রজব কাতওয়াল এবং সাইফুদ্দিন শাহাদাত বরণ করেন। কিছু অংশকে দাফন করা হয় এবং কিছু লোককে কুপে নিক্ষেপ করা হয়।

১৩ রজব রাতের শেষ প্রহরে বাহরাইচ শহর থেকে ১০ মাইল দুরে অবস্থিত এক জায়গায় অবস্থান কালে হিন্দুরা ভয়াবহ এক হামলা করল। পরের দিন সকাল বেলা সিপাহ সালার সাইফুদ্দিন কে একটি বাহিনী দিয়ে সকল সেনাকে একত্রিত করার নির্দেশ করেন। নিজে গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করে তরবারি ও খঞ্জর দ্বারা সজ্জিত হয়ে সৈন্যদেরকে বিন্যস্ত করে জিহাদের ময়দানে রওয়ানা হন।

এদিকে সংবাদ পেলেন শত্রু বাহিনী সাইফুল্লাহর উপর বিজয় হয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি নিজে জিহাদের ময়দানে স্বশরীরে আসেন। ঘোড়া থেকে অবতরন করে ওজু করে শহিদদের জানাযা আদায় করেন। তাদেরকে কবরস্থ করে বিজয়ের প্রশিক্ষিত ঘোড়ায় আরোহন করে অবশিষ্ঠ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অবতির্ণ হন। তাঁর সাহসিকতা দেখে যুদ্ধের ময়দান থেকে শত্রুরা পলায়ন করল। তিনি তাঁর সাথীদেরকে একত্র করতে শুরু করলেন। শত্রুরাও আবার জড়ো হতে শুরু করল। যুদ্ধের ময়দানে রক্তের বন্যা দেখা দিতে লাগল।

৪২৪ হিজরীর ১৪ রজব রোজ রবিবার আসরের সময় হঠাৎ ৪টি তীর এক সাথে কণ্ঠনালীতে এসে বিদ্ধ হয়। সাথে সাথে কালিমা শাহাদাত পড়ে পড়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান। সিকন্দর দিওয়ালা এবং অন্যান্য খাদিমরা তাকে তাঁবুতে একটি বিছানায় শুইয়ে দিল। সিকন্দর দিওয়ালা তাঁর মাথা নিজের বাহুতে রেখে অঝোরে কাদতে লাগলেন। আর মাসউদ গাজী একবার চোখ তুলে মুচকি হেসে কালিমা পড়ে পড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।
(খাজিনাতুল আসফিয়া ১৫৯)

হযরত শায়খ মারুফ কারখী (রহঃ)

মারুফ কারখীকে বাগদাদের দিকে সম্বোধন করে কারখী বলা হয়। বংশগতভাবে নাসারাদের অনুসারি ছিলেন। ছোটবেলা তাকে ও তাঁর ভাই ঈসাকে নাসরা একজন শিক্ষকের কাছে পাঠানো হলো লেখা পড়ার জন্য। তাঁর ভাই ঈসা বলেন শিক্ষক আমাদেরকে শিখালেন নাসারা আকিদা অনুযায়ী আল্লাহ হলেন বাবা আর ছেলে হলেন ইসা (আঃ) তখন মারুফ কারখী উচু আওয়াজে বললেন احد- احد- احد তখন শিক্ষক তাঁকে খুব পেটালেন। এক পর্যায়ে মারুফ কারখী সেখান থেকে পলায়ন করলেন।

অনেক দিন পর্যন্ত মা কান্নাকাটি করলেন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও। তাঁকে আমি নির্দিষ্ট কোন ধর্মে থাকতে বাধ্য করব না। ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ধর্মে থাকতে পারবে।

কয়েক বছর পর মারুফ কারখী ঘরে ফিরলেন। মা বললেন তুমি কোন ধর্মের উপর আছো? তিনি বললেন ইসলাম ধর্মের উপর। তখন মা ও কালেমা শাহদাত পড়ে নিলেন। ঈসা বলেন ভাই কারখীর সাথে ঘরের সবাই মুসলমান হয়ে যান।

একদিন মারুফ কারখী রোজাদার ছিলেন। আসরের নামাজের পর বাজার থেকে আসতেছেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি (পানি বহন কারি) চিৎকার করে বলল رَحْمَةُ اللهِ عَلى مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هذَا الْمَاءِ যে এইপাত্র থেকে পানি পান করবে আল্লাহ তাকে দয়া করবেন। মারুফ কারখী শুনামাত্র পাত্র হাতে নিয়ে পান করলেন। সাথিরা বলল আপনি কি রোজা ছিলেন না? বললেন হ্যাঁ। রহমতের আশায় পানি পান করেছি।

মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে দেখে জিজ্ঞাস করলেন আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? মারুফ কারখী বললেন ঐ পানি বহনকারি ব্যক্তির রহমতের দোয়ার বদৌলতে মাফ করে দিয়েছেন।

মারুফ কারখী বলতেন বাহাদুর হওয়ার নিদর্শন তিনটি (১) এমন বিশ্বস্ততা যাতে নেই কোন প্রতারনা (২) বিনিময় ছাড়া প্রশংসা করা (৩) চাওয়া বিহিন মাফ করা।

162

মৃত্যুকালে তাকে কিছু ওসিয়ত করতে বলা হল। মারুফ কারখী বললেন আমি মারা গেলে আমার পরনের জামা ছদকা করে দিবে। যাতে দুনিয়াতে যেভাবে উলঙ্গ অবস্থায় কাপড় বিহিন এসেছি বিদায় বেলাও যেন সেভাবেই যাই।
২০০ হিজরী মতান্তরে ২০৬ হিজরীর ৮ মুহাররাম মারা যান। বাগদাদে তার কবর হয়।
(খাজিনাতুল ওয়াফিয়া ১৩০ ছিফাতুস সাফওয়া)
আবু জাফর রফীক নামি একজন বুজুর্গ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন এবস্থায় যে কোথা থেকে যেন আসছেন। আবু জাফর মারুফ কারখীকে স্বপ্নে বললেন কোথা থেকে আসছেন। মারুফ কারখী বললেন জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে কালিমুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে আসছি।
(কিতাবুর রূহ ইবনুল কায়্যিম ৭৩)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইদরিস (রহ:)
তাঁর মৃত্যুকালে মেয়ে কাঁদতে লাগল, তিনি মেয়েকে বললেন কেঁদ না। আমি এই রুমে বসে 8 হাজার বার কুরআন খতম করেছি। তাঁর মৃত্যু ১৯২ হিজরীতে হয়।
(সিফাতুস সাফওয়া)

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ উমরী (রাহ:)
তিনি মানুষ থেকে পলায়ন করে কিতাব হাতে নিয়ে কবরস্থানে চলে যেতেন। এমনটা করার কারণ জিজ্ঞাস করা হল।
তিনি বলেন لَمْ اَرَ اَوْعَظَ مِنْ قَبْرٍ وَلَا آنَسَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا اَسْلَمَ مِنَ الْوَحْدَةِ অর্থাৎ কবর থেকে উত্তম নসিহতকারি, উপদেশ প্রদানকারি আর কেহ নাই। কিতাবের মত অন্তরঙ্গ বন্ধু আর না। একাকিত্ব থেকে অধিক নিরাপদ কিছু নাই।
তিনি গাছের ছাল দ্বারা যে রশি তৈরী করতেন উহার মুল্য সাত দিরহাম। মৃত্যু কালে বললেন আমি নেয়ামত প্রকাশার্থে বলছি এগুলোর মালিকানা শুধু আমার। আরো বলছি যদি সারা দুনিয়া আমার পায়ের নিচে চলে আসে তথাপিও তা আমি গ্রহন করব না।
(সিফাতুস সাফওয়া)

হযরত শায়খ ছিররী সাকতী (রাহ:)

জুনাঈদ বাগদাদী (রাহ:) বলেন ছিররী সাকতীর মৃত্যুর সময় আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁর অবস্থা জানতে চাইলাম। ছিররী সাকতী তখন একটি কবিতা পাঠ করলেন। كَيْفَ اَشْكُوْ اِلى طَبِيْبِىْ مَا بِىْ؟ وَالَّذِيْ بِىْ أَصَابَنِىْ مِنْ طَبِيْبِىْ আমি ডাক্তারের কাছে রোগের কথা কিভাবে বলব? আমার উপর দিয়ে যা কিছু অতিক্রম হচ্ছে তা তো তাঁর পক্ষ থেকেই হচ্ছে।

জুনাইদ বাগদাদী বলেন আমি পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাশ দিতে লাগলাম। তখন তিনি বললেন যার ভিতর জলছে তাঁকে বাতাশ দিয়ে কি ফায়দা হবে? হে জুনাঈদ পাখা রেখে দাও। বাতাশ দিলে আগুন আরো উত্তেজিত হবে। অতপর আবার কবিতা পাঠ করেন-

اَلْقَلْبُ مُحْتَرِقٌ وَالدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ+ وَالْكَرْبُ مُجْتَمِعٌ وَالصَّبْرُ مُفْتَرِقٌ
كَيْفَ الْقَرَارُ عَلى مَنْ لَا قَرَارَ لَهُ+ مِمَّا جَنَاهُ الْهَوى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ
يَا رَبِّ اِنْ كَانَ شَيْئٌ فِيْهِ لِىْ فَرَجٌ+ فَامْنُنْ عَلَىَّ بِهِ مَادَامَ بِىْ رَمَقٌ

চোখে পানি প্রবাহমান। অন্তর আগুনে দগ্ধ
দু:খ কষ্ঠ আছে সাথে, ধৈর্য্য আছে দুরে
সে কেমন কারে শান্তি লাভ করবে যার নেই কোন স্থায়িত্ব।

আমি বললাম কিছু নসিহত করুন। তখন বললেন, সৃষ্টিকে তোমার জন্য ব্যস্ত কর। আর নিজে স্রষ্টার জন্য ব্যস্ত হও।

জুনাইদ বাগদাদী বলেন তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর আমি নিকটে যায়ে তাঁর গালে আমার গাল রেখে কাঁদতে লাগলাম তাঁর গালে আমার চোখের পানি পড়ার পর বললেন তুমি কে? আমি বললাম আপনার খাদেম জুনাইদ।

ছিররী সাকতী বললেন ধন্যবাদ এখানে তুমি এসেছ।

আমি বললাম কিছু ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন মন্দলোকের সংস্পর্শতা থেকে দুরে থাক। এমন যেন না হয় অন্যের সংস্পর্শের দরুন আল্লাহ থেকে পৃথক হতে হয়। (সিফাতুস সাফওয়া)

জুনাইদ বিন মুহাম্মদ বলেন আমি ছিররী সাকতীকে বলতে শুনেছি لَوْلَا الْجُمْعَةُ وَالْجَمَاعَةُ لَسَدَدْتُ عَلى نَفْسِىْ الْبَابَ وَلَمْ اَخْرُجْ যদি জামাতে নামাজের এবং জুমআর নামাজের আদেশ প্রাপ্ত না হতাম তাহলে ঘর থেকে কখনও বের হতাম না।

ছিররী সাকতী বলতেন বীর পুরুষ তো ঐ ব্যক্তি যে বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের সময়ও আল্লাহ থেকে গাফিল না হয়।
বাহাদুর তো ঐ ব্যক্তি যে তার নফছে আম্মারা কে পরাজিত করেছে।
শিষ্ঠাচার অন্তরের ভাষ্যকার।
যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে সংশোধন করতে পারে নাই সে অন্যকে শিষ্ঠাচার কি শিখাবে?
তিনি আরো বলেন, পাচটি বিষয় যদি অন্তরে না থাকে তাহলে অন্য বিষয় অন্তরে থাকে-
(১) আল্লাহর ভয়
(২) রহমতের আশা
(৩) মহব্বত
(৪) হায়া
(৫) সৃষ্টির প্রতি দয়া-মায়া।
তিনি আরো বলেন আল্লাহর সৃষ্টির সেরা ঐ ব্যক্তি যার পক্ষ থেকে অন্য মাখলুক কষ্ঠ পায় না।
তিনি ২৫০ হিজরীর ৩য় রমজান ইন্তেকাল করেন। বাগদাদে তাঁকে সমাহিত করা হয়।
আবী উবাইদ বিন হারবুয়া বলেন আমি ছিররী সাকতীর জানাযায় শরিক ছিলাম। আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলাম আপনার সাথে আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? ছিররী সাকতী বললেন আমাকে এবং আমার জানাযায় যারা শরীক হয়েছিল সবাইকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।
আমি বললাম আমি জানাযায় হাজির ছিলাম, নামাজ পড়েছি। ছিররী সাকতী তখন লিখিত একটি কাগজ বের করলেন। দেখা গেল আমার নাম নাই।
আমি আবার বললাম আমি জানাযার নামাজও পড়েছি। তখন তিনি দ্বিতীয়বার কাগজ বের করলেন দেখা গেল কাগজের পার্শ দিকে আমার নাম লিখা আছে।

তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস (রাহঃ)

আল্লামা মনজুর নোমানী বলেন এপ্রিল মাসের যেই দিনে তিনি অধিক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সে দিন আমি তাঁর কাছে ছিলাম। দীর্ঘ দুই ঘন্টা বেহুশ অবস্থায়

165

ছিলেন। চক্ষু বন্ধ ছিল। অবশেষে নিজে নিজে চোখ খোললেন আর জবান দিয়ে বলতে থাকলেন- اَلْحَقُّ يَعْلُوْ- اَلْحَقُّ يَعْلُوْ- اَلْحَقُّ يَعْلُوْوَلَا يُعْلٰى অতপর আনন্দচিত্তে সুরের সাথে কুরআনের এই আয়াত ৩ বার তিলাওয়াত করলেন। আয়াত হলো- وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

মনজুর নোমানী বলেন তিনি আয়াত খানা এত জোর আওয়াজে পড়লেন যে, আমি মসজিদের আঙ্গিনায় ছিলাম আওয়াজ শুনে তাঁর কামরায় গিয়ে দাড়ালাম। হযরত তখন তাঁর খাদেম কে বললেন মনজুর কোথায়? আমি শুনার সাথে সাথে তাঁর সামনে হাজির হলাম। হযরত বললেন মাওলানা সাহেব আল্লাহর ওয়াদা দাওয়াতের এই কাজ পুর্ণতায় পৌঁছবে। তবে শর্ত হলো আল্লাহর ওয়াদার উপর পূর্ণ আস্থাসহ তার কাছে সাহায্য কামনা করা এবং যথাসাধ্য মেহনত করা।

একথা বলার পর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পিনপতন নিরব হয়ে গেলেন। নিরবতা ভেঙ্গে শুধু এতটুকু বললেন হায়! উলামাগণ যদি এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে নিতেন অতপর আমি চলে যেতাম তাহলে কতইনা ভালো হত।

(আল-ফুরক্বান উফিয়াত ৩৩-৩৪)

শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব ভুপালি (রাহ:)

১৯৭০ সনের ১৭ই মে শেষ রবিবার শিক্ষাদানের মজলিস অত্যন্ত দীর্ঘ হলো। এই দিন বার বার বলেছেন আমার মৃত্যু একদম নিকটে। ঐ সময় দরদিকণ্ঠে মাওলানা রুমীর কবিতা আবৃতি করলেন- যার অর্থ হলো-

এটা কতইনা উত্তম যে, এমন বাদশাহর কাছে যাচ্ছি যার দরবার তুলনাহীন। সময় চলে এসেছে এই অসহায়ের দুনিয়া টুকরা টুকরা হয়ে স্বস্থানে পৌঁছবে।

অতপর সোমবার মঙ্গলবার যথারীতি মজলিস কায়িম হল। বুধবারে (যে দিন তিনি মারা যান) প্রতি দিনের মত মজলিস চলল। ঐ দিন কুরআনের তেলাওয়াত, অনুবাদ, তাফসীর, হাদীছ শরীফের আলোচনা অন্য দিনের তুলনায় বেশি হল। বেলা ১১টার দিকে খানকাহ থেকে ঘরে আসলেন হালকা খাবার খেলেন।

ঘরের ভিতরে একটি আলমারিতে তাঁর পছন্দিনয় কিছু জিনিস রক্ষিত ছিল। এটা সব সময় তালাবদ্ধ থাকত। ছোট ছেলেকে ডেকে আলমারি খুললেন।

166

বললেন তোমার যা কিছু চাহিদা তা নিয়ে নাও। ছোট ছেলে তার চাহিদার জিনিসগুলো নিয়ে আলমারি দরজা লাগাতে চাইল তিনি বললেন এখন আর এটা লাগানোর দরকার নাই। খুলা থাকুক।

অতপর দুইজন সন্তান সায়্যিদ মিয়া এবং মিয়া মিসবাহুল হাছান কে ডেকে কিছু বললেন। এবং কায়লুলার নিয়তে শুয়ে পড়লেন। আড়াইটার দিকে উঠে ওজু করে নামাজ পড়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর বললেন শরিরটা খারাপ মনে হচ্ছে। একথা বলে বিছানা থেকে উঠে গোসলখানায় গেলেন। সেখানে অস্থিরতা বসত মাথা ঘুর্ণন শুরু হলো। ছোট ছেলে এবং তার মাতা এটা অনুভব করলেন। ফলে তারা ধরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তখন তিনি বেহুশ ছিলেন। ১০ মিনিট পর হুশ ফিরল।

ডা: কুরাইশি সাহেবকে খবর দিলে তিনি এসে পৌঁছলেন। হযরত বললেন আমার কিছুই হয়নি। সামান্য মাথা ঘূর্ণন হয়েছে। ডাক্তার কে একথা বলে তিনি পড়া শুরু করে দিলেন। কিন্তু কি পড়ছেন তা বুঝা যাচ্ছে না। বড় ছেলে শুধু এই আয়াত পড়তে শুনেছেন

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

হঠাৎ করে পেটে অথবা বুকে ব্যথা শুরু হলো। অধিক যন্ত্রণার কারণে বার বার উঠেন আবার শুয়ে পড়েন। ডা: কুরাইশি বললেন আমি ইঞ্জেকশন দিব। ইনশাল্লাহ আরাম পাবেন। হযরত বললেন ঠিক আছে। একথা বলে আবার পড়া শুরু করে দিলেন।

উভয় ছেলে, উভয় মেয়ে, স্ত্রী তখন কাছে ছিলেন, তাদেরকে বললেন সকলে কালিমা পড় কালিমা শাহদাত পড়। ইয়াসিন তেলাওয়াত কর। বড় ছেলে মুহাম্মদ সায়ীদ ইয়াসিন পড়তে শুরু করলেন। অন্যান্যরা কালিমা তাইয়্যিবাহ, শাহাদাত পড়া শুরু করলেন। এক পর্যায়ে হযরত বললেন আমি এখন চলে যাব। হাটু পর্যন্ত প্রাণ চলে গেছে। একথা বলে আবার পড়া শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন এখন হাতের প্রাণ বের হয়ে গেছে। অতপর উপস্থিত লোকদেরকে বললেন তোমরা সকলে সাক্ষি থাক একথা বলে উচ্চ আওয়াজে কালিমা শাহাদত পাঠ করেন। প্রায় এক মিনিট পর السلام عليكم উচ্চ আওয়াজে বলে সাথে সাথে প্রাণ চলে যায় (আল-ফুরক্বান ১৬৯-১৭০)

খাজা ফরীদুদ্দীন গাঞ্জেশাকার (রাহঃ)

সিয়রুল আওলিয়া, আখবারুল আখইয়ার, যাওয়াহিরে ফরিদী, সাফীনাতুল আউলিয়া ইত্যাদি কিতাবে মৃত্যু তারিখ ৬৬৪ হিজরীর ৫ মুহাররাম শনিবার উল্লেখ করা হয়। মৃত্যুর কিছু দিন পুর্বে কবিসুর্য (ফরিদুদ্দীন) খাজা নেযামীর কয়েকটি কবিতা শুনালেন যেগুলোর অর্থ হলো (১) দুনিয়া কি জিনিস উহা কিছুই না। উহার আরাম আয়েশ ও তার থাবা থেকে মুক্ত থাক। (২) এ বাগানে কেউ চিরস্থায়ী নয়, প্রত্যেককে সর্বদা খেলায় মত্ত। (৩) এ জগতে এটা অজানা নয় যে কারো উপার্জন এমনিতেই মিলছে না (৪) যে নতুন ফলমুল পেয়েছে খেয়ে নিয়েছে, এক আসে এক যায়। (৫) দুনিয়া যদিও ভালো আরামের জায়গা। কিন্তু উহাতে সাতার কাটা আগুন নিয়ে খেলার মত। (৭) বাগানের এক দরজা দিয়ে আস অপর দরজা দিয়ে বাহির হও। (৮) জ্ঞানি হলে কোন ফুলে মন জুড়াবে না। কেমন এগুলো তো সেখান থেকে যাবে। (৯) এখন তোমার নিকট যা আছে তার প্রতি সন্তুষ্ঠ থাক আগত রাস্তা বড় দুর্গম। (১০) একজনকে দ্রুততার সাথে ভিতরে আনা হয় অন্যজন হঠাৎ বলে উঠ। (১১) নেযামী থেমে যাও তাহলে বন্ধু হবে তুমি, যদি তুমি বিষন্ন হও তাহলে উদার হব।

তাঁর মৃত্যুকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে ছিয়ারুল আওলিয়ার লেখক খাজা নিজামুদ্দীনের বরাতে লিখেন মুহাররামের পাঁচ তারিখে অসুস্থতা বেড়ে যায়। এশার নামাজ জামাতে আদায় করেন। নামাজের পর বেহুশ হয়ে যান। এক ঘন্টা পর হুশ আসলে লোকদের জিজ্ঞাস করেন এশার নামাজ পড়ছি নাকি? লোকেরা বলল হ্যা। বললেন আবার পড়ে নেই। দ্বিতীয়বার পড়ে আবার বেহুশ হয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ বেহুশ রইলেন। আবার হুশ আসল। আবার বললেন এশার নামাজ পড়েছি কি? লোকেরা বলল ২বার পড়েছেন। তিনি বললেন আরেকবার পড়ে নেই। ৩য় বারও পড়লেন তারপর খোদার সাথে মিলিত হন।

(তারিখে দাওয়াত ও আজীমত ৪৪/৪৫)

মৃত্যুর সন ৬৬৪ হিজরীর ৫ মুহাররাম রোজ শনিবার আজুদন নামক স্থানে (পাক পাঠনে) দাফন করা হয়?। পরবর্তিতে যেখানে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক গুম্বুজ নির্মাণ করেন।

168

আবু সুলায়মান দারানী (রাহঃ)

তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা যখন শুরু হলো তখন তার তারীকতের বন্ধুরা কাছে এসে বললেন, আপনার প্রতি মোবারকবাদ। আপনি এখন আল্লাহর কাছে চলে যাচ্ছেন। আবু সুলায়মান বললেন "ভয় কর" এটা বল না কেন? কারণ আমি এমন পালনকর্তার কাছে যাচ্ছি যিনি ছোট গুণাহের হিসাব নিবেন বড়, গুণাহের সাজা দেবেন।

মৃত্যুর পর লোকেরা স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞাস করল আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? তিনি বললেন আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করেছেন।

সাহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতারী (রাহঃ)

সফীনাতুল আউলিয়াতে উল্লেখিত তাঁর মৃত্যু ২৮৩ হিজরীর মুহাররাম মাসে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮০ বছর। মৃত্যুকালে তাঁর চারশত মুরীদ ছিল, সবাই তাঁর মাথার কাছে বসা ছিলো। তারা বলল হে শায়খ আপনার স্থলাভিষিক্ত কে হবেন? শায়খ চোখ খুলে বললেন শাদদিল নামক অগ্নি পুজারী আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।

ইহা শুনে মুরীদরা পরস্পর বলল মৃত্যুর যন্ত্রণার কারণে তাঁর আকল লোপ পেয়েছে। বিধায় চারশত আলেম মুরীদ থাকা সত্ত্বেও এক অগ্নি পুজক স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা বলছেন। সঙ্গে সঙ্গে শায়খ বললেন চিল্লাচিল্লি কম কর। যাও শাদদিলকে নিয়ে আস। লোকেরা তাঁকে নিয়ে আসল। শায়খ তাকে দেখে বললেন আমার মৃত্যুর তিন দিন পর মসজিদে গিয়ে নামাজের পর মিম্বরে বসে সৃষ্টি জগতকে নসিহত করবে। একথা বলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২য় দিন নামাজের পর লোক জমা হলো। শাদ দিল অগ্নিপুজারীদের টুপি মাথায় লাগিয়ে আসলেন, পৈতা কমরে বেধে মিম্বরে বসে বললেন তোমাদের ঐ সর্দার আমাকে তোমাদের প্রতি দুত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আর আমাকে বলেছেন হে শাদদিল তোমার কোমরে বাধা পৈতা ভেঙ্গে ফেলার এবং মাথার টুপি খুলে কালিমা শাহাদাত পড়ার সময় এসে গেছে।

অতপর বললেন তোমাদের পীর নসিহত করেছেন। তার নসিহত তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। অতএব আমি তার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তোমাদের নসিহত করছি। যে শাদদিল বাহ্যিক পৈতা ভেঙ্গে ফেলেছে অতএব তোমাদের প্রতি

তার নসিহত তোমরা তোমাদের অন্তরের দৈতা ভেঙ্গে দাও। তার একথা শুনে লোকদের মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে গেল।
যেদিন তাঁর জানাযা হলো সেদিন অনেক লোক জামায়েত হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। ৭০ বছরের এক ইহুদি কান্নার আওয়াজ শুনে বের হয়ে এসে বলল, কি বিষয় এখানে কি হয়েছে? যখন কাছে আসল তখন চিৎকার করে বলল হে লোক সকল, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা কি তোমরা দেখছো? ইহুদী একথা বলে সাথে সাথে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়।
(জাহিরুল আসফিয়া ২৫৪)

সায়্যিদুত তায়িফা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহ:)

খুলদী হতে বর্ণিত জুনাইদ বাগদাদী প্রতিদিন ৩০০ রাকাত নামাজ পড়তেন। ৩০ হাজার তাছবিহ পড়তেন। জুনাইদ বাগদাদী বলতেন

اَلطَّرِيْقُ اِلى اللهِ مَسْدُوْدُ عَلى خَلْقَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اِلَّا عَلى مُقْتَفِيْنَ اثَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنُ لِسُنَّتُه كَمَا قَالَ اللهُ عَزّوَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاخِرَوَذَكَرَ اللهُ كَثِيْرًا

কেহ তাঁকে বলল كَيْفَ الطَّرِيْقُ اِلى اللهِ জুনাইদ বললেন

تَوْبَةٌ تُحِلُّ الْاصْرَارُ وَخَوْفٌ زُرَيْلٌ اَلْغِرَّةِ وَالرَّجَاءُ مُذْعِجٌ اِلى طَرِيْقِ الْخَيْرَاتِ وَمُرَاقَبَةِ اللهِ فِىْ خَوَاطِرِ الْقُلُوْبِ

তিনি বলতেন শিষ্টাচারিতা হলো নিজের সহপাঠির ভুলক্রুটি সহ্যকরা।
আরো বলেন যদি কোন ব্যক্তি কোটি কোটি বছর আল্লাহর দিকে মনযোগি হয়, পলক না মেরে চেয়ে থাকে। অতপর এক মুহুর্তের জন্য চেহারা ফিরিয়ে আনে তাহলে তার হারানোর সংখ্যা বেশি হবে পাওয়ার সংখ্যা কম হবে।
ইসমাঈল বিন নুজাইদ বলেন আবুল আব্বাস বিন আতা জুনাইদ বাগদাদীর কাছে মৃত্যু যন্ত্রণার সময় হাজির হন। তিনি প্রথমে সালাম করলেন কিন্তু কোন জবাব আসল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সালাম দিলেন এবার সালামের জবাব দিয়ে ওজর পেশ করলেন। অজীফা পাঠে ব্যস্ত থাকার কারনে প্রথম বার জবাব দিতে পারি নাই। অতপর নিজে নিজেই চেহারা কেবলামুখি করে আল্লাহু আকবার বলে সৃষ্টি কর্তার হাতে প্রাণ অর্পন করেন।
আবু মুহাম্মাদ হারীরী বলেন আমি জুনাইদ বাগদাদীর অন্তিম সময়ে মাথার নিকটে ছিলাম। তাঁর ইন্তেকালের দিনটি শুক্রবার ছিল। বার বার তিনি কুরআন

170

তেলাওয়াত করতেছেন। আমি বললাম এই মুহুর্তে নিজেকে একটু আরাম দিন। জুনাইদ বললেন এই মুহুর্তে আমি যে পরিমাণ মুখাপেক্ষি হয়েছি অন্য সময়ে এই পরিমাণ মুখাপেক্ষি ছিলাম না। এখন আমার কিতাব বন্ধ করা হচ্ছে, ভাজ করা হচ্ছে। মৃত্যুর আগ মুহুর্তে সিজদায় পড়ে কাদতে লাগলেন আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর সময়ে একবার বললেন সাতটি দস্তরখানা রাখ যাতে সকল বন্ধুদের সামনে প্রাণ উৎসর্গ করি। অবস্থা নাজুক হওয়ার পর ওজু করানোর জন্য বললেন। লোকেরা ওজু করানোর সময় খিলাল করতে ভুলে গেল। তিনি বললেন খিলাল কেন করলে না।

ফারিছ বিন মুহাম্মাদ বলেন মৃত্যুকালে জুনাইদকে সেজদা করতে দেখেছি। তখন তাঁকে বলা হলো নিজের প্রতি একটু দয়া কর। জুনাইদ বললেন طَرِيْقٌ وَصَلْتُ بِه اِلى اللهِ لَا اَقْطَعُه আমি এই পদ্ধতিতে আল্লাহর কাছে যেতে চাই অতএব এটা ছাড়তে পারি না।

বর্ণিত আছে তিনি মরণকালে বলেছিলেন এই সময়ের মত অন্য কোন সময় কোন কিছুর মুখাপেক্ষি ছিলাম না। একথা বলে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। তখন একজন মুরীদ বলল, এই মুহুর্তেও কুরআন তেলাওয়াত করতেছেন? জুনাইদ বললেন এখন আমল নামা ভাজ করা হচ্ছে। সুতরাং এই সময়ের চাইতে উত্তম সময় আমার জন্য আর কি হতে পারে? আমার ৭০ বছরের আমল হলো সুতায় লটকানো পাতার মতো যাকে বাতাশ কাপাচ্ছে। জানি না এই বাতাশ খোদা থেকে বিচ্ছেদের বাতাশ না খোদার সাথে মিলানোর বাতাশ। আমার এক দিকে পুল ছিরাত অপর দিকে আজরাইল। বিচারক যিনি তিনি ন্যায় পরায়নতার গুণে গুণান্বিত। তিনি অন্যায় বিচার করেন না। রাস্তা আমার সামনে জানা নাই আমাকে কোন রাস্তা দিয়ে নেওয়া হবে। (ইল্লিয়ীনের দিকে না সিজ্জিনের দিকে)

মৃত্যু যখন একদম নিকটবর্তি হয়ে গেল তখন কোরআন খতম করে সুরা বাকারার আরো ৭০ আয়াত পড়েন। অতপর লোকেরা তাঁকে আল্লাহ আল্লাহ বলার জন্য বলল। তিনি বললেন আমি তো আল্লাহকে ভুলি নাই। অতপর নিজে নিজে আঙ্গুল গুণে তাছবীহ পড়তে শুরু করলেন। চার আঙ্গুল গণনা করে বিছমিল্লাহ পড়ে চোখ খুলে তাকালেন আর এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

২৯৮ হিজরীর শাওয়াল মাসের শনিবার দিন মৃত্যু হয়।
লোকেরা গোসল দেওয়ার সময় চোখে যখন পানি পৌঁছাতে চাইল তখন অদৃশ্য আওয়াজ আসল আমার বান্দার চোখ থেকে হাত সরাও। যে চোখ সর্বদা আমার যিকিরে বন্ধ ছিল তা আমার দর্শনের সময় খুলবে। গোসল দাতাগণ তাছবীহ পড়ার সময় যে আঙ্গুলগুলি বন্ধ করে ছিলেন তা খুলতে বহু চেষ্ঠা করেন কিন্তু আঙ্গুল খুলতে পারেন নাই।
যখন লাশ বহন করা হলো তখন লাশের একপাশে একটি সাদা কবুতর এসে বসে গেল। লোকেরা কবুতরকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। এক পর্যায়ে কবুতর আওয়াজ দিয়ে বলল আমাকে এবং তোমরা নিজেদেরকে কষ্টে নিক্ষেপ কর না। আমার ভালবাসার সুতা তাঁর লাশের সাথে বেঁধে আছে। তোমরা চিন্তা কর না জুনাইদের লাশ ফেরেস্তা দ্বারা বেষ্টিত। তোমাদের শুরগোল যদি না হতো তাহলে তাঁর লাশ শুন্যে উড়ে যেত।
এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে বলল মুনকার নাকিরের প্রশ্নের জবাব কিভাবে দিয়েছেন? জুনাইদ বললেন মুনকার নাকির যখন আমাকে প্রশ্ন করলেন مَنْ رَبُّكَ তখন আমি হেসে বললাম যে দিন আল্লাহ বলেছিলেন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ সে দিনই আমি বলেছিলাম بَلٰى আর এখন তোমরা জিজ্ঞাস করছ, তোমার রব কে? যে বাদশাকে প্রশ্নের জবাব দিয়েছে সে কি আর গোলাম কে প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পায়? আজও আমি জবানে বলছি اَلَّذِىْ خَلَقْتَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْن যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই পথ দেখিয়েছেন। আমার এসব কথা শুনে তারা একথা বলে চলে যান এই ব্যক্তি এখনো খোদা প্রেমে মত্ত রয়েছে।
জাফর খুলদী তাঁর কিতাবে লেখেন

رَئَيْتُ جُنَيْنَةً فِى النَّوْمِ فَقُلْتُ لَهُ مَا فَعَلَ الله بِكَ؟ قَالَ طَاحَتْ تِلْكَ الْاِشَارَتُ وَغَابَتْ تِلْكَ الْعِبَارَتُ وَفُنِيَتْ تِلْكَ الْعُلُوْمُ وَنَفَدَتْ تِلْكَ الرُّسُوْمُ وَمَا نَفَعْنَا اَلَّا رُكَيْعَاتٌ كُنَّا نَرْكَعُهَا فِىْ السَّحْرِ

অর্থ: আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললাম খোদা তোমার সাথে কিরূপ আচরন করেছেন? জুনাইদ বললেন আমায় দয়া করেছেন। সকল ইলমে মারেফাতকে বেকার করে দিয়েছেন। আমি যেভাবে ধারণা করেছি সেভাবে হিসাব নিকাশ হয়নি। নবুওয়াতি জ্ঞান বিজ্ঞান যা অর্জন করেছিলাম সবগুলোকে মাথায় নিয়ে

নিচু হয়ে নিরব রইলাম। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। অবশেষে তাহাজ্জুদের দুই রাকাত নামাজের আমলই একমাত্র কাজে আসে।
হারিরী বলেন আমিও স্বপ্নে দেখতে পেয়ে এমন প্রশ্ন করলাম। জুনাইদ বলেলেন তাহাজ্জুদের দুই রাকাত নামাজ আমাকে উপকার প্রদান করেছে।
একদা শিবলী (রাহ:) তাঁর কবরের পাশে দাড়ানো ছিলেন। ইত্যবসরে একজন এসে একটা মাসআলা জিজ্ঞাস করল। তিনি জবাব না দিয়ে বললেন

اِنِّىْ لَاتَحْيَيْتُه فِىْ التُّرَابِ بَيْتُنَا-كَمَا كُنْتُ اسْتَحْيَيْتُه وَهُوَيَرَانِىْ

কবিতার মর্মার্থ হলো আল্লাহ ওয়ালাদের জীবন মরণ সমান। জুনাইদের জিবদ্দশায় তাঁর সামনে মাসআলা বলতে যেমনটা লজ্জা লাগত তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর কবরের সামনে মাসআলা বলতে লজ্জা পাচ্ছি।
(জাহিরুল আসফিয়া ৩৪৯-৩৫০)

মুহাম্মদ বিন সিমাক

আবু জাফর রিবয়ী বলেন মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর মুহাম্মদ বিন সিমাক কে দেখতে গেলাম। তখন তিনি মুনাজাত করছিলেন

اَللّٰهُمَّ اِنِّى وَاِنْ كُنْتُ اَعْصِيْكَ لَقَدْ كُنْتَ اَحَبَّ فِيْكَ مَنْ يُّعْطِيْكَ

হে আল্লাহ আমি স্বীকার করতেছি যে, আমি গুণাহগার তবু তোমার নেক বান্দাদেরকে তোমার কারণে ভালোবাসি।
১৮৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান।
(সিফাতুস সাফওয়া)

শায়খ আলী বিন সাহল ইস্পাহানী (রাহ:)

তিনি লোকদেরকে লক্ষ করে বলতেন তোমরা কি ধারনা কর অন্যান্য লোকের মত আমি মরব? অন্যান্য লোকের ন্যায় অসুস্থ হয়ে মরব না। বরং আমাকে ডাকা হবে হে আলী, এটুকুই বলা হবে। সাথে সাথে চলে যাব। অবশেষে তাহার অবস্থা এমনই হল। একদিন কোথায় যাচ্ছিলেন হঠাৎ বললেন লাব্বাইক (আমি হাজির) বলার সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন।
তাহার সাথি শায়খ আবুল হাছান মুজানী (রাহ:) বলেন মৃত্যুকালে আমি তাকে বললাম বলুন اشهد ان لا اله الاالله একথা বলতেই তিনি মুচকি হেঁসে বললেন আমাকে কালিমা পড়তে বলছ? আল্লাহর কছম আমার ও আল্লাহর মধ্যে

173

সম্মানের পর্দা ছাড়া আর কোন দূরত্ব নাই। একথা বলেই তিনি মারা যান। অতপর আবু হাছান নিজ দাড়ি ধরে বলেন, হায়! আমার মত একজন নাপিত আল্লাহর এক প্রিয় বান্দাকে কালিমার তালকিন করলাম। একথা বলে অঝোরে কাঁদতে থাকেন।
(জাহিরুল আসফিয়া ৪১১)

শায়খ হুসাইন বিন মনছুর আল-হাল্লাজ (রাহঃ)

বর্ণিত আছে তাকে যখন বন্দি করা হলো তখন রাত্রি বেলা জেল পাহারাদার ভিতরে এসে দেখে ভিতরে কেহ নাই। শুধু জেল খানা পড়ে আছে। ২য় রাত পাহারাদার দেখে মনছুর হাল্লাজ ও নাই জেলখানা ও নাই। ৩য় রাত মনছুর হাল্লাজকে পাওয়া গেল, তাকে জিজ্ঞাস করা হল প্রথম রাতে শুধু জেল খানা দেখা গেল আপনাকে পাওয়া যায়নি। ২য় রাতে জেলখানাও দেখা গেল না আপনাকেও না। আজ জেলখানা এবং আপনাকে বিদ্যমান দেখতে পাচ্ছি কারণ কি? মনছুর বললেন প্রথম রাতে আমি আল্লাহর দরবারে ছিলাম। ২য় রাতে এখানে জেলখানার দরবার হয়ে গিয়েছিল, ফলে কয়েদখানা বাহ্যিক ভাবে দেখা যায়নি। এখন শরীয়ত হেফাজতের জন্য আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
মনছুর হাল্লাজ রাত-দিনে হাজার রাকাত নামাজ জেলে থেকে পড়তেন। লোকেরা বলল আপনি নিজেকে হক (খোদা) বলেন তাহলে নামাজ কার জন্য পড়েন? মনছুর বলেন আমিই আমার নিজের সম্মান জানি।
এক রাতে জেলখানাতে ৩ হাজারের মত লোক বন্দি ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন তোমাদেরকে মুক্তি করে দিব কি? তাহারা বলল কিভাবে মুক্ত করবেন? যদি মুক্ত করার কোন ক্ষমতা থাকে তাহলে নিজেকে আগে মুক্ত কর। মনছুর হাল্লাজ বললেন আমি আল্লাহর বন্ধনে বন্দী আমি যদি চাই তাহলে ইঙ্গিত করার সাথে সাথে সকল বেড়ী গুলো খুলে যাবে, একথা বলে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেই সকল বেড়ী শিকল ভেঙ্গে গেল। এবার লোকেরা বের হবে কিভাবে জেলের দরজা তো বন্ধ। তখন ২য় বার ইশারা করলেন সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। মনছুর বললেন পথ ধরে চলে যাও। লোকেরা বলল আপনি যাবেন না? মনছুর বললেন আল্লাহ সাথে আমার গোপনে এক সম্পর্ক আছে। যেটাকে ক্ষমতা বলে।

২য় দিন তাকে জিজ্ঞাস করা হলো কয়েদীরা কোথায়? মনছুর বললেন সবাইকে আমি মুক্ত করে দিয়েছি। তাকে জিজ্ঞাস করা হলো তাহলে তুমি রয়ে গেলে কেন? উত্তরে বললেন আমার প্রতি আল্লাহার গোস্বা রয়েছে। এ সংবাদ বাদশাহর কাছে পৌঁছার পর বাদশাহ বললেন তাকে হত্যা কর অথবা তাহাকে বেত্রাঘাত করেও ফিৎনা থেকে বিরত রাখতে হবে। অবশেষে তাকে জেল থেকে বের করে তিন হাজার বেত্রাঘাত করা হলো। প্রহারকারী বলেন যখন আমি তাহাকে প্রহার করি তখনই আওয়াজ শুনতে পাই।يا ابن منصور لا تخف হে মনছুরের পুত্র ভয় করনা।

পীর আব্দুল জলীল ছাফার বলেন, ঐ প্রহারকারির ব্যাপারে মনছুর বিন হুসাইন এর তুলনায় আমার বিশ্বাস প্রবল ছিল যে ঐ লোকটি শরীয়ত পাবন্দীর বেলায় অত্যন্ত মজবুত। যদ্দরুন এমন আওয়াজ শুনার পরও কিন্তু তাকে প্রহার করা থেকে বিরত থাকে নাই।

মৃত্যুর দুয়ারে মনছুর (রাহঃ)

বেত্রাঘাত শেষে তাঁকে ফাঁসির কাষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম ছিল। তিনি চোখ খুলে চতুর্দিকে চেয়ে বলতে থাকলেন

حق-حق-حق- اناالحق এসময় এক দরবেশ এসে মনসুরকে বলল এশক কি জিনিস? তিনি বললেন আজকের দিন কালকের দিন এবং পরশু দিন দেখবে এশক কি জিনিস। পরে দেখা গেল ঐ দিনই তাকে মারা হয়। ২য় দিন তাকে জালানো হয়। ৩য় দিন ছাইগুলো বাতাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এটাই হলো এশক বা খোদা প্রেম।

ফাসিতে ঝুলা অবস্থায় তার খাদেম বলল আমাকে কিছু ওসিয়ত করেন, মনসুর বললেন নিজের নফসকে যে কোন কাজে ব্যস্ত রাখিও, নতুবা নফস তোমাকে কোন এক কাজে ব্যস্ত করে দিবে। নিজেকে আয়ত্বে রাখা শক্তিশালিদের কাজ। ছেলে এসেও বললেন আমাকে ওসিয়ত করুন। মনসুর বললেন যখন গোটা জগতবাসী নেক কর্ম করে তখন তুমি এমন কোন কাজের চেষ্টা কর, যাহার অনু পরিমাণ সমস্ত জিন ইনসানের আমল থেকে উত্তম। ফাঁসির স্থানে যাওয়ার সময় তাহার শরীরে বেড়ি লাগানো।

আর তিনি অত্যান্ত দর্পভরে হাত নাচিয়ে চলতে থাকলেন। লোকেরা বলল এভাবে দর্পভরে হাত নেড়ে যাচ্ছেন কেন? তিনি বললেন আমি মরনঘাটে যাচ্ছি একথা বলে উচ্চ আওয়াজে বললেন-

نديمى غير منسوب الى شئ من الحيف+ سقانى مثل ما يشرب كفعل الضيف بالضيف

فلما دارت الكأس دعا بالنطع واليف+ كذا من يضرب الداح من التين بالضيف

তাঁকে ফাঁসি কাষ্ঠের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ফাঁসির দড়িতে চুমু দিলেন। লোকেরা বলল আপনার অবস্থা কি? মৃতদের উর্দ্ধগমন মাথার কাছে। অতপর কোমর বেঁধে চাদর গায়ে দিয়ে কিবলামুখি হয়ে মুনাজাত করলেন।

ফাঁসিতে ঝুলানোর পর মুরীদরা বলল আমাদের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী ? আর যারা নির্যাতন করছে তাদের ব্যাপারে বক্তব্য কী ? মনসুর নির্যাতনকারির দুই ছওয়াব তোমাদের এক ছওয়াব।

যুবক বয়সে একজন মহিলার দিকে তার চোখ গিয়েছিল, যে সময়ের কথা স্মরণ করে ফাঁসির মঞ্চে বলতে থাকলেন, হায়! সে সময় কি হয়েছিল যার শাস্তি এত বছর পর দেওয়া হচ্ছে। অতপর মঞ্চের নিচে তাকিয়ে বললেন যে ব্যক্তি এভাবে উপর দেখে সে নিচও দেখে। হযরত শীবলী (রাহ:) তার কাছে গিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললেন او كم ننهلك عن العالمين অতপর বললেন তাসাওউফ কি? মনসুর বললেন তাসাওউফ হল, যার সর্ব নিম্ন স্তর হল যাহা তুমি এখন দেখছ। শিবলী বললেন উচ্চস্তর কোনটি? মনসুর বললেন সেখান পর্যন্ত পৌছার তোমার রাস্তা নাই।

অতপর সব লোক তাকে পাথর মারতে শুরু করল। শিবলী (রাহ:) ও ফুল দ্বারা ঢিল মারলেন। সবার সাথে সাম্যতা রক্ষা করতে। শিবলী (রাহ:) ফুল দ্বারা ঢিল মারতেই মনসুর কাঁদতে লাগলেন, লোকেরা বলল, সবাই পাথর মারল কাঁদলেন না, শিবলী মারতেই কাঁদতে শুরু করলেন কেন? উত্তরে বললেন অন্য সব লোকেরা অজ্ঞতা বসত মেরেছে। আর শিবলী বুঝে শুনে মেরেছে।

ফাঁসি মঞ্চে যখন তাঁর হাতকে আলাদা করে দেওয়া হল তখন তিনি হাঁসতে লাগলেন। লোকেরা হাসির কারণ জিজ্ঞাস করলে পরে তিনি বললেন আদমের সম্পর্কের থেকে হাত পৃথক করা সম্ভব আরশ ওয়ালার সাথে যে সম্পর্ক আছে তা থেকে হাত পৃথক করা সম্ভব নয়। অতপর পা কাটা হলো তখন ও তিনি

মুচকি হাসলেন কারণ জিজ্ঞাস করা হলে পরে বললেন, এই দুপা দ্বারা দুনিয়া ভ্রমন করেছি, আমার আরো দুটি পা আছে যা দ্বারা আখেরাতে ভ্রমন করব। এখন চলে যাবার সময় দুনিয়ার পা কেটে ফেল। উভয় হাত থেকে যে রক্ত বের হয়েছিল তার কিছু চেহারায় মেখে নেন। এমন করার কারণ জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বললেন অধিক রক্তকরনের কারণে চেহারা হলুদ বর্ণ দেখা যাবে, আর লোকেরা মনে করবে ভয়ে চেহারা হলুদ বর্ণ হয়েছে। তাই চেহারা হলুদ দেখা যেন না যায়, তাই রক্ত দ্বারা লাল করে দিয়েছি।

অতপর লোকেরা বলল চেহারা কে রক্তে রঞ্জিত করার পর পাদুকাদ্বয় রক্তে কেন রঞ্জিত করলেন। মনসুর বললেন আমি ওজু করেছি। বলা হলো কিসের জন্য ওজু? মনসুর বললেন

''رَكْعَتَانِ فِى الْعِشْقِ لَا يَصِحُّ وُضُوْءُهُمَا اِلَّا بِالدَّمِ'' এশকের দুই রাকাত নামাজের জন্য যা ছহিহ হতে হলে রক্ত দ্বারা ওজু করতে হয়।

অতপর চোখ উঠিয়ে ফেলা হল। তখন মানুষের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে গেল। তখন কিছু লোক কাঁদতে লাগলো আর আরো কিছু লোক পাথর মারতে থাকল। এক পর্যায়ে যখন তার জিহ্বা কাটার জন্য তারা উদ্যত হলো। তখন মনসুর বললেন একটু ধৈর্য্য ধর, আমি কথা বলে ফেলি। তখন আসমানের দিকে মুখ উঠিয়ে বললেন, হে প্রভু যে তোমার জন্য এত কষ্ঠ স্বীকার করছে তাকে বঞ্চিত করিওনা তোমার রহমত থেকে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যদি ও আমার হাত পা কাটা হচ্ছে তাতো আল্লাহর রাস্তায় হচ্ছে, যদি শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে আল্লাহর দীদার অবস্থায় বিচ্ছেদ করা হবে। অতপর লোকেরা নাক কান কাটলো আর পাথর মারতে থাকলো।

এবং বৃদ্ধ লোক হাতে পেয়ালা নিয়ে এসে হুসাইন (মনসুর হাল্লাজ) কে দেখে চিৎকার করে বলল তাকে পাথর মার। মানসুর হাল্লাজের শেষ কথা ছিল।

حُبُّ الْوَاحِدِ اِفْرَادُ الْوَاحِدِ حُبُّ الْوَاحِدِ اِفْرَادُ الْوَاحِدِ অতপর আয়াত পড়লেন

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهَا الْحَقُّ.

এ আয়াত তেলাওয়াতের সাথে সাথে জিহ্বা কেটে দেওয়া হয়। মাগরিবের জামাতের সময় বাদশাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসল মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। মুচকি হাসা অবস্থায় মাথা আলাদা করা হল, এবং তিনি মারা যান।

একদিকে লোকেরা শোরগুল করছে অপর দিকে তিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে অর্পন করেন।

এদিকে প্রত্যেকটি অঙ্গ থেকে اناالحق আওয়াজ আসছে। এক পর্যায়ে গর্দান ও পিষ্ঠ ছাড়া সকল অঙ্গগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হলো, তখন গর্দান ও পিষ্ঠ থেক اناالحق উচ্চারিত হলো।

২য় দিন বাদশাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসল এ অবস্থায় রাখা হলে ফিতনা আরো বাড়বে সুতরাং তাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হউক। যখন জ্বালিয়ে ছাই করা হলো তখন ছাই থেকে اناالحق আওয়াজ আসতে থাকল। এ অবস্থা দেখে তার ছাইগুলো দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হলো তখন নদীর পানি থেকে اناالحق আওয়াজ আসল।

মানসুর হাল্লাজ তার খাদিমকে বলেছিলেন যদি আমাকে জ্বালিয়ে ছাই দজলা নদীতে ফেলা হয়, তাহলে বাগদাদে দুর্যোগ আসবে। দিজলা নদীতে ঢেউ সৃষ্টি হয়ে বাগদাদের দিকে ধাবিত হয়ে বাগদাদ শহর ভেসে যাবে। অতএব আমার কাপড়ের টুকরাগুলি পানির কাছে নিয়ে যেও নতুবা বাগদাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। ছাই পানিতে ফেলার পর খাদেম দেখেন সত্যিই সত্যি পানিতে ঢেউ শুরু হয়ে গেছে, তাই সাথে সাথে তাহার কাপড়ের টুকরা পানির কাছে নিয়ে গেল সাথে সাথে পানি স্থির হয়ে গেল। অবশেষে ছাইগুলো জমা করে দাফন করা হলো। আল্লাহ ওয়ালা অন্য কাহার এমন বিজয় হয়নি।

এক বুজুর্গ বলেন দেখ হুসাইন মানসুর এর সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে। এবার তার বিরুদ্ধবাদিদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে জানা নাই।

আব্বাস তুসি রহ. বলেন কিয়ামতের দিন হুসাইন মনসুরকে শিকলে বেঁধে নিয়ে আসা হবে। কারণ যদি তাঁকে খোলা নিয়ে আসা হয় তাহলে কিয়ামতের সমস্ত মাঠকে ধ্বংস করে দিবে।

এক বুজুর্গ বলেন যেই রাতে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয় সে রাতে ফাঁসির মঞ্চের নিচে আমি অবস্থান করে নামাজ পড়লাম। সকাল বেলা একজন ঘোষক আওয়াজ দিয়ে বলল

اطلعناه على سرمن اسررنا فافشى سرنا منهذا جزاء من يفشى سرالملوك

আমরা তাকে এক রহস্য সম্পর্কে অবগত করেছিলাম সে তা প্রকাশ করে দিয়েছিল। অতএব যে বাদশাহর রহস্য প্রকাশ করে তার প্রতিদান এটাই।

শিবলী নোমানী বলেন ঐ রাতে আমি তার লাশের নিকটে যাইয়া সারা রাত নামাজ পড়লাম। সকালে দোয়া করলাম হে প্রভু ইনি একজন একত্ববাদী বান্দা তোমার প্রেমিক ছিলেন। তার উপর এমন মুছিবত কেন দিলেন? এই প্রশ্ন করতেই আমার খুব ঘুম আসল। স্বপ্নে দেখলাম কিয়ামত সংগঠিত হয়েগেছে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন এই ব্যক্তি আমার রহস্য অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে। যে রহস্য আমার পক্ষ থেকে দিজলার পানিতে প্রকাশ করার ছিল সে অন্যের কাছে তা প্রকাশ করে দিয়েছে।

শিবলী বলেন আরেক দিন আমি তাকে স্বপ্নে দেখে বললাম আল্লাহ তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন। হুসাইন মানসুর বললেন, আল্লাহ আমাকে মহা সম্মানের স্থানে দাড় করিয়ে পুরুস্কৃত করেছেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম তোমার পক্ষের বিপক্ষের লোকের সাথে কেমন আচরন করা হয়েছে? তিনি বললেন উভয় দলকে ক্ষমা করেছেন। যারা আমাকে চিনে মহব্বত করেছেন তারাও দয়া প্রাপ্ত হয়েছে, যারা আমাকে চিনতে পারে নাই কিন্তু সত্যের কারনে শত্রুতা রেখেছে তাদের প্রতিও দয়া করা হয়েছে।

অন্য আরেক ব্যক্তি স্বপ্নে হুসাইন মানসুরকে কিয়ামতের মাঠে দন্ডয়মান দেখলেন, হাতে তার পিয়ালা রয়েছে। দেহের মধ্যে মাথা সংযুক্ত নয়। ঐ ব্যক্তি বললেন এমন অবস্থা কেন? জওয়াব আসল মাথা কর্তন কারীদেরকে শরবত পান করানোর জন্য পেয়ালা হাতে দাড়িয়ে আছি।

শিবলী (রাহ:) বলেন হুসাইন মানসুরকে যখন ফাসির দড়িতে লটকানো হলো, তখন শয়তান এসে বলল আমি انا خير বলার কারণে আমার ঘাড়ে ল'নতের বেড়ি লাগল। আর তুমি اناالحق বলে মহা সম্মান লাভ করলে। এই পার্থক্য কেন? হুসাইন মানসুর বললেন তুমি انا নিজের পক্ষ থেকে বলেছ। আর আমি আমার নিজের থেকে আত্মগরিমা বের করে বলেছি। এই জন্য আমার প্রতি রহম করা হয়েছে। তোমার প্রতি লানত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝে নাও انا এর নিয়ত করা ভালো নয়। বরং انا এর নিয়ত দুর করা ভালো।

(জহিরুল আসফিয়া, তাযকিরাতুল আওলিয়া ৪৩৯/৪৪৩)

179

শায়খ ইবরাহিম বিন শহরিয়ার গাজরুনী (রাহ:)

কুতুবুল আউলিয়া শায়খ আবু ইসহাক বিন ইবরাহিম বিন শহর ইয়ার গাজ রুনী (রাহ:) এর শরীর থেকে খুব ঘ্রান বের হতো। আম্বর কুস্তুরীর ঘ্রাণ তার শরীরের ঘ্রাণের সামনে নিভু প্রায় ছিল। কোন বাজার বা রাস্তা দিয়ে গেলে অনেকক্ষন পর্যন্ত ঘ্রান পাওয়া যেত।

বর্ণিত আছে, তাহার হাতে ধরে ২৪ হাজার লোক মুসলমান হয়েছে। ১ লক্ষ মুসলমান তওবা করেছে। আর এই লোকগুলো তাহার মজলিসে আসত। তাহার কাছে রেজিষ্টার খাতা ছিল, যার মধ্যে তওবাকারীদের, মুরীদদের, বন্ধুবান্ধবদের, নিকট আত্মিয়দের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। মৃত্যুকালে তাহার মুরীদরা উপস্থিত হল। তিনি তাদের লক্ষ করে বললেন, অচিরেই আমি চলে যাব দুনিয়া ছেড়ে। আমি চারটি ওসীয়ত করতেছি তা গ্রহন কর।

(১) আমার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে মান্য করবে।

(২) প্রত্যেক সকালে কুরআন পড়বে।

(৩) কোন মুসাফির আসলে তাকে সম্মান করে এখানে রাখার চেষ্ঠা করবে।(৪) পরস্পর ভালোবাসা বজায় রাখবে। আরেকটি ওসীয়ত করলেন তাহা হলো।

রেজিষ্টার খাতায় যার মধ্যে মুরীদ, হিতাকাঙ্খীদের নাম ছিল, তাহা কবরের মধ্যে রেখে দিবে।

মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ কেমন আচরণ করলেন?

তিনি বললেন প্রথম পুরুস্কার যা আল্লাহ দান করেছেন, তা হলো রেজিষ্টারভুক্ত সকল মুরীদ হিতাকাঙ্খীদেরকে আমি সহ মাফ করে দিয়েছেন। অতপর আমি আল্লাহকে বললাম, হে প্রভু যারা কোন প্রয়োজন পুরনে আমার কাছে আসবে আমার জিয়ারত করবে তাদের উদ্দেশ্য পুরা করবে। তাদের প্রতি রহমত করবেন।

(জহিরুল আসফিয়া ৪৭৪)

শায়খ আবু আলী আদ দাককাক (রাহ:)

শেষ জীবনে তাহার কথা বার্তা এতো উচুমানের হলো যে, সকলে মর্ম বুঝাটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা তাহার কথাবার্তা শুনার মত সামর্থ রাখত না।

ফলে মজলিসে ওয়াজ শুনার জন্য অল্প সংখ্যা লোক উপস্থিত (১৭ থেকে ১৮ জনের বেশী) হত না।

হযরত আব্দুল্লাহ আনসারী (রাহ:) বলেন, আবু আলীর কথা মালা যখন উচ্চাঙ্গের হয়ে গেল তখন তাহার মজলিসে লোক সমাগত থেকে খালি হয়ে পড়ল। তাহার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি সর্বদা বলতেন হে প্রভু আমাকে পিপিলিকা ঘাস পাতার ওসিলায় ক্ষমা করে দাও।

তিনি আরো বলতেন এসকল গুনাহগারদের সামনে মজলিসে অহংকার প্রদর্শনের কারণে আমাকে লজ্জিত করনা। আমাকে সুফিদের পোষাকের মধ্যে ছেড়ে দাও। হাতে লাঠি ও পেয়ালা দিয়ে দাও। কারণ সুফিদের দলের প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে। এখন আমাকে কাপড়ের খন্ড ও লাটি সমেত দুজখের কোন একটি নলায় ফেলে দাও। যাতে সর্বদা তোমার বিচ্ছেদের রক্ত পান করতে থাকি।

কখনোও বলতেন, হে প্রভু আমাদের আমলনামা গুণাহ দ্বারা কালো করে দিয়েছি। আপনি আমাদের চুল দুনিয়াতে সাদা করে দিয়েছেন। হে সাদা কালোর স্রষ্টা, আমাদের কালো আমলনামাকে সাদা করে দাও। তোমাকে ভালো করে যে চিনেছে, সে তোমাকে পাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেনা। যদিও সে নিশ্চিত জানে যে তোমাকে পাবেনা। হে প্রভু আমি বিশ্বাস করি আপনার দয়া অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে বেহেস্তের সুউচ্চস্থানে দাড় করাবেন। কিন্তু আমার আক্ষেপ, তোমার ইবাদতে আমি ত্রুটি করেছি।

শায়খ আবলু কাছিম কুশাইরি বলেন, আমি আবু আলীকে তাহার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলাম আল্লাহ কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন যে সকল গুণাহ আমি স্বীকার করেছি তাহা মাফ করে দিয়েছেন। তবে একটি গুেণাহের স্বীকারুক্তীর সময় লজ্জায় আমি ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ি এমনকি আমার চেহারা থেকে সকল গোস্ত পড়ে যায়। গুণাহটি হলো ছোট বেলা এক সুদর্শন বালকের প্রতি আমার চোখ সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আর তাকে আমার কাছে ভালো লাগত। অন্য আরেক বুজুর্গ স্বপ্নে তাকে অত্যান্ত পেরেশান অবস্থায় কাঁদতে দেখলেন বুজুর্গ বললেন আপনার কি হয়েছে? দুনিয়াতে আবার আসতে চান? বললেন হ্যাঁ তবে নিজের সংশোধনের জন্য দুনিয়াতে আসতে চাইনা বরং কমর

বেধে মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরব আর বলব গাফলতি ছেড়ে দাও, কারণ তোমরা জাননা কোন কাজ থেকে বিরত থাকা আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
আরেক ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে দেখে বললেন আপনার অবস্থা কি? তিনি বললেন আমার সকল ভালো মন্দ কর্ম চুলচেরা হিসাব নিকাশ হয়েছে। অতপর ক্ষমার পাহাড় আমার সামনে রাখা হয়েছে। (জহিরুল আসফিয়া ৫৬১/৫৬২)

বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ:)

এ মহান মনিষী দীর্ঘ দিন জগতবাসিকে জাহেরী বাতেনী কামালাত দ্বারা উপকৃত করেন এবং মুসলিম বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতায় এবং আল্লাহর দিকে মনযোগী হওয়ার আসক্ততা সৃষ্টি করে ৫৬১ হিজরীতে ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর সন্তান শরফউদ্দিন ঈসা তাঁর মৃত্যুকালিন অবস্থার বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন তিনি মৃত্যুকালিন অসুস্থতায় আক্রান্ত হন, তখন অপর সন্তান শায়খ আব্দুল ওয়াহাব পিতাকে কিছু ওসীয়ত করতে বলেন, যাহা তার মরণের পর আমল করা হবে। আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ:) বললেন, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে। তাকে ছাড়া কাউকে ভয় করবে না এবং কাহারো উপর ভরসা রাখবেনা। সবকিছু তাহার কাছে চাইবে। তাওহীদের উপর অটল থাকবে।
আরো বলেন যখন অন্তর আল্লাহর সাথে সঠিক ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে তখন তার মধ্যে কোন জিনিস বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবেনা। অতপর নিজ সন্তানদেরকে বললেন আমার পাশ থেকে সরে যাও, আমি বাহ্যিক তোমাদের সাথে আছি। আত্মিক ভাবে অন্যদের সাথে আছি। তোমরা ছাড়া আমার সামনে ফেরেস্তারাও উপস্থিত আছেন। তাদের জন্য জায়গা খালি করে দাও তাদেরকে সম্মান কর। এখানে অনেক রহমত নাজিল হচ্ছে, ফেরেস্তাদের জন্য জায়াগা সংকির্ণ কর না।
তিনি বারবার বলতেছেন, তোমাদের প্রতি আল্লাহার পক্ষ থেকে শান্তি রহমত বরকত নাজিল হউক। আমার ও তোমাদের তওবা কবুল করুন। বিছমিল্লাহ আস, আর যেওনা এরকম কথা একাধারে একদিন একরাত বললেন। আরও বললেন এই মুহুর্তে কোন ফেরেশতা অথবা মালাকুল মাউতের ব্যাপারে আমার কোন পরওয়া নাই, আমাদের রব আমাদের কে বহু কিছু দিয়ে রেখেছেন।

182

ইন্তেকালের দিন ভয়াবহ একটি চিৎকার করেন। তাহার সন্তানদ্বয় শায়খ আব্দুর রাজ্জাক এবং শায়খ মুসা বলেন ঐ দিন বারবার উভয় হাত উঠিয়ে প্রসারিত করে বলেন, তোমাদের উপর শান্তি রহমত বরকত বর্ষিত হউক। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। সারির ভিতর প্রবেশ কর। এখনি আমি আসছি।

তিনি আরো বলেন নম্র ব্যবহার কর। অতপর যখন মৃত্যুযন্ত্রণা প্রবল হলো, তখন বলতে থাকলেন আমার এবং তোমাদের এবং সকল মাখলুকের মধ্যে আসমান জমিন পার্থক্য আমাকে কাহারো সাথে তুলনা করনা।

মৃত্যুকালে তাঁর সন্তান শায়খ আব্দুল আজিজ তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জিলানি (রাহ:) বললেন আমাকে কিছু জিজ্ঞাস কর না। আমি আল্লাহর ইলমে ডিগবাজি খাচ্ছি।

অতপর শায়খ আব্দুল আজিজ অসুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জিলানী (রাহ:) বললেন আমার অসুস্থতার বিষয় কেউ জানে না, আর এটা বুঝবেওনা। আল্লাহর আদেশ দ্বারা আল্লাহর ইলম উলট পালট হয় না। আল্লাহ যাহা চান তা মিঠিয়ে দেন যা রাখার তা রাখেন। তিনি যাহা করেন তাহার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু মাখলুক জিজ্ঞাসিত হবে।

অতপর তাঁর অপর সন্তান শায়খ আব্দুল জব্বার জিজ্ঞাসা করলেন শরীরের কোথায় কষ্ট পাচ্ছেন? তিনি বললেন সর্বাঙ্গে আমার কষ্ট হচ্ছে। তবে আমার অন্তরে কোন কষ্ট নাই, তাহা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত আছে।

শেষ মুহুর্তে তিনি বললেন, আমি সাহায্য চাই সেই প্রভুর কাছে যিনি পবিত্র, যার কোন শরীক নাই, যার মরন নাই। যিনি নিজ কুদরত দ্বারা সম্মান প্রকাশ করেন। আর মৃত্যুঘটিয়ে বান্দার উপর ক্ষমতা প্রকাশ করেন। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসুল।

তাঁর সন্তান শায়খ মুসা বলেন, মৃত্যুকালে জিলানী (রাহ:) تعزز শব্দ বার বার বলতে চাইলেন। কিন্তু মুখ থেকে সঠিক ভাবে শব্দ উচ্চারিত হয় না। বারবার চেষ্টা করছেন। একপর্যায়ে উচ্চ আওয়াজে শক্ত ভাবে تعزز (সম্মানিত হওয়া) শব্দটি সঠিক ভাবে উচ্চারণ করেন।

অতপর তিনবার আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ বলেন। তার পর জিহ্বা তালুর সাথে লেগে যায় তার রুহ বের হয়ে যায়।

(তারিখে দাওয়াত ও আজিমাত ১ম খন্ড ২৬৯-২৭১)

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রাহঃ)

তিনি তাঁর আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে মুসলিম বিশ্বকে ক্রসেডের গোলামীর আশংকা থেকে মুক্ত করে ২৭ সফর ৫৮৯ হিজরীতে ইসলামের এই মহান নেতা পৃথিবী থেকে বিদায় হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৭ বছর। জন্ম ৫৩২ হিজরীতে হয়।

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তাহর মৃত্যুর অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, ২৭ সফরের রাত তাঁর অসুস্থতার ১২তম দিন ছিল। প্রচন্ড অসুস্থতার কারণে নি:শক্তি হয়ে পড়েন। ইমামুল কালাছাহ শায়খ আবু জাফর যিনি অত্যন্ত সৎ একজন ব্যক্তি ছিলেন, বুজুর্গ ছিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন রাতের বেলা তিনি দুর্গে থাকবেন। যদি সুলতানের নির্ধারিত সময় এসে পরে (মৃত্যু) তাহলে তিনি পাশে থাকবেন। তাঁকে কালিমার তালকিন দিবেন।

রাতের বেলায় মনে হলো সুলতান বিদায় বেলার সওয়ারিতে আরোহণ করবেন, শায়খ আবু জাফর তার পাশে বসে কুরআন তেলাওয়াত যিকিরে লেগে গেলেন। এদিকে মারা যাওয়ার তিন দিন আগে থেকে তাঁর অবস্থা ছিল এমন যে, কখনও হুশ থাকত আবার কখনও বেহুশ থাকতেন। আবু জাফর যখন তেলাওয়াত শুরু করলেন তখন কিন্তু সুলতান বেহুশই ছিলেন যখন আবু জাফর তেলাওয়াত করলেন هو الله الذى لا اله الاهو عالم الغيب والشهادة এ আয়াত পড়েতেই হুশ ফিরে আসল। সুলতান মুচকি হেঁসে বললেন ঠিক বলেছ, একথা বলেই মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়েন।

সফর মাসের শেষ বুধবার ২৭ তারিখ ফজরের সময় মৃত্যুবরণ করেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের ইন্তেকালের পর এমন ভয়াবহ দিন আর ইসলামের ইতিহাসে আসেনি। শহর, দুর্গ গোটা পৃথীবীময় ভয় ভীতিতে ছেয়ে গেল। কি পরিমান ভয় ভীতি আতংক ছিল আল্লাহ ভালো জানেন।

বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ বলেন, আমি যখন প্রথম প্রথম শুনতাম একজন লোক অপরজনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেয় তখন এটাকে কল্পনার বিষয় মনে করতাম। কিন্তু সুলতানের মৃত্যুর দিন বুঝলাম এটা কল্পনা নয় বাস্তবে এমন হয়। স্বয়ং আমি এবং আরো অনেকে এমন ছিলাম যদি সম্ভব হত তাহলে সুলতানের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিতাম। সুলতানের প্রাণের ফিদয়া স্বরূপ নিজেকে পেশ করতাম।

184

সুলতান মৃত্যুকালে মাত্র ৪৭ দিরহাম ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসেবে রেখে যান। কোন দেশ জায়গা বাগান ক্ষেত খামার কিছু রেখে যান নাই। তাহার কাফন দাফনে একটি পয়সাও তাঁর মিরাছ থেকে ব্যয় হয়নি বরং ঋণ করে করা হয়েছে। এমনকি কবরের ঘাসের কলি পর্যন্ত ঋন করে আনা হয়েছে। কাফনের ব্যবস্থা করেন, তাঁর উজীর ও কাতিব, কাজী, হালাল বৈধ পন্থায়।
(তারীখে দাওয়াত ও আজিমাত ১ম খন্ড ৩৩৭-৩৩৮)

মির্জা মাযহার জানে জানা (রাহঃ)

তাঁর বয়স যখন ৮০ বছর পার হলো তখন থেকে বেশিরভাগ সময় আখেরাতের আলোচনা করতেন এবং উত্তম মৃত্যুর কামনা করতেন। শাহাদতের কামনা করতেন। (মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরাইচির মামুলাতে মাযহারিয়্যাহ ৩৬ পৃষ্ঠা)
তখন থেকে তাঁর ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। মুরীদদের কাছ থেকে যে সকল চিঠি পত্র আসত সেগুলোর জবাবে তিনি শেষ সময়ের দিকে ইশারা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক এর কাছে প্রেরিত চিঠিতে লেখা ছিল, বিদায়ী যাত্রার সময় নিকটবর্তি হয়ে গেছে। বয়স ৮০ পার হয়ে গেছে। সাক্ষাতের সুযোগ নাই বিধায় চলাফিরারও শক্তি নাই।
(মাকামাতে মাযহারী শাহ গোলাম আলী ৬০)
আরো এক চিঠিতে উল্লেখ আছে তিনি লিখেছেন,
আমার সম্মানিত পিতা যিনি হাজারো গুণের অধিকারি ছিলেন, তাঁকেও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আমিও আমার পিতা সমকালের ছিলাম। দুনিয়ায় আগমন হিসাবে আমার আর তাঁর মধ্যে ব্যবধান তৈরী হয়েছে। তিনি এখন আসল ঠিকানার দিকে চলে গেছেন। আমিও চলে যাব।
অতপর একটি কবিতা লিখেন। যার অর্থ হল আজ যদি গত হয়ে যাওয়া বন্ধুদের কোন খবর না মিলে আগামিকাল আসলেতো আরো দূরত্ব সৃষ্টি হবে। ঠিক এভাবে আমাদের ও কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবেনা।
একদিন এক মুরীদ এসে তাঁকে বলল, আমার পিতা আপনার শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য হাছিল করেছেন, আমিও এমন চাই। মির্জা (রাহঃ) বললেন এখন এ সকল কথার পুর্ণতার সুযোগ নাই। যে সময় এখন আল্লাহর স্বরণে অতিক্রান্ত হবে তাই গনীমত। আজকালের মধ্যে আমার বিদায়ের সংবাদ শুনবে।

185

একথা বলে একটি কবিতা তাঁকে স্বরণার্থে লিখে দেন। যার অর্থ হল, মানুষ বলে মির্জা মাযহার মারা গেছে, অথচ মির্জা মাযহার মুলত ঘরে চলে গেছে। (মামুলাতে মাযহারী ১৩৯পৃষ্টা)

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ

মামুলাতে মাযহারীর লেখক বলেন, মির্জা সাহেব অধিকাংশ সময় বলতেন আমার আশ্চর্য লাগে মানুষ মৃত্যুকে কেন ভয় করে? অথচ হাদিসে বর্ণিত আছে রূহ দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর আল্লাহ ও তার রাসুলের দর্শনের তাওফীক লাভ করে। (মামুলাতে মাযহারী ১৩৮)

মির্জা মাযহার সাহেবের খুব আগ্রহ ছিল রাসুল (সা:) আবু বকর, ইমাম হাছান, জুনাইদ বোগদাদী, খাজা বাহা উদ্দিন মুহাম্মদ নকশবন্দী, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী প্রমূখদের রূহের সাথে সাক্ষাতের প্রতি।
(মামুলাতে মাযহারী ১৩৯)

ছাহেবে মামুলাত লিখেন, মির্জা সাহেব প্রায় সময় বলতেন, যখন আলী (রা:) এর উপর হত্যা করার জন্য আক্রমন হয় এবং তিনি যখম প্রাপ্ত হন তখন ইমাম হাছান (রা:) কে ওসিয়ত করেছিলেন যদি আমি সুস্থ হই তাহলে অপরাধি থেকে বদলা নেওয়া আমার কাজ। হত্যাকারি থেকে কিছাছ গ্রহন করা যাবে না। আর যদি আল্লাহ আমাকে শাহাদত দিয়ে দেন তাহলে আমার রক্তের বদলা নিবে না। অতপর মির্জা সাহেব অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললেন, যুবক বয়সে শাহাদতের কত আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু লাভ হয়নি। এই বৃদ্ধ বয়সে কিভাবে হাছিল হবে? এই প্রশ্ন নিজে করে আবার নিজেই বলতে থাকলেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।
(মামুলাতে মাযহারী ১৩৯)

অবশেষে দেখা গেল আল্লাহ তাকে নিরাশ করেন নাই।

হত্যাকান্ড (যেভাবে তাঁকে হত্য করা হলো)

একদা এক মহররম মাসে মির্জা সাহেব তার মুরীদদের নিয়ে স্বস্থানে বসে আছেন। হঠাৎ ঐ স্থান দিয়ে একটি মহররমের তাজিয়া মিছিল অতিক্রম হলো। মির্জা সাহেব মুরীদদেরকে লক্ষ করে বললেন, যে বিষয়টি ১২ শত বৎসর পুর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, সেটাকে স্বরণ করা কি বেদআত নয়। কাষ্ঠ-লাকড়ি সমুহকে

186

সালাম করা এটাতো স্বল্প বুদ্ধির পরিচয়। মির্জা সাহেবের এ সকল কথা মিছিল পালনকারিদের কানে পৌঁছে। তাঁর এগুলো ইমাম বাড়াত ও মাহফিলগুলোতে তিন চার দিন আলোচনা করল।
(গুলসানে হিন্দ ২১৭)
৭ই মুহররম ১১৯৫ হিজরীর বুধবার দিন। রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কয়েকজন ব্যক্তি তাহার গৃহের দরজায় এসে কড়া নাড়ল। খাদেম এসে মির্জা সাহেবকে বলল কিছু লোক সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। মির্জা সাহেব মুচকি হেঁসে বললেন তাদেরকে ডেকে নিয়ে আস।
প্রথমে তিন ব্যক্তি ঘরে ঢুকল। একজন ছিল ইরানী মোঘল বংশীয়। সে বলল আপনি কি মির্জা জানে জানা? তিনি বললেন হ্যাঁ। উভয় সাথিও সত্যায়ন করল। তখন ঐ মোঘল ইরানী লোক ছোট অগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ফায়ার করল। গুলি বাম দিকে কলিজায় লাগে। ফলে তিনি একদিকে পড়ে যান। আর তারাও পলায়ন করল।
(গুলসানে হিন্দ ৬১)
মির্জা সাহেব এমন আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে টেনে উপরের তলায় পৌঁছান।
(গুলশানে হিন্দ)
অন্যত্র বর্ণিত কুদরত উল্লাহ গুপামাবী বলেন মির্জা সাহেব একদিন তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য উঠেন। তখন কোন এক ঘাতক তাকে তার গুলির নিশানা বানাল।
(নাতায়িজুল আফকার ৬৭৫)
কিন্তু শাহ গোলাম আলী যিনি মির্জা সাহেবের মহান খলিফা এবং শেষ সময়ে সব সময় সঙ্গী ছিলেন।
তাঁর বর্ণনা হলো আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি কষ্ট ও বেদনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। আর এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করছিলেন।
যার মর্মার্থ হলো-
মাটি ও রক্তের মধ্যে কাতরানোর উত্তম প্রচলনের ভিত্তি রাখা হয়েছে,
আল্লাহ তা'য়ালা আশিকদের উপরে রহম করুন।
এশ্‌ক অন্তরহীন থেকে রক্তের সয়লাব জারি করে দিয়েছে,
তাঁর কুদরতের উপর আমার গর্ব যে, চুলা থেকে তুফান উঠিয়েছেন।

বর্ণনাকারী হুশিয়ার থাকো, এরকম যেন না হয় যে অন্তরের যখম ঠিক হয়ে যায়,
কেননা এটা তাঁর চোখের তীরের আঘাতের স্মরণ।
এটা রহমের স্থান, আয় আহাজারি ও মাতমের প্রচন্ডতা, আয় অশ্রুর সয়লাব,
আমার স্মরণের ব্যবস্থা এই মাটির আয়ত্বেই রয়েছে।
দানাগুলোর ছিদ্র অবশ্যই তাসবীহ'র নিশান হবে,
আমি জানি আহত অন্তর খোদার সাথে বন্ধুর্ত্ব রাখে।
মুসহাফি বলেন- নিম্নলিখিত কবিতা তাঁর জবানে জারি ছিল। (মুসহাফি, পৃঃ ৫৬)
যার মর্মার্থ হলো-
ওয়াহ ওয়াহ! আমার সংকীর্ণ অন্তরে একটি দরজা খোলে দিয়েছে,
আল্লাহ এই যখমকারীর হায়াতকে লম্বা করে দিন।
প্রায় এক ঘন্টা পর যখন কিছু শান্ত হলেন তখন বললেন আলহামদুলিল্লাহ। দাদা বুজুর্গ আলী (রা:) এর এক রীতি পালন করেছি। তবে ২য় রাত্রি এখনো বাকী আছে হে আল্লাহ আপনার ব্যপক অনুগ্রহতার দ্বারা এটাও পুরা করে দাও। কারণ এটা আমার পুরাতন দাবী। অর্থাৎ যেভাবে আলী (রা:) তিন দিন পর শাহাদত বরণ করেন, তাহার ও শাহাদত যেন আঘাতের তিন দিন পর হয়।
কথিত আছে বাদশাহ শাহ আলম মির্জা সাহেবের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, হত্যাকারিদের তালাশ করে পাওয়া যায়নি। এতএব তিনি যেন হত্যাকারিদের কিছু চিহ্ন বলে দেন যাতে তাদেরকে খুজে বের করে দৃষ্টান্তমুলক সাজা দেওয়া হয়। মির্জা সাহেব জওয়াবে বললেন ফুকারাগন আল্লাহর রাস্তার শহিদ। যে মরে যায় তার হত্যাকারীর কিসাস বদলা কেমনে হয়? যদি কোন সময় অপরাধিকে পাওয়া যায় তাহলে যেন আমার কাছে পাঠানো হয়। আমি যথাযত নিয়মে তার কাছ থেকে বদলা গ্রহন করব। উদ্দেশ্য হলো মির্জা সাহেব তাকে মাফ করে দিবেন। (মামুলাতে মাযহারী ১৪১)
অতপর একটি কবিতা পাঠ করলেন যার অর্থ হল এ হতভাগা মহব্বতের কোন হক আদায় করেনি। কারণ সে হত্যাকারির হাত পায়ের জন্য দোয়া করেনি।
যুল ফিকার দৌলা নবাব নজফ খাঁন চিকিৎসার জন্য এক সার্জারি ডাক্তারকে মির্জা সাহেবের কাছে পাঠান। মির্জা সাহেব ডাক্তারকে যুল ফিকার দৌলতের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিলেন আর বললেন যদি আয়ূ বাকী থাকে তাহলে

মুসলমান চিকিৎসকের কাছে আরোগ্য লাভ করব। আর যদি আয়ূ শেষ হয়ে যায় তাহলে ঐ সকল কাফেরদের (হত্যাকারীদের) অনুগ্রহকে কেন গ্রহণ করব? (মাকামাতে মাজহারী ৬১)
অতপর একটি কবিতা পাঠ করলেন যার অর্থ হল বিনা প্রার্থনায় যদি জীবন পাওয়া যায় তাহলে অসুবিধা নেই। আমি ধন্যবাদ জানাই ঐ ব্যক্তির দৃঢ় ইচ্ছাকে যে কোন ডাক্তারের অনুগ্রহ গ্রহণ করে।

শাহাদত

মাকামাতে মাজহারীর লিখক বলেন, মির্জা সাহেবের দুর্বলতা এতই বাড়ল যে আওয়াজ করতে পারছেন না। আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ৩য় দিন শুক্রবার ফজর নামাজের পর আমাকে বললেন আমার এগার ওয়াক্তের নামাজ কাযা হয়ে গেছে এবার আমি কি করি? একদিকে সমস্ত শরীর রক্তাক্ত, মাথা উঠাতে পারছিনা। মাসআলা তো হলো যদি অসুস্থ ব্যক্তি মাথা ও যদি উঠাতে না পারে তাহলে তার নামাজ মওকুফ করে দেওয়া উচিত। ইশারায় নামাজ পড়বেনা। অতএব এব্যাপারে তোমাদের মতামত কি?
আমি বললাম মাসআলা উহাই যা আপনি বর্ণনা করেছেন। অর্ধ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উভয় হাত উঠিয়ে মির্জা সাহেব কিছুক্ষন সুরা ফাতেহা পড়লেন। আছরের সময় আমি তাহার কাছে ছিলাম। আমাকে বললেন দিনের আর কত সময় বাকী আছে? আমি বললাম এখনো কিছু সময় বাকী আছে। মির্জা সাহেব বললেন এখনো মাগরিবের সময় বাকী আছে? ঐ দিন ১০ মহররম সোমবার মাগরিবের সময় তিন বার জোরে শ্বাস নিলেন। এবং সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। (মামুলাতে মাজহারী ৪১)
এ ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য ধরণের সাদৃশ্য পাওয়া গেল। তা হল একদিক দিয়ে মহররমের তাজিয়া মিছিল চলল অপর দিকে মির্জা সাহেবের লাশ নিয়ে সকল ভক্তবৃন্দ জানাযায় গেল। জানাযার নামাজ কোথায় হয় ? কে পড়ান তা জানা যায়নি। জানাযার নামাজের পর তাহার স্ত্রীর খাস মহলে দাফন করা হয়। (মামুলাতে মাজহারী ৪১)
মির্জা সাহেব তাহার ওসিয়তনামায় লিখেছেন আমার স্ত্রী আমার কাছে দরখাস্ত করেছিলেন, আমি যেন নিজের পরকালিন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তার মতামতের উপর ছেড়ে দেই। আমি এটা জবান দ্বারা স্বীকারুক্তি করেছিলাম। কিন্তু অজ্ঞান

189

অবস্থায় পড়ে থাকার দিনগুলিতে আমার মালিকানায় কোন ভুমির অংশ ছিল না। অবশেষে তিনি একটি আলীশান ঘর ক্রয় করেন। এ কারণে আমি তার প্রতি অত্যন্ত নাখোশ হলাম। অতএব আমার স্ত্রী যদি ঐ স্থানে আমাকে দাফন করতে চায় তাহলে আমার বন্ধু বান্ধবদের উপর আমার হক হলো তারা তা যেন গ্রহন না করে। তবে তার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রেখে অন্য কোথায় ও দাফন করিও।

এত স্পষ্ট ওসিয়ত করার পরও তাঁর চাহিদার বিপরীত স্থানে দাফন করা হয়। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা নয়ীমুল্লাহ বলেন, ওসিয়ত নামাটি কাজী ছানাউল্লাহ পানিপতির কাছে ছিল। স্ত্রীর বালাখানায় এই নিয়তে দাফন করা হয়েছে যে, ওসিয়ত নামা দেখার পর অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে। কিন্তু পরবর্তিতে ওসিয়ত নামা দেখে স্থানান্তর করতে চাইলে স্বপ্নযোগে মির্জা সাহেব বাধা প্রদান করলেন।

(মির্জা জানে যান আওর উন কা কালাম ৬৬-৭২)

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রাহ:)

খাজা মুহাম্মদ কশমী লিখেন ১০৩২ হিজরীতে মুজাদ্দিদে (রাহ:) আজমীর আগমন করেন। একদিন বললেন আখেরাতের ছফর নিকটবর্তি। স্বীয় সন্তান তখন সিরহিন্দ ছিলেন, তাঁর কাছে চিঠি লিখেন আখেরাতের ছফর নিকটে। তাঁর সন্তান আছে দূরে। এই চিঠিটা পাওয়ামাত্র সন্তান সিরহিন্দ থেকে আজমীর এসে উপস্থিত হন। একদিন উভয় সন্তান খাজা সায়্যিদ ও মুহাম্মদ মাছুমকে নিয়ে নিভৃতে ডেকে বললেন, আমার এখন এই পৃথিবীর প্রতি কোন আকর্ষণ নাই। এখন পরকালের ধ্যান প্রবল হয়েছে। ছফরের সময় নিকটবর্তি মনে হচ্ছে। (যুবদাতুল মাকামাত ২৮২)

মুজাদ্দিদ (রাহ:) সৈন্য বাহিনীর কাছে অবস্থান থেকে ফিরে এসে সিরহিন্দে ১০ মাস ৮ দিন বা ৯ দিন অবস্থান করেন। (হযরত মুজাদ্দিদ আওর উন কা নাকিদিন ১৬৪/১৬৫)

মৃত্যু নিকটবর্তি হওয়ার অবগতি এবং নির্জনতা

আজমির থেকে সিরহিন্দে যখন আগমন করলেন তখন সকলের সাথে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটালেন। আর নির্জনতা কে বেছে নিলেন। নিজ সন্তান ও দুই একজন

বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই কাছে আসার অনুমতি ছিল না। এই বিশেষ সৌভাগ্যবানদের মধ্যে খাজা মুহাম্মদ হাশিম লাকশামী ও ছিলেন। কিন্তু খাজা মুহাম্মদ হাশিম (রাহ:) মৃত্যুর সাত মাস আগে ১০৩৩ হিজরীর রজব মাসে তাহার পরিবার পরিজনকে দাকন নামক স্থান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য চলে গিয়েছিলেন। এসময় মুজাদ্দিদ (রাহ:) এর খেদমতে হাজির ছিলেন শায়খ বদরুদ্দিন সিরহিন্দি। মুজাদ্দিদ (রাহ:) এর জীবনের শেষ অবস্থার বিবরণ তারই সুত্রে যুবদাতুল মাকামাতে বর্ণনা করা হয়। তাহলো তিনি (মুজাদ্দিদ) পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ আর জুমআ নামাজ ছাড়া বাহিরে বের হতেন না। সরাক্ষণ যিকির আযকার ইস্তেগফারে ব্যস্ত থাকতেন। وتبتل اليه تبتيلا উক্ত আয়াতের নমুনা ছিল তাহার মধ্যে।

জিলহজ্বের মধ্যবর্তি দিন থেকে শ্বাস কষ্ট বেড়ে গেল। আহাজারী কান্নাকাঠি বৃদ্ধি পেল। যখন অধিক কষ্ট অনুভুত হত তখন اللهم الرفيق الاعلى পড়তেন। মাঝে মধ্যে আবার সুস্থতা অনুভব করতেন। একদিন বললেন অধিক কষ্টের মুহুর্তে যেই স্বাধ অনুভব হয়, তা সুস্থতার সময় ও অনুভুতি হয়না।

অসুস্থকালে অনেক বেশী দান খয়রাত করতেন। মুহাররামের বার তারিখে বললেন আমাকে বলা হয়েছে ৪৫ দিনের ভিতরে এ পৃথিবী থেকে আখেরাতের দিকে সফর করানো হবে। আমার কবর কোথায় হবে তাও দেখানো হয়েছে।

একদিন তাহার সন্তানরা দেখলেন তিনি খুব কান্নাকাটি করছেন, তারা এর কারণ জিজ্ঞাস করল। মুজাদ্দিদ (রাহ:) বললেন মৃত্যুর প্রতি আসক্ততার কারনে। সন্তানরা বললেন আমাদের প্রতি এ অমনযোগীতা কেন? বললেন আল্লাহ আমার কাছে তোমাদের চাইতে প্রিয়।

সফরের ২২ তারিখ খাদিম ও আত্মীয়দেরকে বললেন আজ ৪০ দিন পুর্ণ হয়ে গেছে। আগামী সাত আট দিনের ভিতরে কি হয় একটু লক্ষ করিও। অতপর আল্লাহর নেয়ামত ও সাহয্যের আলোচনা করতে থাকলেন। ছফরের ২৩ তারীখে তাহার সকল কাপড় চোপড় খাদেমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। শরীরে যেহেতু পশমের কোন কাপড় ছিলনা তাই ঠান্ডা লেগে জ্বর এসে গেল যে ভাবে রাসুলের (সা:) বেলায় হয়েছিল। (সুস্থ হওয়ার পর আবার জরাক্রান্ত হয়েছিলেন) (মুজাদ্দিদ রাহ. এর ক্ষেত্রে এই নিয়মটা পালন হল)

191

এই দুর্বলতার সময়ে তাঁর ইলম বৃদ্ধি পেল। জ্ঞানের কথা আলোচনা করতে থাকলেন। তার সন্তান খাজা মুহাম্মদ সায়্যিদ বললেন আলোচনা এখন মুলতবী করুন। অন্য সময় করবেন। এখন আপনার কষ্ট হচ্ছে। মুজাদ্দিদ (রাহঃ) বললেন অন্য সময়ের জন্য আলোচনা মুলতবী রাখার তো কোন সুযোগ নেই। এই সময় চলে গেলে আর তো পাওয়া যাবে না।

আমলের প্রতি পাবন্দি

শারিরিক কষ্ট বৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও জামাত বিহীন নামাজ পড়েন নাই, শুধুমাত্র জীবনের শেষ চার পাঁচ দিন মানুষের অনুরুধে একা নামাজ পড়েন। দোয়া দুরুদ ওজীফা যিকির আযকারে কোন ত্রুটি হয় নাই। শরীয়ত তরীকতের আদব আহকামে কোন সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্ম ত্রুটি হয়নি। একদিন রাতের তৃতীয়াংশে উঠে ওজু করে তাহাজ্জুদ পড়ে বললেন, এটাই হচ্ছে শেষ তাহাজ্জুদের নামাজ, বাস্তবেই এমনটা হলো।

ওসিয়ত

মৃত্যুর কিছুক্ষন আগে আল্লাহ ধ্যানে ডুবে যান। সন্তানরা বললেন এই অবস্থাটা অধিক কষ্টের কারনে হয়েছে অথবা আল্লাহর ধ্যানে ডুবে যাওয়ার কারনে হয়েছে। এই তীব্র কষ্টের সময়ে ও সুন্নতের প্রতি পাবন্দি হওয়া এবং বেদআত থেকে দুরে থাকার এবং যিকির আযকারে লেগে থাকার ওসিয়ত করেন।

তিনি বলতে থাকলেন সুন্নতকে মজবুত করে আকড়ে ধরবে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন الدين النصيحة দ্বীন হলো মঙ্গল কামনার নাম। এ হিসাবে উম্মতের জন্য কল্যানের প্রতি যত্নবান হবে। ধর্মের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে পুর্ণ অনুগত্যের রাস্তা বের করে সে অনুযায়ী আমল করবে।

তিনি আরো বললেন, আমার কাফন দাফনে সুন্নতের পুর্ণ অনুসরন যেন করা হয়। স্ত্রীকে বললেন, আমার মরন যেহেতু তোমার আগে হবে তাই তোমার মহর থেকে আমার কাফনের ব্যবস্থা করবে।

আরো বললেন, আমার কবর যেন আপরিচিত স্থানে হয়। তখন তাহার একজন সন্তান বললেন, আপনি আগে ওসীয়ত করেছিলেন আপনার বড় সন্তানের (খাজা মুহাম্মাদ সাদিক যিনি ৯ রবিউল আওয়াল ১০২৫ হিজরীতে মারা যান)

192

কাছে দাফন করার জন্য আর এখন তার বিপরীত বলছেন। মুজাদ্দিদ (রাহঃ) বললেন হ্যা ঐ সময় প্রেরনা প্রবল ছিল।

যখন মুজাদ্দিদ (রাহঃ) দেখলেন তাহার একথায় সন্তান নিরব হয়ে গেছেন এবং এব্যাপারে তাহার মধ্যে ইতস্ততা বোধ লক্ষ করলেন, তখন বললেন যদি এইরূপ না কর তাহলে শহরের বাহিরে আমার পিতার কবরের পাশে দাফন করিও। আর আমার কবরে কোন নিশান চিহ্ন রেখ না।

তারপর যখন দেখলেন সন্তান চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছেন তখন মুচকি হেঁসে বললেন, যেখানে সমীচীন মনে কর সেখানেই দাফন দিও।

মৃত্যু

২৭ ছফর সোমবার দিবাগত রাত তাহার সেবায় নিয়োজিত খাদেমদেরকে বললেন তোমরা বড় কষ্ট করেছ। আজ রাতের পর আর কষ্ট করতে হবে না। অতপর বললেন হে রাত তুমি সকাল কখন হবে।

পরের দিন সকাল বেলা চাশতের সময় প্রশ্রাবের জন্য পাত্র চাইলেন। পাত্র দেওয়া হলো কিন্তু দেখা গেল পাত্রের নিচে বালু নাই প্রস্রাবের ছিটা শরীরে লাগতে পারে তাই এটা ফিরিয়ে দিলেন। কেহ বলল, ডাক্তার প্রস্রাব পরীক্ষা করবে তাই প্রস্রাব করুন। মুজাদ্দিদ (রাহঃ) বললেন আমি অজু ভাঙ্গতে চাইনা অতপর বললেন বিছানা বিছাইয়া দাও। যেমন মনে হয় তার জানা হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষন পরই পৃথীবী ছেড়ে যাত্রা করবেন।

বিছানা বিছানোর পর সুন্নত মোতাবেক ডান গালের নিচে ডান হাত রেখে যিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন। সন্তানরা ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন দেখে বললেন শারীরীক অবস্থা কি? বললেন ভালো, যেই দুই রাকাত পড়েছি তাই যথেষ্ঠ।

এটাই ছিল তার শেষ কথা এরপর থেকে যিকির ছাড়া আর কোন কথা বলেন নাই। এ অবস্থায় কিছুক্ষন পরেই প্রাণ আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেন।

মৃত্যু সন হলো ১০৩৪ হিজরীর ২৮ ছফর মঙ্গলবার ইংরেজী মাস ছিল নভেম্বর।

ঐ বছর ছফর মাস ছিল ২৯ দিনের পরের দিন রবীউল আওয়াল শুরু হতে যাচ্ছে এমনি সময় রূহ মাটির পিঞ্জিরা থেকে বের হয়ে তার বাসার দিকে যাত্রা করল। মৃত্যু কালে বয়স ছিল ৬২ বছর।

কাফন দাফন

যখন গোসলের জন্য নিয়ে যাওয়া হল, তখন লোকেরা দেখল তাহার হাত নামাজের পদ্ধতিতে বাধা। বাম হাতের কব্জিকে ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা গুলাকৃতি করে বাধা। তাহার সন্তান মৃত্যুর পর তাহা প্রসারিত করে দিয়ে ছিলেন গোসলের জন্য, কিন্তু গোসলের পর লোকেরা দেখল হাত পূর্বের ন্যায় হয়ে গেছে। তাহার দিকে তাকালে দেখা গেল মুচকি হাসছেন যেনএকটি কবিতা পাঠ করছেন, এমন জীবন কর হে গঠন, মরিলে হাঁসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

হাতদ্বয়কে কয়েক বার পৃথক করা হলো, কিন্তু প্রত্যেক বার নামাজে বাধার ন্যায় হয়ে যায়। কাফনের কাপড় সুন্নত মোতাবেক দেওয়া হয়। নিজ সন্তান খাজা মুহাম্মদ সায়্যিদ জানাযার ইমামতি করেন। এবং কবরে রাখেন। (তারিখে দাওয়াত ও আজিমাত ৪র্থ খন্ড ১৭০-১৭৪)

হযরত তুহফা রহ.

তিনি কামেল বুজুর্গ ছিলেন। ছিররী সাকাতি থেকে বর্নীত তিনি বলেন, একদা রাতে আমার ঘুম আসছিলনা। অস্থিরতার কারণে তাহাজ্জুদ ছুটে গেল। ফজরের নামাজের পর অস্থিরতার ধরুন ঘরের বাহিরে ভিতরে পায়চারী করতে লাগলাম। যখন কোন ভাবেই প্রশান্তি লাভ হল না। তখন হাসপাতালে যাওয়ার মনস্থ করলাম।

অতপর হাসপাতালে যাওয়ার পর কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করলাম। সেখানে একজন সুন্দরী মেয়ে দেখলাম, যার ছিড়া ফাড়া ময়লা কাপড় থেকে ঘ্রাণ আসছে। মেয়েটির হাত পা বাধা, লোকদেরকে মেয়েটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল সে একটি পাগলীনি তার মুনিব এখানে এনে বেধে রেখেছে। লোকদের একথা শুনে মেয়েটি আরো কাঁদতে লাগল। আর আরবীতে কবিতা বলতে লাগল, যাহার অর্থ হলো। হে মানব গোষ্ঠি আমার কোন অপরাধ

নাই। বাহ্যিক দৃষ্ঠিতে আমি পাগল হলেও আমর অন্তর সজাগ আমাকে অন্যায় ভাবে বন্দী করা হয়েছে। প্রেম ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোন গোনাহ আমার মধ্যে নাই। আমি ঐ প্রেমিকের ভালোবাসায় মত্ত যার আদেশের বিপরীত কিছু করা যায় না। আমার সৌন্দর্য্যটাই হচ্ছে আমার গুণাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে, তাহার প্রতি সন্তুষ্ঠ থাকে তার কোন গোনাহ নাই।

ছিররী সাকতী বলেন, মেয়েটির এসব কথায় আমার অন্তরে ধারুন প্রভাব পড়ে ! আমার কান্না এসে গেল। এই মেয়েটি আমাকে বলল, হে সিররী এ অবস্থায় আবার কান্না কেন কর? তুমি তো তাহাকে যথার্থ রূপে চিনে নিয়েছ। এ কথা বলে মেয়েটি বেহুশ হয়ে পড়ে, তাহার হুশ ফিরে আসার পর আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দী। সে জবাবে বলল আমি উপস্থিত হে সিররী। আমি বললাম তাকে কিভাবে আমি চিনেছি। মেয়েটি বলল, যখন তুমি চিনে ফেলেছ তাহলে তুমি অজ্ঞ নও। আমি বললাম, শুনলাম তুমি ভালোবাসার দাবিদার। তো কার ভালোবাসার দাবিদার? সে বলল ঐ সত্তার যিনি তার নেয়ামত দ্বারা আমাদেরকে পরীপুর্ণ করেছেন, যিনি আমাদের প্রানের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী। আমি তাহাকে বললাম, তোমাকে এখানে কে বন্দী করেছে ? সে বলল হিংসুকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বন্দী করেছে। তারপর চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল।

ছিররী সাকতি বলেন, আমি মনে করলাম সে মারা গেছে কিন্তু কিছুক্ষন পর আবার হুশ ফিরে আসল। তখন সময় উপযোগী আর কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শুনাল। হাসপাতালের মালিককে বললাম, তাকে ছেড়ে দেন। মালিক মেয়েটিকে ছেড়ে দিল। আমি তাকে বললাম, তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। মেয়েটি বলল যাব কোথায়? আসল মালিক আল্লাহই আমাকে আরেক জনের দাসী বানিয়ে দিয়েছেন। যদি সে মেনে নেয় তাহলে কোথায় চলে যাব, নতুবা ধৈয্যধরে পড়ে থাকব। তার কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম মেয়েটি আমার থেকে জ্ঞানী।

তুহফা (রাহ:) এর মুনিবের সাথে সিররীর সাক্ষাৎ

মেয়েটির সাথে কথা বার্তা চলা অবস্থা তুহফা (রাহ:) এর মুনিব এসে হাজির হলো। হাসপাতালের দারওয়ান কে বলল, তুহফা কোথায় ? দারোয়ান বলল,

195

ভিতরে সিররী সাকাতীর কাছে আছে। মুনিব খুশি অবস্থায় ভিতরে এসে আমাকে সালাম করল, অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করল। আমি মুনিবকে বললাম, এই মেয়েটি আমার থেকে অধিক সম্মানের যোগ্য, তাকে কোন অপরাধে বন্দী করলে ?

মুনীব বলল, বন্দী করার কারণ অনেক! সে পাগল, খাওয়া দাওয়া করেনা, আমাদের ঘুমাতে দেয়না, অধিকাংশ সময় যিকিরে মগ্ন থাকে। আমি ২০ হাজার দিরহাম ব্যায় করে তাকে ক্রয় করেছি। আশা ছিল তার দ্বারা অনেক উপকার হবে। কারণ তার মধ্যে যে যোগ্যতা আছে এর দ্বারা আমি অনেক ধন ধৌলত অর্জন করতে পারতাম। আমি বললাম, তার মধ্যে কি যোগ্যতা আপনি দেখেছেন? মুনিব বলল সে ভালো গান গাইতে পারে। আমি বললাম কতদিন থেকে সে এই অবস্থায় পাগল আছে? মুনীব বলল এক বছর হবে।

আমি বললাম এর পুর্বে তার অবস্থা কি ছিল? মুনীব বলল সে বগলে বাশি নিয়ে এই কবিতা গুলি আবৃত্তি করত: যার সারকথা হচ্ছে, আমি কছম করে বলছি যে, অঙ্গিকার তোমার সাথে করেছি তা কখনও ভঙ্গ করব না। বন্ধুত্বতার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করব না। যে বন্ধুত্ব দ্বারা আমার অন্তরকে ভরপুর করেছো এবার আমার অন্তর প্রশান্ত করব কিভাবে? অতএব হে প্রভু তুমি ছাড়া আমার কোন বন্ধু নেই। তুমি আমায় মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছ?

মুনীব বলল, একদিন এই কবিতা আবৃত্তি করা অবস্থায় বসা থেকে দাড়িয়ে গেল এবং বাশি ভেঙ্গে ফেলল। আর কান্নাকাটি করতে লাগল, আমি মনে করলাম হয়তো কাহারো ভালোবাসায় বিভোর হয়ে গেছে। পরক্ষণে বুঝলাম আমর ধারণা ঠিক নয়। ছিররী বলেন আমি তোহফাকে বললাম, বল তো সে দিনের ঘটনাটি কি? তখন তুহফা ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে কিছু কবিতা আবৃতি করল। যার মর্মার্থ হলো, আল্লাহ আমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন আর আমি জবান দ্বারা নসীহত করেছি।

কিছুক্ষণ পর আমি আল্লাহর নৈকট্যতা লাভ করলাম, আল্লাহ আমাকে বিশেষ মর্যাদায় ভুষিত করলেন আমাকে কবুল করে নিয়েছেন। আমাকে যখনই ডাকা হয় তখন লাব্বাইক বলে অন্তরে ভালোবাসা নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হই।

ছিররী বলেন এ কবিতা শুনে আমি মুনিবকে বললাম, তার উপর আপনার যে প্রাপ্য আছে তা আমি আদায় করব বরং অতিরিক্ত কিছু দিব। মুনিব বলল

আপনি বুজুর্গ লোক এত টাকা কোথায় থেকে দিবেন? আমি বললাম তুমি এটা চিন্তা কর না। এখানে দাড়াও আমি মুল্য নিয়ে আসছি।

শেষ রাত্রির অস্থিরতা দেখার মত

ছিররী (রাহ:) বলেন, তুহফার মুনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর কান্নাকাটি করতে থাকলাম। আল্লাহর কছম তখন আমার কাছে একটি দিরহাম ও ছিলনা। সারা রাত এই চিন্তায় আহাজারী করলাম। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলাম, হে আল্লাহ আপনি আমার জাহেরী বাতিনী সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, আমি আপনার অনুগ্রহের প্রতি ভরসা রাখি। আমাকে অপদস্থ করনা।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই দরজায় টুকটুকি আওয়াজ শুনলাম। আমি বললাম কে? উত্তর আসল তোমার এক বন্ধু, দরজা খুলে দেখলাম এক ব্যক্তি হাতে প্রদীপ সঙ্গে চার জন গোলাম সে ভিতরে আসার অনুমতি চাইল! আমি বললাম ভিতরে আসুন। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে? কিভাবে এসেছ? সে বলল আমি আহমদ বীন মুছান্না! স্বপ্নে একজন ঘোষক বলেছেন ৫ থলি ভর্তি স্বর্ণ যেন সিররী সাকতীর কাছে প্রেরন করি। তার অন্তর খুশি কর, সে যেন তুহফাকে ক্রয় করে।

সিররী বলেন একথা শুনে আল্লাহর শুকর আদায়ার্থে সেজদা করলাম। সকালের অপেক্ষা করতে থাকলাম। অবশেষে ফজরের নামাজ পড়ে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম। দারওয়ান অপেক্ষমান ছিল, আমাকে দেখে বলল আপনার আগমন শুভ হউক, আল্লাহর কাছে তুহফার মর্যাদা অনেক বেশী।

তুহফা (রাহ:) এর বারকাত সমূহ

তুহফা আমাদেরকে আসতে দেখে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, হে প্রভু মানুষের সম্মুখে আমার রহস্য প্রকাশ করে দিলেন। ইত্যবসরে তুহফার মুনিব কেঁদে কেঁদে আসল, আমি বললাম এটা আবার কিসের কান্না? তুমি যা বলেছ তা নিয়ে আমি হাজির হয়েছি বরং আরো কিছু অতিরীক্ত নিয়ে এসেছি। মুনিব বলল, আমি বিনিময় চাইনা। আমি তাহাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ করে দিলাম। আমি বললাম এখন এমন অবস্থা হল কেন? মুনিব বলল রাতের বেলা স্বপ্নে

197

আমাকে শাসানো হয়েছে। সুতরাং আমি আপনাকে সাক্ষি রেখে বললাম, এ সকল সম্পদ আমি চাইনা আমি আল্লাহর প্রতি ধাবিত হলাম।
ছিররী বলেন আমি মুছান্নার দিকে তাকিয়ে দেখি সে কান্না করছে। আমি বললাম কাঁদ কেন? সে বলল আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে কাজের জন্য ডেকে ছিলেন এ অবস্থায় মনে হচ্ছে আল্লাহ আমার উপর অসন্তুষ্ট। অতএব আমি আপনাকে সাক্ষি রেখে বলছি, সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করলাম। আমি শুনে বললাম সুবহান্নাল্লাহ, তুহফার বরকত এত প্রশস্ত।
এসময় তুহফা তার পরিধানের কাপড় খুলে চট পরিধান করে কেঁদে কেঁদে বাহির হয়ে আসল। আমি বললাম আল্লাহ তোমাকে আযাদ করেছেন। এবার আবার কান্না কিসের? একথা শুনে সে কয়েকটি কবিতা আবৃতি করল।
যার মর্ম হলো, যার দিকে পলায়ন করছি তার জন্য কাঁদছি। সততার শপথ! তিনিই আমাকে তলব করেছেন আমি সর্বদা তার কাছে থাকব যেন আমাকে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে পৌঁছেদেন। ছিররী (রাহ:) বলেন।
কিছুক্ষণ পর আমরা বাহিরে এসে তাকে তালাশ করে পাই নাই।

কাবার প্রাঙ্গনে

আমরা তিন জন কাবা শরীফ গমনের ইচ্ছা করলাম। ছফরের মধ্যে মুছান্না মারা যান। আমি আর তুহফার মুনিব মক্কা শরীফে পৌছলাম। তওয়াফের সময় কাহারো হৃদয় ভাঙ্গা সুর শুনলাম। সে কবিতা আবৃতি করছে যার মর্মার্থ হল।
আল্লাহর বন্ধু দুনিয়াতে অসুস্থ। তার অসুস্থতা দীর্ঘ। এটার চিকিৎসা হলো খোদার প্রেম ভালোবাসা। যা তিনি নিজে তাহাকে তৃপ্তি করে পান করিয়েছেন। যখন তাকে ভালোবাসার রক্ত পান করা হল, সাথে সাথে তার ভালোবাসায় সে বেহুশ হয়ে যায়। ঐ প্রেম ভালোবাসা ছাড়া তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, ভালোবাসার দাবী করার পর প্রেমীকের সাক্ষাতের অপেক্ষায় বেহুশ হয়ে যায়।
আমি ঐ কবিতা আবৃত্তিকারির কাছে পৌঁছি, সে আমাকে দেখে বলল, হে সিররী আমি লাব্বাইক বলে বললাম তুমি কে? খোদা তুমার প্রতি রহমত নাযিল করুন। সে জবাবে বলল, لا اله الاالله এটা কেমন অপরিচয়ের অভিনয় করা? আমিই তুহফা আমি দেখলাম সে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে।

198

আমি বললাম হে তুহফা একাকিত্ব গ্রহন করে কেমন উপকার লাভ করেছ। সে বলল, আল্লাহ তার নৈকট্যতার ভালোবাসা দান করেছেন। মাখলুকের প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি করেছেন।
আমি বললাম আহমদ বিন মুছান্নার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। সে বলল আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আল্লাহ তাকে এত বুজুর্গী কারামাত দান করেছেন যা অন্যের কাছে পাইনি। জান্নাতে সে আমার সঙ্গী হবে।
আমি বললাম, তোমার মুনীব আমার সাথে এসেছেন। তখন তুহফা তার জন্য দোয়া করল এবং সাথে সাথে কাবার নিকটে পড়ে মারা গেল।
তুহফার মুনিব এসে তাকে মুর্দা দেখে সেও পড়ে যায় আমি তাকে উঠানোর জন্য কাছে এসে দেখি সেও মারা গেছে। আমি তাদেরকে দাফন করে ফিরে আসলাম। আল্লাহ তাদের সবাইকে রহম করুন।
কুল্লিয়াতে এমদাদিয়াতে এই পুর্ণ কাহিনী কবিতা আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। (কুল্লিয়াতে এমদাদিয়া ১৫৪-১৫৬)

শায়খ মুহকাম উদ্দিন ছাহেবুল ইয়াছার উয়াইসী (রাহঃ)

তিনি মাঝে মধ্যে একদিন দুই দিন এক মাস এমনকি কখনো কখনো চারমাস খোদা প্রেমে উম্মাদ হয়ে পড়ে থাকতেন। এ সময়ে দুনিয়ার বাহ্যিক অবস্থার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতনা। তিনি রাটি শহরের নিকটস্থ একটি গহিন পুকুরের কিনারায় বসতেন, বর্ষাকালে পুকুর পানিতে থৈথৈ করত, সেখানে মাঝে মধ্যে ধর্ম সঙ্গিতের আসর বসাতেন। খোদা প্রেমের উম্মাদনা যখন তাকে আচ্ছন্ন করত, তখন ঐ পুকুরে ঝাপ দিয়ে দিতেন।
একবার এরকম ধর্মীয় কবিতার আসর বসল। হাজার হাজার শ্রুতা উপস্থিত। কবিতা আবৃত্তি চলছে। হঠাৎ খোদা প্রেমের নেশা প্রবল হলো, সবার সামনে তিনি পুকুরে ঝাপ দিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে পানির অনেক গভীরে চলে গেলেন, লোকেরা ডুবুরি দ্বারা গোটা পুকুর তালাশ করে তার সন্ধান পেলনা, অবশেষে লোকেরা খবর ছড়াল তিনিও শায়খ কুতবুদ্দীন বীন খাজা আব্দুল খালিক (রাহঃ) এর মত বাহ্যিক দৃষ্টির আড়াল হয়ে আবদালদের (ওলী আল্লাহদের একদল) সাথে মিলিত হয়ে গেছেন।
পাঁচ মাস চলে যাওয়ার পর পুকুরের পানি যখন শুকিয়ে গেল গ্রামের লোকেরা জমিনে মাটি ভরাটের জন্য পুকুর থেকে মাটি উত্তোলন করার সময় একটি

199

কোদালে কি যেন স্পর্শ করল। ভালোকরে তাকিয়ে দেখা গেল একজন মানুষের লাশ দাফন করা আছে। লোকেরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীরের উপর থেকে মাটি সরালো। দেখা গেল ছাহেবুল ইয়াসার এর শরীর তিনি আল্লাহর প্রেমে উম্মাদ হয়ে আছেন। ধর্মীয় সঙ্গীতের শিল্পীদের ডেকে এনে নাতে রাসুল পরিবেশন শুরু হল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তিনি চোখ খুলেছেন। হুশ ফিরে আসল লোকেরা দেখল তিনি সুস্থ শরীরে আছেন।

হযরত খাজা সুলায়মান (রাহ:) বলেন আমি ছোটবেলা ছাহেবুল ইয়াসারের খেদমতে গেলাম। তখন তিনি তুসা নামক জায়গায় এক মসজিদে জোহর নামাজ আদায় করে মুরাকাবায় (আল্লাহর ধ্যানে) বসলেন। আমি দেখলাম একজন কবুলি পাঠান তাহার কাছে এসে সালাম করে পাশে বসল। হযরতকে লক্ষ করে বলল, আমি একজন সত্য লোকের তালাশে দেশে দেশে ঘুরছি। অনেক মাইল সফর করে পাঞ্জাবে পৌছলাম। কিন্তু আমি আমার উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হলাম।

ছাহেবুল ইয়াসার ঐ লোকটির কথা শুনে বললেন, সত্য লোক থেকে কোন দেশ শহর খালি নয়। সকল দেশ শহরে বিদ্যমান আছে। তবে দৃষ্টি হতে হবে সত্য তালাশের দৃষ্টি।

সঙ্গে সঙ্গে কাবুলি ব্যক্তি বলল তাহলে এবার আমি এখান থেকে বঞ্চিত হবোনা। ছাহেবে ইয়াসার বললেন। তোমার অংশ অনেক দিন যাবত আমার কাছে আমানত হিসাবে আছে। এবার বল তোমার পাওনা এক সাথে চাও না ধীরে ধীরে চাও? পাঠান আগ্রহ হয়ে বলল এখনই এক সাথে চাই। তিনি বললেন এক সাথে গ্রহন করে তুমি সহ্য করতে পারবেনা। লোকটি বলল আমার এই দুর্বল প্রান আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হউক। হযরত বললেন, ঠিক আছে তুমি সামনে আস আর পড় لا اله الاهو সে যখন পড়ল তখন তিনি ও পড়লেন। কিন্তু لا اله الاهو বলার সাথে সাথে লোকটি জমিনে পড়ে গলা কাটা মুরগের মত ছটফট করতে লাগল।

এক পর্যায়ে তড়পাতে তড়পাতে পাশের একটি পুকুরে পড়ে গেল। ছাহেবে ইয়াসারের খানকার এক দরবেশ অত্যন্ত কষ্ট করে তাকে পানি থেকে উঠাতে সফল হলেন। উঠানোর কিছু সময়ের ভিতরে লোকটি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে

200

গেল। ছোহেবে ইয়াসার এই শহিদ খোদা প্রেমিকের কাফনের ব্যবস্থা করলেন এবং দাফন করলেন।
(খাজিনাতুল আউলিয়া, দুনিয়া কি মুখতালাফ সালাসিল ১৭১-১৭২)

শায়খ মুজাদ্দিদ উদ্দিন বাগদাদী (রাহঃ)

খাওয়ারিজম শাহের জননী সৌন্দর্য্যতার ক্ষেত্রে তার কোন জুড়ি নাই। তিনি প্রায় সময় শায়খ মুজাদ্দিদ উদ্দিন এর মজলিসে আসতেন। শায়েখের ওয়াজ নসীহত অত্যান্ত মনোমুগ্ধকর ছিল, বিদায় খাওয়ারিজম শাহের জননী মাঝে মধ্যে রাতের বেলাতে ও মজলিসে ওয়াজ শুনতে আসতেন।
এক রাতে খাওয়ারিজম শাহ মদ পানে মত্ত ছিলেন। এ সময় শায়খ মুজাদ্দিদ উদ্দিন এর দুশমনরা এ সময়কে গনীমত মনে করে খাওয়ারিজম কে এসে বলল তোমার মা গোপনে মুজাদ্দিদ উদ্দিনের সাথে বিবহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এখন তারা মিলামিশায় আছেন।
সুলতান খাওয়ারিজম সাথে সাথে হুকুম দিল আগামিকাল দিন শুরু হওয়ার আগে যেন তাঁকে সমুদ্রে সমাধিস্থ করা হয়।
এ সংবাদ শায়খ নজমুদ্দীন কুবরা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি
انا لله وانا اليه راجعون পড়ে বললেন আমার সন্তান মজদুদ্দীনকে হত্যা করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এই কথা বলে সিজদাবনত হয়ে দোয়া করলেন হে আল্লাহ এই জালিম বাদশাহর সিংহাসন খালি করে দাও। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করলেন।
এদিকে সুলতান খাওয়ারিজম এই ঘটনা অবগত হওয়ার পর অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পায়ে হেটে হযরত নজমুদ্দীনের কাছে হাজির হন, তার এক হাতে সোনার পাত্র, সঙ্গে ২টি তলোয়ার মাথায় কাফনের কাপড় বাধা। মজলিসে প্রবেশ করে মাথা থেকে কাফন সরিয়ে মাথা নিচু করে বলল, যদি (দিয়ত) মুক্তি পণ চান, তাহলে এই সোনা আছে। আর যদি হত্যার বদলা হত্যা চান, তাহলে এই তলোয়ার ও কাফন আছে। নজমুদ্দীন কুবরা বললেন
كان ذالك فى الكتاب مسطورا একথা তাকদীর লিখক লিখে দিয়েছেন। মুজাদ্দিদ উদ্দিনের মুক্তিপন হলো তোমার গোটা বাদশাহী, তোমার বাদশাহী ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তোমার মাথা কাটা হবে। অনেক নিস্পাপ লোক নিহত হবে। এই হাঙ্গামায় আমি নিজেও প্রাণ উৎসর্গ করব।

একথা শুনে বাদশাহ নৈরাশ হয়ে ফিরল। কিছু দিন পর চেঙ্গিস খান তার বাহিনী নিয়ে খাওয়ারিজম সুলতানাতকে নেস্তেনাবুদ করে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করে। নজমুদ্দীন কুবরাও এ যুদ্ধে শহীদ হন। ৬১৭ হিজরীতে নজমুদ্দীন কুবরা শহিদ হন। কেহ কেহ বলেন ৬০৭ হিজরী তারীখে শহিদ হন।
(খাজিনাতুল আউলিয়া, ছাফিয়া কি মুখতালাফ ছালাছিল ২০৬)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাহঃ)

তিনি সুপ্রসিদ্ধ একজন তাবেয়ী। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে হাজ্জাজ তাকে গ্রেফতার করে নির্মম ভাবে শহিদ করে। শহিদ করার পুর্বে হাজ্জাজ তাকে বলল, তোমাকে কিভাবে হত্যা করব?
সাঈদ বললেন তুমি ইচ্ছামত যে ভাবে চাও সে ভাবে কর।
হাজ্জাজঃ তোমাকে ক্ষমা করব?
সাঈদঃ ক্ষমার কাজ হলো আল্লাহর তুমি মাফ করার মতো কেউ নয়।
হাজ্জাজ জল্লাদকে নির্দেশ করল, তাকে হত্যা কর।
সাঈদকে বাহিরে বের করা হলো এমতাবস্থায় তিনি হাঁসতেছেন। এখবর হাজ্জাজকে জানানো হল।
হাজ্জাজ সায়িদকে আবার ডেকে বলল তুমি হাসলে কেন?
সাঈদঃ তুমি আল্লাহর উপর দু:সাহসীকতা প্রদর্শন করছ। আর আল্লাহ তোমার প্রতি সহনশীলতা দেখাচ্ছেন এই জন্য হাসছি।
হাজ্জাজঃ আমি তো ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করছি যে মুসলমান দলের মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি করেছে। একথা বলে হাজ্জাজ জল্লাদকে আবার গর্দান উড়ানোর নির্দেশ করল।
সাঈদঃ আমি দু রাকাত নামাজ পড়তে চাই! নামাজ পড়ার সুযোগ দেওয়া হলো।
সাঈদ নামাজ পড়ে কিবলামুখী হয়ে এই আয়াত পড়লেন
انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض وما انا من المشركين
আমি আসমান জমিনের স্রষ্টার প্রতি মুখ ফিরাইলাম। আমি মুশরিক নয়।
হাজ্জাজ বলল. তার মুখ কিবলা থেকে ফিরিয়ে নাসারাদের কিবলার দিকে করে দাও। সে দ্বিনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। এ আদেশের সাথে সাথে হাজ্জাজের কর্মচারীরা সায়িদের চেহারা কিবলা থেকে ফিরিয়ে দিল।

202

সাঈদ বললেন: فاين ما تولوا فثم وجه الله ان الله هوالسميع العليم যে দিকেই চেহারা ফিরাও আল্লাহ সে দিকেই আছেন। নিশ্চয় তিনি সব কিছু শুনেন দেখেন।

হাজ্জাজ বলল: চেহারা নীচ দিকে করে দাও। আমরা তো বাহ্যিকতার উপর কাজ করার দায়িত্বশীল।

সাঈদ বললেন: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى এই জমিন থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি ২য় বার এই জমিনে ফিরিয়ে আনব আবার এই জমিন থেকে উঠাব।

হাজ্জাজ বলল: তাকে কতল কর।

সাঈদ বললেন: আমি তোমাকে এই কথার সাক্ষী বানাচ্ছি

اشهد ان لا اله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله তুমি একথাটি স্মরণ রাখবে। কিয়ামতের দিন তোমার সাথে যখন সাক্ষ্য হবে তখন তোমার কাছ থেকে এই সাক্ষ্য নিব।

তারপর তাঁকে শহিদ করা হল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁর মৃত্যুর পর শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বের হয়েছে। যা দেখে হাজ্জাজ ও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ ডাক্তারকে জিজ্ঞাস করা হলো, ডাক্তার বলল তাহার অন্তর মৃত্যুকালে খুবই প্রশান্ত ছিল, হত্যা হওয়ার ব্যাপারে সামান্য কোন ভয় ছিলনা। যদ্দরুন রক্ত মুল পরিমানের উপর বহাল ছিল। অন্যান্য লোকের বেলায় এর বিপরীত হয়। ভয়ের কারণে রক্ত শুকিয়ে যায়।

(হেকায়াতে ছাহাবা ৯৫)

শায়খ আবু রেজা (রাহ:)

তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ:) এর সম্মানিত চাচা ছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর ভাষ্য মতে একাকিত্ব, তাওয়াক্কুল, সুন্নতে রাসুলের অনুসরন, সুফিদের অবস্থা এমন পরিমানে গ্রহন করেছেন, যার বাইরে গ্রহন করা মানুষের সামর্থের বাহিরে।

শায়খ মুহাম্মদ মুজাফফার (রাহ:) বলেন আর রাজী (রাহ) জীবনের প্রথম অংশে অনেক সময় বলতেন, যখন আবু রোজার বয়স ৫০ বছর অতিক্রম করবে তখন আমাদের বয়স হবে ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যখানে। তাঁর বয়স

203

যখন ৫০ বছর থেকে বেশী হলো তার ব্যাপারে আমার ভয় হলো ৫৫ বছর বয়সে যখন তিনি পৌঁছেন, তখন আমি বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। বিদায় কালে আমি ঐ আশংকার কথা উল্লেখ করলাম। তিনি মুচকি হেসে আমার কথা উড়িয়ে দিলেন। আর আমাকে বললেন, তোমার বাড়িতে যাওয়ার এখন প্রয়োজন বেশী। ঐ আশংকা অন্তরে টাই দিও না। মুজাফফার (রাহঃ) বলেন, এই কথা গুলি হলো হুজুর মুখ থেকে শুনা শেষ কথা।

কবি গুলশান বলেন, শায়খ আবু রেজা (রাহঃ) এর শেষ দিনগুলোর কোন একদিন শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব তাহার সাক্ষাতে আসলেন। আমি ও তখন শায়খ আব্দুল ওয়াহহাবের সাথে ছিলাম, আমরা যখন তার কাছে পৌঁছলাম, তখন হযরত আবুর রেজা তার চৌকিতে বসা ছিলেন, আমরা যাইয়া সবাই নিচে বসলাম। হযরত আবুর রেজা শায়খ আব্দুল ওয়াহহাবকে দেখে মুচকি হেসে অভ্যার্থনা জানিয়ে তাকে তার সাথে চৌকিতে বসালেন। কিছুক্ষণ আমরা হযরতের কাছে বসলাম, তবে কোন কথা বার্তা হয়নি। অবস্থায় মনে হলো, হযরত সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক থেকে বিমুখ, সবার প্রতি ঘৃনা ভাব। যদ্দরুন কাহারো সঙ্গে কথা বলছেন না। এক পর্যায়ে চৌকি থেকে উঠে পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্কের কারনে শায়খ আব্দুল ওয়াহহাবকে সঙ্গে নিয়ে আন্দর মহলে প্রবেশ করলেন।

এ অবস্থায় আরা কিছুক্ষণ নিরব সময় অতিক্রম হল। এমন সময় মাগরিবের আযান ও হয়ে গেল। হযরতের বড় ছেলে শায়খ ফখরুল আলম এসে বললেন আযান হয়ে গেছে আপনারা বাহিরে চলে যান। হযরত তাহার ছেলের কথা শুনতে পেলেন ছেলেকে বললেন বাবা এখনো বাহির ভিতরের পার্থক্য বহাল আছে। একথা বলে নিজেও বাহিরে এসে মসজিদে যাইয়া নামাজ পড়েন। হযরতের সাথে এই সাহচর্যতার ইতি ঘটার পর শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব বলেন, শায়খের এ অবস্থার দেখে মনে হচ্ছে তিনি ঐ অবস্থায় থাকতে নির্দেশ প্রাপ্ত। তার মরনের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সুমহান বন্দুর সাথে মিলতে উদগ্রিব হয়ে গেছেন। এর কিছুদিন পরই হযরত ইন্তেকাল করলেন।

শায়খের সঙ্গীদের একদল বলেন, মরণের কিছুদিন পুর্বে হযরত কিছুটা শারীরীক দুর্বলতা অলসতা অনুভব করলেন। তখন তিনি দুই তিন দিন খাবার গ্রহন করলেন না। তখন সম্পর্ক হীনতা মনভাব তার সৃষ্টি হলো, এমনকি কোন

জিনিসের প্রতি থাকাতেনও না। মৃত্যুর দিন আছরের নামাজে যাওয়ার সময় পরিবারের লোকদের বিদায় জানালেন। আছরের নামাজের পর খাজা নক্‌শবন্দীর মাকামাত তালাশ করে কিছু পড়লেন। ইত্যবসরে তাহার একজন ভক্ত পান সামনে হাজির করল। তা থেকে কিছু খেলেন। অতপর আনন্দ চিত্তে পাশে রাখা বালিশে হেলান দিলেন। আর এ অবস্থায় তাহার রূহ মাটির পিঞ্জিরা থেকে বাহির হয়ে গেল।

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পুর্বে শায়খ আব্দুর রহিম (রাহ:) কে তালাশ করলেন। উপস্থিত লোকেরা তাহার তালাশে বের হলো। আর কিছু লোক তার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়েছে মনে করে তাকে ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। এদিকে শায়খ আব্দুর রহিমও আসলেন। তিনি এসে দেখলেন তার প্রান বায়ূ চলে গেছে।

তখন সময় ছিল ১১০০ হিজরীর মুহাররাম মাসের ১৭ তারিখ। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে তাঁর জায়গা দান করুন।

(আনফাসুল আরিফিন ৩২৮-৩৩০)

শায়খ অজিহ উদ্দীন (রাহ:) এর শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা

শাহ আব্দুর রহিম (রাহ:) বলেন, একদা রাত্রে আমার পিতা শায়খ অজীহ উদ্দিন তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেছিলেন। এক পর্যায়ে সিজাদায় যাইয়া এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, আমার মনে হলো তার রূহ বের হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষন পর দেখা গেল, সিজদা থেকে মাথা উঠাইছেন। ইশারা করে আমি দীর্ঘ সিজদার কারণ জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বললেন, সিজদার অবস্থায় অদৃশ্য জগত আমার সামনে পেশ হলো। আমি তখন আমার শহীদ বন্ধুদের অবস্থা দেখলাম। তাহাদের উচ্চস্থর লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিত হলাম। আর আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে শাহাদত হাছিলের দরখাস্ত করলাম। আমার সেই দরখাস্ত কবুল হয়েছে। আমাকে নামাজ শেষ করার পর বলা হয়েছে, হিন্দুস্থানের দক্ষিণে হায়দারাবাদ এলাকায় তোমার শাহাদত হবে।

এই ঘটনার পর তিনি সফরের ইচ্ছা করলেন। আসবাব পত্র তৈরী করলেন। অথচ তিনি চাকরিজীবী ছিলেন। কিন্তু এটার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ তৈরী হলো। যাই হোক তিনি ছফরের জন্য ঘোড়া ক্রয় করে দক্ষিণ দিকে রওয়ানা হলেন। তাহার ধারনা সে সময়ের কাফির বাদশাহ শিবা এর সাথে লড়াই হবে। কারণ সে

মুসলিম বিচারক কে খুব অপমানিত করেছে। কিন্তু যখন তিনি বুরহানপুর পৌঁছলেন, তখন কাশফের মাধ্যমে জানতে পারলেন, শাহাদাতের স্থান পিছনে ছেড়ে এসেছেন। ফলে আবার পিছন দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শাহাদাত

পথিমধ্যে কিছু মুত্তাকি সৎ ব্যবসায়ীর সাথে স্বীয় মিশনের বেলায় অঙ্গীকার বদ্ধ হলেন আর ইচ্ছা করলেন হিন্ডিয়া অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করবেন। ইত্যবসরে একজন বৃদ্ধ লোকের দেখা মিলল। যে হেলেদুলে কোথায় যাচ্ছে। হযরত তার প্রতি সদয় হয়ে তাহার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। সে বলল, আমি দিল্লী যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। শায়খ তাঁকে বললেন, আমার সঙ্গীদের কাছে থেকে প্রতিদিন তুমি তিন পয়সা করে নিও। আসলে ঐ বৃদ্ধা লোকটি কাফেরদের গোয়েন্দা ছিল।

যখন এই কাফেলা ননবরিয়া মুসাফির খানায় অবতরণ করল। (যা নুরবুদা সমুদ্র দিকে হিন্দুস্থানের দিকে ২/৩ মাজিল দুরুত্বে অবস্থিত) তখন ঐ গোয়েন্দা (বৃদ্ধা লোক) তার সাথীদেরকে শায়খ ও তার সাথীদের ব্যাপারে অবগত করল। সাথে সাথে ছিনতাই কারীদের একদল মুসাফির খানায় আসল। হযরত তখন কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে ছিলেন। এই ছিনতাইকারীদের তিনজন অগ্রসর হয়ে বলল, অজীহ উদ্দিন কে? যখন তারা তাকে চিনতে পারল, তখন তারা তাকে বলল আপনার সাথে কোন মাল সম্পদ নাই, সুতরাং আপনার সাথে আমাদের কোন বিষয় সম্পৃক্ত নয়। তবে ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের কাছে যেহেতু সম্পদ আছে তাই তাদেরকে ছাড়বোনা।

যেহেতু ব্যবসায়ীরা শায়খের ছফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুর্ণ অবগত ছিল। তিনি তাদের সাথে অঙ্গিকার বদ্ধ ছিলেন। তাই শায়খ তাদেরকে হত্যা করা লুঠপাট করা থেকে বাঁচাবার জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। ছিনতাইকারীদের সাথে লড়াই হলো, তিনি ২২টি আঘাতে জর্জরীত হলেন। একটি আঘাতে মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও তাকবীর দিয়ে একটি তীর মেরেও কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। একজন মহিলা এ অবস্থা দেখে খুবই আশ্চর্য হলো আর ঐ সময় তিনি ও পড়ে মারা যান, আর সেখানেই তার দাফন হয়।

206

হযরত শাহ আব্দুর রহিম বলেছিলেন, ঐ দিনের শেষ দিকে তিনি শারীরিক রূপ ধারণ করে আমার সামনে এসে তার জখম গুলো দেখালেন। আমি তা দেখে ইসালে সওয়াবের জন্য ছদকা করলাম। হযরত আব্দুর রহিম বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল তার লাশ সেখান থেকে স্থানান্তর করার। তিনি শারীরিক রূপে আমার সামনে এসে বাধা করলেন। তার হত্যার সংবাদ অনেক দুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।
(আনফাসুল আরিফিন ৩৪৪-৩৪৬)

শায়খ আহমদ নাখলী (রাহঃ)

তিনি ৯০ বছর পর্যন্ত জীবন লাভ করেন। শায়খ আব্দুর রহমান বলেন, আমি দুনিয়াবী সকল কাজকর্ম লেনদেনে পিতার ওকীল ছিলাম। আমার পিতা মোহাম্মাদ নাখলী শেষ বয়সে পৌঁছার পর, আমি একদিন তাঁর কাছে হাজির হয়ে ঋণদারদের ব্যাপারে তাদের পাওনা তলবের অভিযোগ করলাম। আমার আশংকা ছিলো যদি পিতা মারা যান, তাহলে ঋণের ভার আমার উপর আসবে। পিতা আমাকে বললেন এই আশংকা অন্তরে ঠাঁই দিও না। আমার আশা ঋণ আদায় না করা পর্যন্ত মরব না। আমার ধারণা যেই রাত সকল ঋণ আদায় করব, সেই রাত হবে আমার শেষ রাত।
তাঁর মৃত্যুর কিছু পুর্বে সকল ঋণ আদায় পরিমান টাকা আশাতিত জায়গা থেকে আসল। তার কথা মোতাবেক দেখা গেল বাস্তবেই তিনি ঋণ আদায় করে পৃথীবী থেকে বিদায় হন।
(আনফাসুল আরিফিন ৩৯৩-৩৯৪)

খাজা ফুজাইল বিন ইয়াজ (রাহঃ)

খাজা আবু আলী রাজী বলেন, আমি তিন বছর পর্যন্ত ফুজাইল বিন ইয়াজের খেদমতে ছিলাম। এই তিন বছরের ভিতরে ফুজাইলকে কখন ও হাসতে দেখিনাই। হ্যাঁ যেই দিন সন্তান মারা যান সেই দিন হেসেছেন।
তাহার সন্তান মরণের কারণ হলো, খানায়ে কাবার জমযমের নিকটে বসা ছিল। এ সময় একজন ব্যক্তি এসে আয়াত পড়লেন

ووضع الكتاب فترى المشفقين مما فيه ويقولون يولتنا مالى هذا الكتاب لا يغادر صغيرة

207

যে দিন পাপিষ্টদের সামনে তাদের আমল নামা পেশ করা হবে, তখন আপনি দেখবেন পাপিষ্টরা বলবে, হায় দুর্ভোগ এটা কেমন কিতাব যাহা আমাদের ছোট বড় কোন গুণাহ ছাড়া নাই। যখন ফুজাইলের সন্তান আয়াত শুনলেন, তখন চিৎকার করে প্রাণ আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেন।
(খাজিনাতুল আসফিয়া ২৩)
সুফিয়ান বিন আতাবাহ বলেন, আমরা ফুজাইল বিন ইয়াজেকে অসুস্থতার সময় দেখতে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আপনারা না আসলে ভালো হত, কারণ আপনারা আসার কারণে আমার ভয় লাগে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কোন কথা জবান থেকে বের হয় কিনা?
মৃত্যুকালে তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। পরে যখন হুশ ফিরে আসল তখন চোখ খুলে বললেন, হায় আফসোস ছফর কত লম্বা আর পাথেয় কত স্বল্প।
মৃত্যুর পর কেহ স্বপ্নে দেখল ফুজাইল (রাহ:) বলতেছেন যে, মানুষের জন্য তার রবের চাইতে উত্তম আর কেহ নাই।
(কিতাবুর রূহ ইবনুল কাইয়্যুম)

হযরত ইয়াহয়া বিন মুআজ (রাহ:)

লোকেরা তাকে অসুস্থতার সময় দেখতে এসে জিজ্ঞাস করল, আপনার অবস্থা কেমন? তখন তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন

خرجت من الدنیا وقامت قیامی+ غداة یقل الحاملون جنازتی
وعجل اهلی حفر قبری وصیرو+ حزوجی وتعلیلی الیه کرامتی
کأنهم لم یعرفوا قط صورتی+ غداه انی یومی علی ولیالی

অর্থাৎ আমার অবস্থা হলো, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি, আর যে দিন উঠানেওয়ালা আমার লাশ উঠাবেন, সে দিন আমার কিয়ামত আসবে। আত্মীয় স্বজনরা আমার জন্য দ্রুত কবর খনন করাবে, আর কবরের দিকে দ্রুত নিয়ে যাওয়াটাকে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন মনে করবে। যে দিন আমার মৃত্যুর দিন ও রাত আমার উপর আসবে, সে দিন তাদের অবস্থা এমন হবে যেন তাহারা আমাকে চিনে না।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রাহ:)

তাহার জন্ম হয় ৯৯ হিজরীতে।

আব্দুর রহমান বিন মাহদী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সুফিয়ান এক রাত আমার কাছে ছিলেন। হঠাৎ তিনি কান্নাকাটি করতে শুরু করলেন। তখন কোন একজন বলল اراك كثير الذنوب অধিক গুণাহের কথা স্বরণ করে বোধ হয় আপনি কাঁদছেন, তখন সুফিয়ান সাওরী বালু হাতে উঠিয়ে বললেন

والله لذنوبى اهون عندى من ذار আমার সারা জীবনের গোনাহ এই বালুকের দানা থেকে তুচ্ছ। তবে আমার কান্নাকাটির কারণ

انى اخاف ان اسلب الايمان قبل ان اموت আমার ভয় হলো মৃত্যুর সময় আমার ঈমান হরণ করা হয় কিনা?

সুফিয়ান সাওরী বলেন, খাঠি আল্লাহ ওয়ালা ছাড়া কম সংখ্যক লোকই ৪টি আত্মিক রোগ থেকে মুক্ত থাকে। তা হলো (১) লালচ (২) মিথ্যা কথা বলা (৩) শেকায়াত (৪) অহংকার।

মৃত্যুকালে তাঁকে لا اله الا الله বলার জন্য বলা হলে, তিনি বললেন

ليس الى...امر এ ব্যাপারে আমার কোন হস্তক্ষেপ নাই। অর্থাৎ আমি সম্পুর্ণ আল্লাহর কুদরতি হস্তে বাধিত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাহার কাছে জিম্মী। (এহইয়াউল উলুম খন্ড ৪-পৃষ্ঠা ৬৮১)

ইবনে মাহদী বলেন, সুফিয়ান সাওরী যে রাতে মারা যান সে রাতে নামাজের জন্য ৬০ বার ওজু করেন। ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথে বললেন, হে মাহদী আমার চেহারা জমিনে রেখে দাও। আমি এখন মারা যাব। আরো বললেন, হে মাহদী يا ابن محمدى ما اشد الموت ما اشد كرب الموت অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা কত কঠিন।

মাহদী বলেন এ অবস্থা দেখে বাইরে বের হই, হাম্মাদ বিন যায়েদ এবং অন্যান্য লোকদেরকে জানানোর জন্য। আমি দরজার কাছে পৌঁছতেই দেখি তারা শোকবার্তা হিসাবে বলতে লাগল اجرك الله তখন আমি তাদের জিজ্ঞাস করলাম তোমরা তাহার অবস্থা সম্পর্কে কিভাবে অবগত হলে, তারা বলল, আমরা প্রত্যেকেই রাতের বেলা স্বপ্নে শুনতে পেয়েছি

الان سفيان قد مات অর্থাৎ সুফিয়ান সাওরী মারা গেছেন। শেষ মূহুর্তে নিকটে ছিলেন হাম্মাদ বীন সালামা তিনি বলেন সুফিয়ান সাওরী এক দীর্ঘ শ্বাস নিলেন, হাম্মাদ বললেন হে সুফিয়ান ابشر قد نجوت مماكنت تخاف যে ব্যাপারে

209

আপনার ভয় ছিল তা থেকে তুমি মুক্ত হয়ে গেছ। এখন তুমি আল্লাহর কাছে গমনকারী।

সুফিয়ান সাওরী বললেন, হে আবু সালামা, তুমি কি মনে কর আমার মত গোনাহগারকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তখন আবু সালামা বললেন

والله الذى لا اله الا هو অর্থাৎ ঐ আল্লাহর কছম যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমার এই শপথ মূলক জবাব শুনে তিনি প্রশান্তি লাভ করেন।

তাঁর মৃত্যু ১৬১ হিজরীতে বসরায় হয়।

ইবনুল মোবারক বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরীকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলাম, আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন ? জবাবে সুফিয়ান বললেন, আমি রাসুল (সাঃ) ও তার সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি।

ইবনে উয়াইনা স্বপ্নে তাঁকে দেখে বললেন কিছু ওসিয়ত করেন। সুফিয়ান বললেন মানুষের সাথে পরিচয় পরিচিতি কম কর। (কিতাবুররূহ)

কুবায়সা বিন উকবাহ (রাহঃ) বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরীকে স্বপ্নে দেখে বললাম আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন ? তখন তিনি কবিতা আবৃতি করেন

نظرت الى ربى عيانا فقال لى+ هنيأ رضاى عنك يا ابن صعد

فقد كنت قواما اذا الليل قدوجا+ بعبرة محزون وقلب عميد

فدونك فاختر اى قصر تريده+ زرنى فانى منك عند بعيد

অর্থ: আমি আমার রবকে সম্মুখ সমরে দেখলাম, তিনি আমাকে বলেন, হে ইবনে সাআদ আমার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি মোবারকবাদ, কারণ তুমি গভীর রজনীতে তাহজ্জুদ আদায়কারী ছিলে, তোমার চোখ থেকে পরকাল বিষয়ে চিন্তা অস্থিরতার অশ্রু প্রবাহিত হত। অন্তর ব্যথিত থাকত। এবার তোমার ইচ্ছামত জান্নাতের যেই বালাখানা চাও গমন কর। আমার দর্শন গ্রহন কর, কারণ আমি তোমার নিকটেই আছি।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আমি সুফিয়ানকে স্বপ্নে জান্নাতের খেজুরের এক গাছ থেকে উড়ে অন্য গাছে বসতে দেখলাম। আবার সেই গাছ থেকে উড়ে অন্য খেজুরের গাছে বসতে দেখলাম, আর তিনি বলতেছেন এমন নেয়ামত লাভের জন্য সৎকর্মশীলরা যেন আমল করে। তাঁকে জিজ্ঞাস করা হলো, কোন আমলের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করেছ? সুফিয়ান বললেন,

210

তাকওয়া পরহেযগারীতার কারণে। তাকে আলী বিন আসিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো? সুফিয়ান বললেন, আমি তাঁকে তারকার মত দেখেছি।
(কিতাবুর রূহ ৭১-৭২)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহ:)

তিনি ১০৭ হিজরীর মাঝামাঝিতে কোফায় জন্মগ্রহন করেন।
সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আমার বয়স যখন পনের বছর হয় তখন আমার পিতা আমাকে ডেকে ওসীয়ত করলেন। আমি জীবনের প্রত্যেক মুহুর্তে ওসীয়ত গুলোর প্রতি লক্ষ রেখেছি।
সাঈদ ইবনে দাউদ (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন,

من كانت معصية فى الشهوة فأرج له القوبة فان ادم عصى مشتهيا فغفرله
فاذا كانت معصية فى كبر فاخشى على صاحبة اللغة فان ابليس عصى
مستكبرا فلعن

তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র হাছান বিন ইমরান বলেন, আমি চাচার সাথে ১৯৭ হিজরীতে তাহার জীবনের সর্বশেষ হজ্জ পালন করি।
আমরা মুজদালিফায় থাকাকালিন সময়ে দেখলাম একদা চাচা নামাজ পড়ে বিছানায় শুয়ে বলতে লাগলেন আমি সত্তুর বছর ধরে এখানে আসছি আর এই দোয়া করেছি اللهم اخرالعهد من هذا المكان এখন এই দোয়ার আধিক্যতার কারণে আমি আল্লাহর কাছে লজ্জিত।
ঐ হজ্জের সফর থেকে ফেরার পর ১১৮০ হিজরীর রজব মাসে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মক্কা মুআজ্জামা থেকে একটু দুরে তাকে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯১ বছর।
(সিফাতুস সাফওয়া)

মুজাহিদ বিন জবর (রাহ:)

তিনি মক্কা মুআজ্জমার মুফাসসির ও ফক্বিহদের একজন ছিলেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, মুজাহিদ বলেন ইবনে আব্বাস (রা:) এর কাছে আমি তিন বার কুরআন শরীফ এভাবে পুনরাবৃত্তি করেছি, যে আমি প্রত্যেক আয়াত পড়ে থামতাম আর জিজ্ঞাসা করতাম كيف انزلت وكيف كانت

211

এই জন্যই তো সুফিয়ান সাওরী বলতেন

خذوا التفسير من اربعة مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك

ফজল বিন দুকাইন বলেন মুজাহিদ (রাহঃ) ১০২ হিজরীতে সেজদার অবস্থায় মারা যান। আর ইউসুফ বিন সুলায়মান বলেন ১০৩ হিজরীতে মক্কা মুকাররমায় ইন্তেকাল করেন।

ছিলাহ বিন আশয়াম আদাবী (রাহঃ)

তিনি রুশ শাসনাধিন অঞ্চল মাওরাউন নহরের জিহাদে ব্যস্ত ছিলেন।
একদা জিহাদ চলাকালীন সময় তাহার ছেলেকে বললেন, হে প্রিয় বৎস

لقد وجاهد اعداء الله حتى احتسبك عند الذى لاتضيع عنده الوداته

এই যুদ্ধে ছেলে প্রথমে শহীদ হন। তারপর ছিলাহ বিন আশিম আদাবী (রাহঃ) শহীদ হন, উভয়ের মৃত্যুসংবাদ যখন বসরায় পৌঁছল, তখন মহিলারা তাহার স্ত্রীকে শোক জানাতে আসতে শুরু করল।

তখন মুআযা আদাবী বলছিলেন, যদি তোমরা তাদের দুনুজনকে আশির্বাদ জানাবার জন্য আস, তাহলে আসতে পার। শোক জানাবার উদ্দেশ্য থাকলে ফিরে যাও। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিদান দান করুক।

(তাবকাতুল কুবরা, হিলয়াতুল আউলিয়া, উসদুল গাবাহ)

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান

তাঁর মৃত্যুর নিকটবর্তি সময়ে দেখা গেল দামেশকের আশপাশে একজন ধোপা (কাপড় ধৌতকারী) ব্যক্তিকে দেখলেন কাপড় ধৌত করছে। আব্দুল মালিক এ দৃশ্য দেখে বললেন, হায় আল্লাহ! কতইনা ভালো হত, আমি যদি ধোপা হতাম আর নিজ হাতে উপার্জন করে খেতাম। দুনিয়ার কোন কিছুর দায়িত্বশীল না হতাম। আবু হাজিম এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহর শুকর তিনি ঐ শাসকদের এমন বানিয়েছেন যে তারা মৃত্যুকালে আমরা যে অবস্থায় আছি সে অবস্থায় থাকার কামনা করেছেন। কিন্তু আমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তাদের অবস্থার কামনা করবনা।

আব্দুল মালিকের মৃত্যুকালে কেহ তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, আব্দুল মালিক বললেন আমি আমাকে আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী সেই অবস্থায় পেয়েছি আল্লাহ বলেছেন

212

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

অর্থ তোমার আমার কাছে একাই আসবে, যে ভাবে প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। আর আমি তোমাদেরকে যতসব নিয়ামত দান করেছি তা তোমরা পিছনে ছেড়ে আসবে।

(এহইয়াউল উলুম উর্দূ খন্ড ৪ পৃষ্টা ৬৭৭)

খলিফা হারুনুর রশিদ (রাহ:)

খলিফা হারুনুর রশিদ সম্পর্কে লিখা হয়, তিনি মৃত্যুকালে নিজের কাফন নিজ হাতে নিয়ে যাচাই করেন আর বলতে থাকেন,

ما اغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانية অর্থাৎ আমার সম্পদ আমার কোন কাজে আসেনি আমার বাদশাহী ধ্বংস হয়ে গেল।

ঐ সময় তিনি ছাই বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়লেন আর বলতে থাকলেন, হে ঐ সত্ত্বা যার বাদশাহী কখন শেষ হয়না। আপনি রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপর যার বাদশাহী শেষ হয়ে যাচ্ছে।

খলিফা মুনতাসির বিল্লাহর অবস্থাও অনুরূপ ছিল। তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার পর বললেন, যদি আমি জানতাম আমার আয়ূ স্বল্প তাহলে যা করেছি তা কখনও করতাম না। মৃত্যুকালে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। লোকেরা তাকে বলল আপনার তো কোন ভয় নাই তাহলে এত বিচলিত কেন? মুনতাসির বললেন হ্যা আমার কোন শঙ্কা নাই, তবে কথা হলো দুনিয়া আমার থেকে চলে যাচ্ছে আর আখেরাত নিকটবর্তী হচ্ছে।

(এহইয়াউল উলুম উর্দূ)

তাহার খাদিম মাসরুর বলেন, খলিফা হারুনুর রশিদ মৃত্যুকালে নিজের কাফন দেখার কামনা করেন। আমি যখন তাহার কাফন তাহার কাছে নিয়ে গেলাম তখন আমাকে তাহার জন্য কবর খনন করতে বললেন। আমি যখন কবর খনন করলাম তখন তিনি খাদেমদেরকে বললেন তাকে তারা নিয়ে যেন কবর দেখাইয়া আসে। খাদেমরা তাকে নিয়ে কবর দেখাল। তখন থেকে দেখা গেল তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে আছেন। অতপর এই আয়াত পড়লেন

ما اغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانية

(তাবকাতে শাফিয়া ৮ম খন্ড ২৮৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা সাবুনী (রাহঃ)

শায়খুল ইসলাম আবু উছমান সাবুনী ৭০ বছর পর্যন্ত ওয়াজ নসিহত করেছেন। ২০ বছর জামে মসজিদের খতিব ছিলেন।

ফক্বীহ আবু সাঈদ সুক্কারী সাবুনীর কথা নকল করেন, সাবুনী রহ. বলেছেন

ان الشيخ الاسلام قال مارويت حبرا ولا اثرا فى المجلس الا وعندى اسناده وما دخلت بيت الكتب قط الا على طهارة وما رويت الحديث ولا عقدت المجلس قط ولاقعدت للتدريس الا على الطهارة

যখনই আমার কাছে এ ছহীহ হাদিছ পৌছল যে রাসুল (সা:) জুমআর রাতে এশার দুই রাকাআতে সুরা জুমআ ও মুনাফিকুন পড়তেন। তখন থেকে আমি আর কোন দিন জুমআর রাতে এশার নামাজে এই সুরাদ্বয় পড়া ছাড়িনি। এমনকি একবার এক সফরে ভয়ংকর এক এলাকা যেখানে আমার সাথীদের চোর ডাকাতের ভয় হচ্ছিল, সেই সময় ও আমি এই দুই সুরার তেলাওয়াত ছাড়িনি। বরং এই দুই সুরা তেলাওয়াতের বদৌলতে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজতে রেখেছেন।

তাহার জিবনীতে লিখা হয়।

فَكَانَ مِنْ قَضَاءِاللهِ تَعَا لَى أَنَّهُ كَانَ يَعْقِدُ الْمَجْلِسَ فِيْمَا حَكَاهُ الْأَثْبَاتُ وَالثِّقَاتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ خَانِ الْحُسَيْنِ عَلَى الْعَادَةِ الْمَأْلُوْفَةِ مُنْذُ نيّف وَ سِتِّيْنَ سَنَةً .

এই অভ্যাস মোতাবিক ওয়াজে মগ্ন থাকা অবস্থায় বুখারা থেকে একটি চিটি আসল, যাতে উল্লেখ ছিল সেখানে বড় এক মহামারী বিস্তার লাভ করেছে। ফলে মানুষ একে একে মারা যাচ্ছে। আপনি এই মহামারী দুর হওয়ার জন্য দোয়া করুন।

এই মহামারী এতই ভয়ংকররূপ ধারণ করেছিল যে, এক ব্যক্তি দোকানে রুটি তৈরী করছিল। আর দোকানের মালিক বিক্রয় করছিল। ইত্যবসরে এক গ্রাহক এসে রুটি চাইল বিক্রেতা তাকে রুটি দিতে চাইলে লোকটি পড়ে মারা গেল, সাথে সাথে বিক্রেতা এবং রুটি প্রস্তুতকারীও পরে মারা গেল।

যাই হোক আল্লামা সাবুনী এই চিঠি লোকদেরকে পড়ে শুনালেন। অতপর কারী সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসলেন, তাকে বললেন তুমি ঐ আয়াত তেলাওয়াত কর

أفأمن الذين مكروالسيئات ان يخسف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون

ক্বারী তেলাওয়াত করার সাথে সাথে ছাবুনী (রাহ:) এর অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল, পেটে ব্যাথা অনুভতি করলেন, সাথে সাথে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন, অধিক ব্যাথার কারণে চিল্লাতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হলো পরে অধিক চিল্লা চিল্লি করতে দেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। সাত দিন পর্যন্ত চিকিৎসা করে কোন উপকার দেখা গেলনা। সপ্তম দিন ছিল শুক্রবার রাত। সেই রাত মৃত্যু যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা দিল। ছেলেকে ডেকে ওসীয়ত করলেন যে আমার মৃত্যুর পর বিলাপ করিওনা।

সন্তানকে ওসিয়ত করার পর চিল্লা চিল্লি আওয়াজ বেড়ে গেল। তখন কারী সাহেবকে ডেকে আনা হলো। কারী তার সামনে ইয়াসিন তেলাওয়াত শুরু করলেন, এক পর্যায়ে অবস্থা যখন কিছুটা স্বাভাবিক হলো, তখন তিনি পড়তে লাগলেন ان رسول الله قال من كان اخر كلامه لا اله الاالله دخل الجنة এইটুকু বলেই সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন।

৪৪৯ হিজরীর ৪ মুহাররাম শুক্রবার মৃত্যু হয়। আছরের সময় হুসাইন ময়দানে জানাযা পড়ে দাফন করা হয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল ৩৭৩ হিজরীতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৭ বছর।

(আল-মুনতাখাব মীন কিতাবিস সিয়াক লি তারিখে নিশাবুরী)

ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল জুওয়াইনী (রাহ:) এর স্বপ্ন তাহার ব্যাপারে সুসংবাদ বহন করে। আবু মাআলী ঐ স্বপ্ন দেখার পুর্ব পর্যন্ত ফলাসাফা এবং মুতাযিলা ও আহলুস সুন্নাতের মতাদর্শ গ্রহনে দিধা ধন্ধতায় ছিলেন। কোনটি গ্রহন করবেন? তখন স্বপ্ন যোগে দেখলেন রাসুল (সা:) বলতেছেন عليك باا عتقاد الصابونى ছাবুনীর মতবাদ আকড়ে ধর।

(বুসতানুল মুহাদ্দিসীন ১৫৩)

হাফেজ আহমদ ছাহেব (রাহ:)

তিনি আব্দুল কাদির রায়পুরী (রাহ:) এর পিতা ছিলেন। কুরআন শরীফের দক্ষ একজন হাফেজ ছিলেন। হাফেজদের বড় একটি দল তিনি তৈরী করেছিলেন। তাহার মৃত্যুর সময় সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে তার সামনে সুরা ইয়াসিন পড়তে শুরু

215

করলেন। তিনি তাকে পড়তে বাধা দিয়ে হাফিজ রওশন দিন কে পড়ার আদেশ করলেন। হাফেজ সাহেব যখন তেলাওয়াত করতে করতে
بلى وهوالخلق العليم পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন ইচ্ছাকরে থেমে গেলেন। উদ্দেশ্য হলো তিনি কোন লোকমা দেন কিনা তা দেখার জন্য। বাস্তবেই দেখা গেল তিনি লুকমা দিলেন। হাফেজ রওশন আবার পড়া শুরু করলেন যখন শেষ আয়াত পড়লেন فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ واليه ترجعون তখন আহমদ ছাহেব ও ঐ আয়াত পড়লেন সাথে সাথে রূহ বের হয়ে গেল। (ছাওয়ানিহে আব্দুল কাদির রায়পুরী ৩৮)

শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী (রাহ:)

যখন শাওয়ালের চাঁদ উদয় হলো তখন তাহার সকল প্রকার মনো চাহিদা শেষ হয়ে গেল। দিন দিন দুর্বলতা বেড়েই চলল। এমনকি এক পর্যায়ে ডায়রিয়া হলো, ফলে জীবনের আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে মৃতু লোকের মতো পড়ে থাকলেন। আমি (লিখক) তখন তাহার কাছে ছিলাম তাহার জবানে তখন চালু ছিল استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم এক পর্যায়ে শরীর সুস্থ হলো। কিছু দিন সুস্থ অবস্থায় কাটালেন। সফর মাসের প্রথম দিনগুলোতে রোগ আবার আক্রমন করল। এক দিন রাতের বেলায় মৃত্যুর আলামত তার চেহারায় দেখা গেল।

তখন তিনি দৃঢ় ইচ্ছা করলেন, ফজরের নামাজ যেভাবেই হউক পড়তে হবে, কাযা করা যাবে না। কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন ফজর হয়েছে কিনা? উপস্থিত লোকেরা বললেন, না এখনো সময় হয়নি। তখন তিনি ধমক দিয়ে বললেন, আমার নামাজের সময় হয়ে গেছে যদিও তোমাদের হয়নি। অতপর বললেন আমাকে কিবলামূখী কর। তখন তিনি ইশারায় নামাজ পড়লেন। যদিও তখন নামাজের ওয়াক্তের ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। ওয়াক্ত হয়েছে কিনা? নামাজ পড়ে যিকির করা শুরু করলেন। যিকির করতে করতে জীবন নামক আমানতকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেন। তাহার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল ১১৩১ হিজরীর ১২ সফর বুধবার।

তখন বাদশাহ ফরখ সিয়ারের শেষ সময় ছিল। হযরতের ইন্তেকালের ১ মাস বিশ দিন পর বাদাশাহ ফরখ সিয়ার বন্দী হন। এ বছর অনেক ঘঠনা ঘটেছে।

চিতুড় বিজয়, শাহ জাহান জামে মসজিদ নির্মান এই ইত্যাদি ঐ বছর হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল ৭৭ বছর

(আনফাছুল আরিফিন ১৯০-১৯১)

হযরত হাসসান বিন সিনান (রাহঃ)

একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বন্ধু-বান্ধবরা তার শারীরীক অবস্থার জানার জন্য তার কাছে গিয়ে বলল, আপনার মানুষিক অবস্থা কেমন? তিনি বলেন, জাহান্নাম থেকে যদি বেঁচে যাই, তাহলে আমার মেজাজ রুচি ভালো নতুবা কোন রুচি আমার নেই। তাহারা বললেন, আপনার মন কিছু চায়? তিনি বললেন আমার মন চায় মরার আগে লম্বা একটা রাত যেন আমি পাই যাতে আমি ঐ রাত্রি ইস্তেগফার ও নামাজে কাটাই।

যখন তার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলো, তখন একজন বলল আপনার বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে? তিনি বললেন, কষ্ট হচ্ছে অবশ্যই তবে এই কষ্টের কি তুলনা হতে পারে, সেই অবস্থার সাথে যখন মুমীন বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে আর তার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি বিস্তার করবে।

(ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৭৯)

মালিক ইবনে দিনার (রাহঃ)

মালিক ইবনে দিনার বলেন, আমার এক প্রতিবেশি অসৎ ছিল। তার মৃত্যুকালে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম তুমি আর গোনাহ করবেনা এরকম ওয়াদা আল্লাহর সাথে করনি কেন? হতে পারে এই ওয়াদার উপর তুমি মৃত্যু- বরণ করবে। আর এটা উপকারী হবে তোমার জন্য।

মালিক বলেন, সে এটার কোন জবাব দিল না। তবে ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ আসল, হে জনাব যদি এমন ওয়াদা আপনি তাকে করান, আপনি যেমনটা আমাদের সাথে করেন। আজ ওয়াদা করলেন তো কাল ভঙ্গ করলেন তাহলে তাকে এ রকম ওয়াদা করানোর কোন ফায়দা নেই। বরং এর দ্বারা সে আরো ক্রধান্নিত হবে। এ কথা শুনে মালেক বেহুশ হয়ে পড়ে যান।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আজিজ বলেন, আমার পিতা মালেক ইবনে দিনার সম্পর্কে বলেন, যখন মালেক একথা বলতেন

217

عَجَبًا لِمَنْ يَعْلَمُ اَنَّ الْمَوْتَ مَصِيْرُهُ وَالْقَبْرَ مَوْرِدُهُ كَيْفَ تَقَرُّ بِالدُّنْيَا عَيْنُهُ وَكَيْفَ يَطِيْبُ فَيْهَا عَيْشُهُ.

এটুকু বলেই বেহুশ হয়ে যেতেন।

আব্দুল্লাহ বিন মারযুক বলেন একদা মালেক ইবনে দিনার কবরস্থানে গমন করেন, এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তিকে দাফন করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলতে লাগলেন غدا مالك এই কথা বারবার বলতে থাকলেন। বলতে বলতে একপর্যায়ে কবরের মধ্যে পড়ে যান। অতপর বেহুশ অবস্থায় উঠাইয়া বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

জাফর বিন সুলায়মান বলেন, মালিক ইবনে দিনারের জামাতা বলেন এক রাতের পুর্ণ অংশ মালিক ইবনে দিনারা কে বলতে শুনেছি

يارب اذا جمعت الاولين والاخرين فحرم شيبة بن مالك بن دينار على النار ।

ফজর পর্যন্ত এই কথাগুলি বলতে থাকলেন।

(সিফাতুস সাফওয়া)

আবু ঈসা বলেন মৃত্যুযন্ত্রণার সময় মালিক ইবনে দিনার বলতেছিলেন

لمثل هذا اليوم كان دؤوب ابى يحى

(আহ মুহতাজারুন, সিফাতুস সাফওয়া)

উমারা বিন যাযান মালিক ইবনে দিনারের ওসিয়ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মালেক বলেছেন যদি এটি অপছন্দনীয় না হত তাহলে আমি পরিবারের লোকদেরকে বলতাম তোমরা আমার মরনের পর আমাকে জিঞ্জির দ্বারা বেধে চক্কর দিও। আর হাতগুলোকে ঘাড়ে বেধে পলায়নকারী গোলামের ন্যায় দাফন করিও, যাতে এ অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির হই। যখন আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাস করবেন এ অবস্থা কেন? তখন আমি বলব

يارب لم ارض لك نفسى قط

আমার অন্তর কখনও আপনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়নি।

(আল মুহতাজারুন)

সুহাইল বলেন আমি মালিককে স্বপ্নে দেখে বললাম হায় যদি আমি জানতাম আপনি আল্লাহর দরবারে কি নিয়ে গেছেন? মালিক বললেন অনেক গুণাহ নিয়ে হাজির হয়েছি। কিন্তু আল্লাহর প্রতি সুধারনা থাকার কারণে আমার গুণাহ মিটিয়ে দিয়েছেন।

(কিতাবুর রূহ)

হযরত ফাতাহ বিন শাহরাফ রহ.

উনার ব্যাপারে ইমাম আহমদ বলেন ماخرجت خراسان مثل فتح بن شهرف ফাতাহ বিন শাহরফের মত আর কোন ব্যক্তিকে খুরাসান জন্ম দেয়নি।

হুসাইন বিন ইয়াহইয়া আরমুবী (রাহঃ) বলেন ফাতাহ তার ঘরের দরজায় লেখে রেখেছিলেন

رحم الله ميتا دخل على هذا الميت فلم يذكر الموتي عنده الابخير আহমদ বিন আব্দুল জাব্বার স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন তিনি ত্রিশ বছর ফাতাহের সাথে ছিলেন। এই ত্রিশ বছরের ভিতরে ফাতাহ আসমানের দিকে থাকাতে দেখিনি। ত্রিশ বছর পর একবার আসমানের দিকে মাথা উঠিয়ে চোখ খুলে বলেন. قَدْ طَالَ شَوْقِيْ اِلَيْكَ فَعَجِّلْ قُدُوْمِىْ عَلَيْكَ হে প্রভু আপনার সাক্ষাতের প্রেরনা দীর্ঘ হয়ে গেছে, আপনার নিকট পৌছার দ্রুত ব্যবস্থা করুন।

এ ঘটনার এক সপ্তাহ পার হতে না হতেই ফাতাহ ইন্তেকাল করেন।

(ফাযায়েলে সাদাকাত ৪৮৪)

ফাতাহ (রাহঃ) নিজের ব্যাপারে বলেন, আমি আলী (রাঃ) কে স্বপ্নে দেখে আমাকে ওসিয়ত করতে বললাম।

আমীরুল মুমিনীন আলী (রাঃ) বললেন, ধনিরা গরীবদের সামনে নম্রতা প্রদর্শন করা কতইনা ভালো। তার থেকে ভালো হলো গরীবরা ধনিদের থেকে বিমূখ হয়ে থাকা।

ফাতাহ (রাহঃ) মৃত্যু ২৭৩ হিজরীর শাওয়ালের মাঝামাঝি সময় মঙ্গলবারে হয়।

আবু মুহাম্মদ হারীরী (রাহঃ) বলেন, আমি ফাতাহকে গোসল করানোর সময় তার ডান পার্শ্ব যখন উঠাই তখন ডান রানের উপর লিখা দেখলাম خلقه الله

(সিফাতুস সাফওয়া)

ইব্রাহিম বিন ইসহাক হারাবী (রাহঃ)

তিনি ১৯৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন। ২৮৫ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

219

তিনি বলতেন আমাকে হরবী বলার কারণ হলো একদা একটি দলের সাথে কারখ নামক স্থানে হাদিছ অনুসন্ধানের জন্য সফর করি। সেখানকার লোকদের প্রথা ছিল হরবীদের পুরাতন সেতু কেউ পার হলে সে হরবী হিসাবে গন্য হবে। এইজন্য আমাকে হরবী বলা হয়, যেহেতু আমি এই সেতু পার হয়েছি। (তাই হরবী বলা হয়)

ইব্রাহিম বিন ইসহাক বলেন, আমার কষ্টের কথা কখনো ঘরের লোকের কাছে ব্যক্ত করিনি। কারণ মানুষ হলো ঐ ব্যক্তি যে তার নিজের চিন্তা পেরেশানীর সাথে পরিবারের লোকদেরকে জড়িত করেনা। আমার পয়তাল্লিশ বছর অর্ধ মাথা ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলাম, কিন্তু আমি পরিবারের কাউকে বলিনি। দশ বছর চোখ যন্ত্রনায় কষ্ট পেয়েছি। এক চোখে দেখতাম তাও কাউকে জানাইনি।

তাঁর একজন সন্তান এগার বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেছেন। আর এই বয়সেই তিনি তার সন্তানকে অনেক ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেন।

একদিন তিনি বলতে লাগলেন كنت اشتهى موت ابنى هذا আমি আমার ছেলের মৃত্যু কামনা করছি। তখন মুহাম্মদ বিন খালফ বললেন, আপনি একজন আলেম হয়ে সন্তানের মৃত্যু কামনা কিভাবে করেন?

ইবরাহিম বিন ইসহাক বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি তা হলো আমি দেখলাম কিয়ামত সংগঠিত হয়েছে। আর ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে পানির পাত্র, তাহারা প্রচন্ড গরমের সময়ে লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছে।

আমি একটি বাচ্চাকে পানি পান করানোর জন্য বললাম, সে আমাকে বলল ليس انت ابى তুমি আমার পিতা নও।

আমি বললাম তোমরা কারা? সে বলল আমরা হলাম ছোট বেলা মৃত্যু বরনকারী বাচ্চা আমরা পিতা বা মাতাকে ছেড়ে রেখে এসেছি। তারা যখন এ জগতে আসেন তখন আমরা অভ্যার্থনা জানাই পানি পান করাই। এই স্বপ্ন দেখে আমার আকাংখা তৈরী হলো যে, আমার জীবদ্দশায় আমার ছেলে মারা যাক।

ঈসা বিন মুহাম্মাদ তুমারী বলেন, ইবরাহিম অসুস্থতার সময় আমরা তাহার কাছে গেলাম এমতাবস্থায় তার প্রস্রাব পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিছুক্ষন পর তাহার বাদী প্রশ্রাব ফিরিয়ে নিয়ে এসে বলল,

ডাক্তার মারা গেছে। একথা শুনে ইবরাহিম (রাহ:) তাৎক্ষনিক কবিতা আবৃতি করলেন

اذا مات المعالج من سقاصى+ فيوشك للمعالج ان يموتا

যখন চিকিৎসক মারা গেছে তাহলে অচিরেই রোগিও মারা যাবে।

মুহাম্মদ বিন সিরিন (রাহ:)

তিনি মৃত্যুকালে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাস করা হলো কাঁদেন কেন? তিনি বললেন বিগত জীবনের ত্রুটির জন্য কাঁদছি, ২য় তো এই ত্রুটির কারণে কাঁদছি এখন আমাকে আগুনে জ্বালানো হবে।

তাঁর ইন্তেকালে তাঁর কিছু শিষ্য অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এসকল শিষ্য ছাত্রদের কেউ কেউ স্বপ্নে মুহাম্মদ বীন সিরিনকে উত্তম অবস্থায় দেখলেন। তারা তাঁকে বললেন, আপনার এ অবস্থা দেখে খুব আনন্দ পাচ্ছি। হাছান বছরীর অবস্থা কি?

মুহাম্মদ বিন সিরিন (রাহ:) বললেন, তিনি আমার থেকে সত্তরগুণ উচু মর্যাদায় উন্নিত হয়েছেন। শিষ্যরা বলল তাহার কেন এত মর্যাদা লাভ হলো? আমরাতো আপনাকে অধিক শ্রেষ্ঠ মনে করতাম। তিনি বললেন কারন হলো হাছান বছরী (রাহ:) সর্বদা আখেরাতের চিন্তায় চিন্তীত থাকতেন।

(কিতাবুর রূহ)

হযরত আতা সুলামী (রাহ:)

আতা (রাহ:) অসুস্থতার সময় একদা হাসান বছরী (রাহ:) তাঁর কাছে গেলেন। অসুস্থতার কারণে আতা সুলামী (রাহ:) এর শরীর পীত বর্ণ হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে হাসান বছরী (রাহ:) বললেন, আপনি ঘরে পড়ে থেকে হতাশায় ভোগছেন। যদি আঙ্গিনায় চলে যান তাহলে ভালো হবে। আতা সুলামী (রাহ) বললেন, আল্লাহ আমি আত্মার আনন্দে চেষ্টা করছি আল্লাহ আমাকে এ অবস্থায় দেখাটা আমার কাছে লজ্জা লাগে।

ছালেহ বিন বিশর (রাহ:) বলেন, আমি আতা সুলামীকে স্বপ্নে দেখে বললাম আপনি কি মারা যান নাই? আতা বললেন, মরবনা কেন? ছালেহ বললেন মৃত্যুর পর কিরূপ আচরন করা হলো? আতা বললেন, মহান কল্যান দানকারী ও মাফকারী আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছি। ছালেহ বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি

221

রহম করেছেন একথা কেন বলেন? আপনি তো দুনিয়াতে পরকালের ধ্যানেই মত্ত থাকতেন। আতা (রাহঃ) মুচকি হেসে বললেন, এ কারণেই তো চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করেছি। ছালেহ বললেন এখন কোথায় আছেন? আতা বললেন নবীগন, ছিদ্দিকগন, শহিদগন, ছালেহ গনের সাথে আছি।
(কিতাবুর রূহ)

মাওলানা জাফর আহমদ থানেশ্বরী (রাহঃ) কে ইংরেজদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের বিবরণ

হিন্দুস্থানে এক হাজার বছর ইসলামের পতাকা উড্ডিন থাকার পর এক সাথে মুসলামানদের পতন হয়নি, বরং ১৮৫৭ সনে ইংরেজদের প্রতি ঘৃন্য মনোভাব প্রকাশের পরও মুসলমানরা সময়ে সময়ে এ মহান উদ্দেশ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

স্বাধীনতাকামি দলের একজন ছিলেন জাফর থানেশ্বরী (রাহঃ)। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তিনি তার কিছু সাথীদের সাথে ইংরেজদের হাতে বন্দী হন। অতপর দীর্ঘদিন নির্যাতন ভোগ করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ জাফর যিনি তাঁর শহরের সরকারী টেক্স উসুল কারী এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী নেতা ছিলেন। তাঁর পেশা ছিল সম্মানজনক পেশা আদালতের কাগজ পত্র লেখা ইত্যাদি।

নিজের জীবনিতে লিখেন ২০ জনের মত লোক আমার অধিনস্ত ছিল। ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহন করে চলাফেরা করতাম,আমার ঘরের কাজ কর্মের জন্য চাকর ছিল। তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর তাহার উদ্দেশ্য জানার জন্য ইংরেজেরা তাকে অনেক কষ্ট দিল। এত বড় সম্মানী ব্যক্তি হওয়ার পরও ইংরেজরা তাকে সম্মান দেখালনা। বরং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বুট দ্বারা লাথি মারত, তথাপি তাকে তার স্বস্থান থেকে সরাতে পারে নাই। এত ধৈর্য্যতার সাথে সাথে আল্লাহর গোলামীর প্রতি তাদের প্রেরনা লক্ষ করার মত।

মুহাম্মদ জাফর বলেন, গ্রেফতারের প্রথম দিন আমাদেরকে আদালতে হাজির করা হলো। যখন জোহরের সময় হলো তখন আমরা দরখাস্ত করলাম আমাদেরকে নামাজের অনুমতি দেওয়া হউক। যাতে আমরা আদালতের বাহিরে যাইয়া উজু করে নামাজ পড়ে আবার ফিরে আসব।

222

বিচারক বলল, তোমাদের কারণে আদালত মুলতবি করব না। আমরা বললাম আমাদের উদ্দেশ্যে আদালত মুলতবি করা নয়। বরং আপনি আপনার আদালতের কাজ কর্ম চালিয়ে যান। এমনকি আমাদের শুনানী চলাকালে কাটগড়ায় দাড়ানোর সময় অনুপস্থিতির কারণে কোন ক্ষতির সম্মুখীন যদি হই তাহলে এই ক্ষতি আমরা মেনে নিতে পারি, কিন্তু নামাজ কাজা হওয়ার ক্ষতি সহ্য করতে পারবনা।

জাফর বলেন আমাদের একথা শুনে বিচারক ক্রধান্বিত হয়ে বলল, তোমাদেরকে বাহিরে যেতে দেওয়া হবে না। আমরা বললাম ঠিক আছে। একথা বলে জমিনে হাত মেরে তায়াম্মুম করে নামাজে দাড়িয়ে গেলাম আমি আর অন্য একজন মাওলানা সহ মোট ১০জন মিলে জামাতে নামাজ পড়লাম। ২০০ জন পুলিশ বন্দুক নিয়ে আমাদের দিকে তাক করিয়ে পাহারা দিতে শুরু করল। আদালতে উপস্থিত সকল লোকেরা এই দৃশ্য অবলোকন করতে লাগল। এ দৃশ্যটি বিরল একটি দৃশ্য ছিল। আমরা একদম ভয়ভীতি বিহিন শান্ত দিলে নামাজ পড়লাম। একাধারে দুই তিন দিন এভাবেই জোহরের নামাজ পড়লাম। আছরের নামাজ আদালত থেকে ফিরে এসে শেষ ওয়াক্তে পড়তাম। বিচারক আদালতে নামাজের এই দৃশ্য দেখে অবশেষে নির্দেশ করল, একজনকে দুই সিপাহি গার্ড দিয়ে বাহিরে নিয়ে যাবে নামাজ পড়ার পর আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এভাবেই যত দিন জোহরের সময় আদালতে হল, ততদিন এভাবেই একজন একজন করে গার্ডের সঙ্গে যাইয়া আদালতের পাশে একটি বাগানে নামাজ পড়লাম।

মৃত্যুযন্ত্রণার শুভাগমন ও শাস্তির রদবদল

এই কাহিনী অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী, স্বয়ং কাহিনীর নায়কের কাছ থেকে শুনুন।

মাওলানা মুহাম্মদ জাফর বলেন, বিচারক আমার দিকে তাকিয়ে বলল তুমিতো বড় জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, আইন বিষয়ে পারদর্শী। নিজের শহরে টেক্স উসুলকারী ব্যক্তি ছিলে। তোমার সকল জ্ঞান বুদ্ধি ইংরেজ সরকারের বিরোধীতায় ব্যয় করেছ। তোমার মাধ্যমে মানুষ আর টাকা সরকারের দুশমনের কাছে যাইত। সরকারের বিরোধীতা করেছ সরকারের জনকল্যানের কোন প্রশংসাও কর নাই। এই জন্য তোমাকে ফাসি দেওয়া হবে। তোমার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা

223

হবে। তোমার মৃত্যুর পর তোমার লাশও ওয়ারিছদের কাছে হস্তান্তর করা হবে না। অত্যন্ত অপমানের সহিত জেলের কবরস্থানে দাফন করা হবে।

শেষ কথা হলো তোমাকে ফাসিতে ঝুলন্ত দেখে আমি আনন্দ ভোগ করব। (এ পর্যন্ত বিচারকের বক্তব্য শেষ) জাফর (রাহঃ) ফাসির রায় কেমন আনন্দের সাথে গ্রহন করেছেন তা পরে উল্লেখ করা হবে।

মধ্যখানে একটি কথা শুনুন। জাফর সাহেব (রাহঃ) বলেন, আমি বিচারকের সকল কথা অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে শুনলাম।

তবে সর্বশেষ যে কথাটি তিনি বলেছেন, তার উত্তরে আমি বললাম জীবন দান করা ছিনাইয়া নেওয়া এটা আল্লাহর কাজ। আপনার অধিনে নয়। আল্লাহ ঐ সত্তা যিনি আমাকে মরন দেওয়ার আগে তোমাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন।

আমার একথা শুনে বিচারক অত্যন্ত ক্রোধান্নীত হলো। কিন্তু ক্রোধান্নিত হলে আর কি হবে? ফাসির হুকুম ছাড়া সে অতিরিক্ত আর কি করবে। নির্যাতন যা করার ছিল তা তো করেই ফেলেছে। কিন্তু আমি বিচারকের শেষ কথার জবাবে অন্তরে খোদা প্রদত্ত ঢেলে দেওয়া যে কথা জবান দ্বারা বলেছি। (আমার মৃত্যুর আগে তোমাকে ধ্বংশ করার ক্ষমতা আল্লাহ রাখেন) একথা এভাবে প্রতিফলিত হলো যে, আমি জীবিত থাকা অবস্থায় বিচারক হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে অজানা দেশের মুসাফির হয়ে যায়।

(তাওয়ারিখে আজিব ২৮/২৯)

বিচারক এবং বাদীর মধ্যে মৃত্যুর এই রদবদলতা বিরল। এ ঘটনার পর ফাসির রশির মধ্যে পরিবর্তন আনা হল।

মাওলানা জাফর (রাহঃ) বলেন, আমাদেরকে ফাসি দেওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বতার সাথে নতুন রশি বানানো হলো। আমি স্বাস্থ্যবান হওয়ার কারণে ফাসির কাষ্ঠ অত্যন্ত মজবুত করে নির্মাণ করা হলো। কিন্তু ভাগ্যের শক্তিবলে আমার ফাসি মওকুফ হয়ে গেল। ঐ সময়ে হত্যার অপরাধে একজন ইউরোপিয়ানের ফাসির হুকুম হল। তাকে ফাসি দিতে যাইয়া আমাকে ফাসি দেওয়ার জন্য যা প্রস্তুত করা হয়েছিল, এগুলি দিয়ে তাকে ফাসি দেওয়া হলো, (কথায় বলেন, অনিষ্ঠ সাধনকারী ব্যক্তি নিজেই অনিষ্ঠতার স্বীকার হয়ে গেল)

যে রশি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমার গলায় দেওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছিল, ক্ষমতার মালিক অন্তর পরিবর্তকারী সত্ত্বা তাদের স্বজাতীয় ভাইয়ের গলায় লাগিয়ে দিলেন, আর আমাকে বাচিয়ে দিলেন।

এ আশ্চর্য ঘটনার পর লোকেরা আল্লাহ পাকের এ রহস্য কে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন মনে করল।
ইউরিপিয়ান ব্যক্তির ফাসির পর ফাসির রশি টুকরা টুকরা হয়ে যায় পরে বরকত মনে করে মানুষ বন্টন করে নিয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক কথার পর এবার মৃত্যুদণ্ডের শুভাগমনের বিস্তারিত বিবরণ শুনুন

মাওলানা থানেশ্বরী বলেন, সে সময়ের কথা আবার খুব স্বরণ হয়, যখন আমাকে ফাসির আদেশ দেওয়া হয় তখন আমি এতই আনন্দিত হই যে, সাত মহাদেশের রাজত্ব মিললেও এ আনন্দিত হতাম না। আমার পরে মাওলানা ইয়াহইয়া ছাহেবকে ফাসির আদেশ দেওয়া হয়, তাহাকেও তখন খুব আনন্দিত দেখতে পেয়েছি। রায়ের দিন অনেক পুলিশ ও দর্শনার্থী নারী পুরুষ উপস্থিত ছিল, আনবালা জিলার আদালত প্রাঙ্গন লোকারন্য ছিল। পুলিশের ক্যাপ্টেন আমার কাছে এসে বলল তোমার ফাসির আদেশ হয়েছে তোমার জন্য তো কান্না করা উচিত। কিন্তু তোমাকে তো অত্যন্ত আনন্দিত দেখতে পাচ্ছি। আমি তার সাথে হেটে হেটে বললাম, শাহাদত যে কত বড় নিয়ামত তা তো তুমি জান না।
১৮৬৪ সনে ২রা মে ফাসির আদেশ আসার পর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমরা ফাসি দেওয়ার রুমে বন্ধি ছিলাম। জেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে ফাসি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে ইউরিপিয়ানেরা আমাদের নিয়ে কৌতুক করছে, শত শত নারী পুরুষ আমাদেরকে দেখার জন্য ফাসির ঘরে আসত। অন্যান্য ফাসির আসামির ন্যায় আমাদের চিন্তিত বিষন্নতার মত না দেখে আনন্দিত দেখে ইউরিপিয়ান দর্শনার্থীরা খুব আশ্চর্য্য হত। অনেকেই আমাদেরকে বলত তোমাদেরকে দ্রুত ফাসি দেওয়া হবে তোমরা এত আনন্দ কর কেন? আমরা উত্তরে শুধু এটুকুই বলতাম আমাদের ধর্মে এমন নির্যাতনে মারা গেলে শাহাদতের মর্যাদা নসিব হয়।
(তারিখে আজিব)

225

বাদশাহ আকবর

বাদশাহ জাহাঙ্গির তার ডায়েরীতে নিজ পিতার মৃত্যুর অবস্থা চমৎকার ভাবে লিখেন, তিনি লিখেন। জুমাদাল উলা মাসের রোজ মঙ্গলবার আমার পিতা ও মুরশিদের শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল হ্রাস হতে শুরু করল। আর বিদায় যাত্রা নিকট বর্তি হয়ে যায়। আমার পিতা আমাকে বললেন, লোক পাঠিয়ে আমার সকল প্রজা, ও নিকটাত্মায়ীদেরকে আহবান কর আমি তোমাকে তাহাদের কাছে ন্যস্ত করব। তাহারা আমার জন্য অনেক ত্যাগ করেছেন তাদের কাছ থেকে আমার জন্য মাফ চাও।

অতপর যখন সবাই হাজির হলো তখন পিতা তাদের দিকে মুখ করে মাফ চাইলেন, আর কিছু ফারসি কবিতা আবৃতি করলেন। মরণকালে আমার পিতা বললেন, আমার প্রধান বিচারককে বল, সে যেন আমাকে কালিমা শাহাদত পড়ায়। অতপর প্রধান বিচারক নতজানু হয়ে বসে কালিমা শাহাদত পড়লেন। তখন বাদশাহ উচ্চ আওয়াজে কালিমা শাহাদত পড়লেন, তারপর ইয়াসিন পড়তে বললেন, বিচারক ইয়াসিন পড়লেন ইয়াসিন পড়া যখন শেষ তখন বাদশাহ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করেন।

(উলামায়ে দেওবন্দ কা শানদার মাজি ১ম খন্ড ৭৫/৭৬)

সুলতানুল মাশায়িখ খাজা নেযামুদ্দীন (রাহঃ) এর খোদাপ্রেমে নিমজ্জিত হওয়া

হযরত খাজা নেযামুদ্দীন (রাহঃ) ৯১ বছর হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেন মৃত্যুর চল্লিশ দিন পুর্ব থেকেই আল্লাহর ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়ার অবস্থা তৈরী হয়। আমীর খুর্দ বিস্তারীত ভাবে মরণের অবস্থা লিখেন।

তিনি বলেন, শুক্রবার দিনে খাজা নেযামুদ্দীন (রাহঃ) খোদার নুরে তাহার ভিতর নুরান্নীত হয়ে গেছে মনে হল। যদ্দরুন দেখা গেল নামাজে বার বার সেজদা করতেন। খোদা প্রেমে নিমজ্জিত হওয়ার এ অবস্থায় বাড়িতে চলে গেলেন। দিন দিন কান্নাকাটি রোনাজারী বাড়তে থাকল। প্রত্যেকদিন একাধিকবার আল্লাহর ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া সৃষ্টি থেকে বিচ্ছেধতার অবস্থা সৃষ্টি হত। পরে আবার হুশ আসত। শুক্রবার দিনে বললেন, বন্ধুর ওয়াদার কথা বার বার স্বরন হচ্ছে। একথা বলে আবার আল্লাহর ধ্যানে নিমজ্জিত হয়ে যান।

নিমজ্জিত থাকাবস্থায় জিজ্ঞাস করলেন, নামাজের সময় হয়েছে? আমি কি নামাজ পড়েছি? যদি বলা হতো আপনি নামাজ পড়েছেন। তখন বলতেন আবার পড়ে নেই। প্রত্যেক নামাজের পুনরাবৃত্তি করতেন। খোদা ধ্যানে নিমজ্জিত থাকাকালে যত দিন পৃথিবীতে ছিলেন ২টি কথা বার বার বলতেন, আজ জুমআর নামাজ পড়েছি কি? আবার কখনও পংক্তি পড়তেন।

হযরতের দুনিয়া বিমূখতা

অসুস্থ অবস্থায় একদিন সকল খাদেম মুরিদদেরকে ডাকলেন, সবাই আসার পর তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, যদি ইকবাল (খাদেম) ঘরের কোন জিনিস সংরক্ষন করে তথাপি কিয়ামতের দিনে জবাব দীহী হতে হবে।

ঐ সময় ইকবাল বলল, আমি ঘরে কোন জিনিস ছেড়ে দেই নাই, সব আপনার জন্য সদকা করলাম। ঐ লোকটি খানকার ফকীরদের কিছুদিনের খাবার রেখে সকল কিছু বন্টন করে দেন।

আমার চাচা সৈয়দ হুসাইন জানালেন, শস্য ছাড়া বাকী সব কিছু দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। সুলতানুল মাশায়িখ নিযামুদ্দীন (রাহঃ) ইকবালের প্রতি খুবই ক্রোধান্বিত হলেন, আর তাকে বললেন এই সামান্য তুচ্ছ সম্পদ গুলো কেন রাখলে? ইকবাল বললেন- খাদ্যশস্য ছাড়া যা কিছু ছিল সবকিছু বণ্টন হয়ে গেছে। তিনি বললেন- সকলকে ডাক, যখন লোকেরা হাজির হল তখন তিনি বললেন শস্যের স্তুপ ভেঙ্গে ফেল। এবং সকল শস্য নির্বিঘ্নে উঠিয়ে নিয়ে যাও। এবং ঐ জায়গা ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করে ফেল। সামান্য সময়ের মধ্যে লোকেরা জমা হয়ে গেল এবং সমস্ত শস্য লুটে নিল।

এই অসুস্থতার সময় কিছু বন্ধু খেদমতে উপস্থিত হলেন। এবং তারা জিজ্ঞাস করলেন, মাখদুমের চলে যাওয়ার পরে আমাদের মত নিঃস্বদের কী হবে? তিনি বললেন, এখানে এতটুকু মিলবে যতটুকু দ্বারা তোমাদের চলবে।

(সিয়ারুল আউলিয়া-১৫২-১৫৩)

আমীর খোর্দ লিখেন, কিছু বন্ধু বান্ধব আমার নানা শামছুদ্দীন দামগানী কে বলল, তিনি যেন নিযামুদ্দীন (রাহঃ) এর সাথে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করেন, যে আমরা নিজ নিজ সিমানায় উচু উচু বিল্ডিং নির্মান করেছি। আর আমাদের সকলের নিয়ত হুজুর প্রত্যেকের বিল্ডিংয়ে আরাম করেন। আর মৃত্যু যদি চলে

আসে তাহলে তিনি যেন বলে দেন কার বিল্ডিংয়ে দাফন করা হবে। যাতে পরবর্তিতে মনগড়া কোন রায় সৃষ্টি না হয়।

মাওলানা শামছুদ্দীন (রহ.) নিজামুদ্দীনকে একথা শুনানোর পর নিজামুদ্দীন (রাহ:) বললেন, আমি কোন বিল্ডিংয়ের নিচে দাফন হতে চাইনা বরং জংগলে দাফন হতে চাই। অবশেষে তাহার চাওয়া মুতাবিক ময়দানে দাফন করা হলো। পরবর্তিতে তার মাযারে সুলতান তুঘলক গুম্বুজ নির্মান করেন।

দান দাক্ষিন্যতা

মরণকালে নিজামুদ্দীন (রাহ:) বললেন, আমার ঝুড়ি নিয়ে আস। ঝুড়ি নিয়ে আসা হলো। ঝুড়ি থেকে একটি পাগড়ি কোর্তা জায়নামাজ খেলাফত প্রদানের কাপরের টুকরা বাহির করে মাওলানা বুরহান উদ্দিনকে দান করেন। এবং আরেকটি পাগড়ি কোর্তা মাওলানা শামছুদ্দিন ইয়াহইয়াকে দিলেন। এভাবেই সমস্ত ঝুড়ির কাপড় মুরিদদের মধ্যে বন্টন করেন।

ঐ সময় শায়খ নাসীরুদ্দীন মজলিসে ছিলেন, তাহাকে কিছু দেন নাই বিধায় মজলিসের সবাই আশ্চর্য হলেন। কিছুক্ষন পর শায়খ নাসিরুদ্দীনকে ডেকে পাশে এনে তাকে একটি জায়নামাজ তাছবিহ কাটের তৈরী একটি পেয়ালা প্রদান করেন, এগুলো হচ্ছে ঐ সকল জিনিস যে গুলী খাজা ফরীদ উদ্দীন গাঞ্জেসাকর (রাহ:) তাহাকে দান করেছিলেন। অতপর শায়খ নাসীরুদ্দীনকে বললে তুমি দিল্লিতে অবস্থান করবে আর মানুষের জুলুম অত্যাচার সহ্য করবে। (খাজিনাতুল আসফিয়া ১৯০)

মৃত্যু

মৃত্যুর ৪০ দিন পুর্ব থেকে খাবার গ্রহন বন্ধ করে দেন। খানার ঘ্রান সহ্য করতে পারতেন না, অন্য দিকে আহাজারী কান্নাকাটি এতই বেড়ে গেল যে, এক মুহুর্তের জন্য চোখ পানি মুক্ত হত না।

এ সময় একজন বন্ধু মাছের সামান্য ঝুল নিয়ে আসলেন সাথীবর্গরা খুব চেষ্টা করল একটু খাওয়ানোর জন্য। নিজামুদ্দীন (রাহ:) বললেন, এটা কি? বলা হলো মাছের সামান্য ঝুল। তিনি বললেন প্রবাহমান পানিতে ছেড়ে দাও। আমার চাচা সায়্যিদ হুসাইন (রাহ:) কে বলা হল, তিনি যে আজ কদিন যাবৎ

228

খাবার গ্রহন করছেন না এর পরিনতি কি হবে? সয়্যিদ হুসাইন বললেন, যে ব্যক্তি রাসুলের (সা:) সাক্ষাতে পাগল পারা সে দুনিয়ার খাবার খাবে কি ভাবে? মোট কথা চল্লিশ দিন যেভাবে খাবার খান নাই, ঠিক তেমনি ভাবে কথা বার্তা খুব কম বলছেন। শেষ বুধবার যে দিন তিনি মারা যান সে দিন পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিলেন।

যখন মৃত্যুকালীন অসুস্থতা বেড়ে গেল তখন ঔষধ খাওয়ার জন্য বলা হল, তিনি বললেন প্রেমের অসুস্থের চিকিৎসা প্রেমিকার সাক্ষাৎ ছাড়া আর কিছুই নাই।

৭২৫ হিজরীর মোতাবেক ১৩৬৪ ইংরেজীতে ১৮ ই রবিউল আওয়াল বুধবার মৃত্যু বরন করেন। তার লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় একজন কবি সাথে ছিল। সে কবিতা আবৃতি করতে ছিল।

তাঁর জানাযা পড়ান শায়খুল ইসলাম বাহাউদ্দিন জাকারিয়া রহ. এর নাতি শায়খুল ইসলাম রুকুনুদ্দীন। নামাজের পর শায়খ রুকুনুদ্দীন বললেন, এবার আমার বুঝে আসল আমাকে ৪ বছর দিল্লিতে রেখেছেন যাতে জানাযা পড়ানোর সৌভাগ্য আমার হাছিল হয়।

(ছিয়ারুল আউলিয়া ১৫৪/১৫৫)

তাঁর মাজার শরীফ দিল্লিতে। যেখানে আজও সর্বস্তরের জনসাধারনের ভিড় লেগে থাকে।

ওসিয়ত মোতাবেক তাকে খোলা ময়দানে দাফন করা হয়, যদিও পরবর্তিতে সুলতান তুঘলক মাজারকে বিল্ডিং আকারে বানিয়ে দেন।

তিনি অবিবাহিত ছিলেন বিধায় বংশীয় কোন সন্তান নাই, তবে রূহানী আওলাদের মাধ্যমে তার শিক্ষা এখনও চালু আছে।

হযরত মাহবুব এলাহি (রাহ:)

গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের পর সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক সিংহাসনে আরোহন করেন। এ সময় হযরত মাহবুব এলাহি মৃত্যুকালীন অসুস্থতায় আক্রান্ত ছিলেন। শায়েখ রুকুনুদ্দীন তাহাকে দেখতে গেলেন। এ সময় মাহবুব এলাহি (রাহ:) খোদা প্রেমের জগতে নিমজ্জিত ছিলেন।

মুরীদরা পেরেশান হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় মাহবুব এলাহির সাথে শায়েখ রুকুনুদ্দীন সাহেবের সাক্ষাৎ কিরূপ হবে? কিন্তু দেখা গেল শায়খ রুকুনুদ্দীন

229

যাওয়ার সাথে সাথে মাহবুব এলাহীর ধ্যান চলে গেল। মাহবুব এলাহি রুকুনুদ্দীনকে শ্রদ্ধা জানাতে নিজে চৌকি থেকে নীচে অবতরন করতে চাইলেন। কিন্তু অধিক দুর্বলতার কারনে নীচে নামতে পারছেন না। তাই শায়খ রুকুনুদ্দীন তাকে চৌকিতে বসতে বললেন। শায়খ রুকুনুদ্দীন মাহবুব এলাহির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চৌকিতে বসলেন না অবশেষে চেয়ার আনা হলে চেয়ারে বসলেন।

চেয়ারে বসে শায়খ রুকুনুদ্দীন কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ জীবন মৃত্যুর ব্যপারে নবীদেরকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন। আর ওলীরা হলেন নবীদের স্থলাভিষিক্ত, অতএব ওলীদের ও এখতিয়ার লাভ হয়। অতএব আপনার হায়াত যদি আরো কিছু দিন বৃদ্ধি হত তাহলে অযোগ্যদেরকে আপনি পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারতেন।

মাহবুব এলাহি একথা শুনে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি রাসুল (সাঃ) আমাকে বলছেন নিযামুদ্দীন তোমার সাক্ষাতে আগ্রহী হয়ে আছি।

শায়খ রুকুনুদ্দীন একথা শুনে বিলাপ করতে শুরু করেন। সঙ্গে উপস্থিত লোকেরাও কান্না করতে লাগল। শায়খ রুকুনুদ্দীনের সাক্ষাতের পর পরই মাহবুব এলাহি ইন্তেকাল করেন। শায়খ রুকুনুদ্দীন জানাযার ইমামতি করেন, আর এ ইমামতি করাটাকে সর্বদা তার গৌরবের বিষয় মনে করতেন।

(ছিয়ারুল আউলিয়া ১৪১, মাতলুবুত ত্বালিবীন ৯৪-৯৭)

শায়খ রুকুনুদ্দীন (রাহঃ)

তিনি মাহবুব এলাহির মৃত্যুর দশ বছর পর মাহবুবে হাকীকীর ডাকে সাড়া দিয়ে মিলিত হন। মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব হতে মানুষের সাথে চলা ফেরা মিলা মিশা কথা বার্তা পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন। শুধু জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য কামরা থেকে বের হতেন।

৭৩৫ হিজরীতে ১৬ ই রজব শুক্রবার দিন মাগরিবের নামাজের পর আওয়াবিন পড়া অবস্থায় সিজদাতে ইন্তেকাল করেন। মুলতান প্রদেশে তাহার দাদা ও পিতার কবরের পাশে তাহার দাফন করা হয়।

(বজম সুফিয়া ৩১৬/৩১৭)

শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া সোহরায়ার্দি (রাহঃ)

মৃত্যুর দিন তিনি নিজ কক্ষে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। রুমের বাহিরে হঠাৎ একজন নুরানী চেহারার লোকের আবির্ভাব ঘটল। নুরানী চেহারার ব্যক্তি শায়খ সাদরুদ্দীনের হাতে মোহর এটে দেওয়া একটি চিটি দিলেন। চিটির শিরোনাম দেখে শায়খ ছদরুদ্দীন হতভম্ব হয়ে পিতার কাছে চিটিটি পেশ করেন। বাহিরে এসে আর দুতকে পেলেন না। এদিকে চিটি পড়েই শায়খ বাহাউদ্দিনের রূহ মাটির পিঞ্জিরা থেকে বের হয়ে যায়। আর উচ্চ একটি আওয়াজ হয়

"বন্ধু বন্ধুর কাছে পৌঁছে গেছে"।

এ আওয়াজ শুনে শায়খ ছদরুদ্দীন দৌড়ে রুমে প্রবেশ করে দেখলেন আওয়াজ বাস্তবেই পরিণত হয়ে গেছে।

হযরত বাবা গঞ্জেশাকার (রাহঃ) এর মালফুজাত রাহাতুল কুলুবে উল্লেখিত, যে সময় বাহাউদ্দিন (রাহঃ) ইন্তেকালে করেন। সে সময় আজবিদাহানে হযরত বাবা গাঞ্জে শাকার (রাহঃ) বেহুশ হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ পর হুশ ফিরে আসার পর বললেন, আমার ভাই বাহাউদ্দিন যাকারিয়াহ এই অস্থায়ী পৃথিবী ছেড়ে চিরস্থায়ী জগতে চলে গেছেন। অতপর বিছানা থেকে উঠে মুরীদদের নিয়ে গায়েবানা জানাযা পড়েন।

(বজম সুফিয়া ১৩০)

শায়খ খাজা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ (রাহঃ) এর উপর তাঁকে হত্যা করার জন্য অক্রমন

শায়খ খাজা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দিল্লী একদিন জোহরের নামাজ জামাতে পড়ে এসে নিজ রুমে মোরাকাবায় মগ্ন হলেন। এসময় তুরাব নামক এক সন্যাসি রুমে প্রবেশ করে ছুরি দ্বারা এলোপাতাড়ী আঘাত করে জখম করে দেয়। রক্ত হুজরার বাহিরে প্রবাহিত হতে লাগল। কিন্তু খোদার ধ্যানে কোন প্রভাব ফেলল না। রক্ত দেখে মুরিদরা ভিতরে প্রবেশ করে সন্যাসি কে শাস্তি দিতে চাইলে শায়খ চেরাগ বাধা দিলেন। আর মুরিদদেরকে বিশেষত আব্দুল মুকতাদরি, ছদরুদ্দীন তিবী, যয়নুদ্দীন আলীকে ডেকে কছম দিয়ে বললেন, কোন ব্যক্তি যেন সন্যাসিকে কষ্ট না দেয়। অতপর সন্যাসিকে ক্ষমা করে বললেন, আমাকে যখম করতে গিয়ে তোমার হাতে কোন ব্যাথা পেয়ে থাকলে

231

ক্ষমা করে দিও। এবং কিছু মিষ্ঠি দ্রব্য দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। খাজা নাসিরুদ্দীন (রাহ:) এই মহাগুণের ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে চিশতিয় ছিলছিলার মধ্যে ধৈর্য্য, আল্লাহর ফয়ছালা উপর সন্তুষ্টি এবং নিজেকে সমর্পন করা এই গুণগুলো তাঁর পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয় যায়।

মৃত্যু

এই যখমের পর তিন বছর পর্যন্ত সৃষ্টিকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ৭৫৭ হিজরীর ১৮ ই রামাজান শুক্রবার রাতে ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুর পুর্বে মাওলানা যায়নুদ্দীন বললেন, আপনার অধিকাংশ মুরীদরা আল্লাহ ওয়ালা অতএব কোন একজনকে স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ঘোষণা করুন। যাহাতে আপনার ছিলছিলা চালু থাকে। শায়খ বললেন, ঐ সকল লোকদের নাম লিস্ট করে নিয়ে আস। যাদেরকে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য মনে কর। মাওলানা যয়নুদ্দীন উচ্চ, মধ্যম, নিম্ন এই তিন স্তরের বুজুর্গদের নাম লিখে নিয়ে আসলেন। শায়খ বললেন, এরা তো হল ঐ সকল লোক যারা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে কষ্ট সহ্য করেছে কিন্তু অন্যের বোঝা বহন করেনি।

অতপর ওসিয়ত করলেন দাফন করার সময় শায়খ নিযামুদ্দীন (রাহ:) এর দেওয়া কাপড় আমার বুকের উপর এবং তাঁর লাটি আমার পার্শে, তাঁর তাছবিহ শাহাদত আঙ্গুলির মধ্যে, তাহার দেয়া পেয়ালা ইটের বদলা আমার মাথার নিচে, জুতা মোবারক আমার বগলে রেখে দিবে। ওসিয়ত মোতাবেক প্রত্যেকটি জিনিস যাথাযত রাখা হল।

হযরত খাজা সায়্যিদ মুহাম্মদ গিছদরাজ (রাহ:) তাঁকে গোসল দেন। যেই চাদরে গোসল দেওয়া ঐ চাদর শরীর থেকে আলাদা করে গিছুদরাজ (রাহ:) নিজের কাঁধে রেখে বলেন, এটাই আমার জন্য বরকতের জামা। তাঁর মাজার দিল্লিতে রয়েছে।

(বজম সুফিয়া ৩৮৯/৩৯০)

শায়খ বুরহানুদ্দীন গরীব (রাহ:)

মৃত্যুর তিন বছর পূর্ব থেকে লাগাতার অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু এ অসুস্থতার সময়ও মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখানো, ইবাদত রিয়াযতের কাজ

232

ধারাবাহিক চালু ছিল। চিকিৎসার হুকুম করতেন না, বরং বলতেন আমার চিকিৎসা হলো

ذكر حبيبى আমার প্রেমিকের স্বরণ। মাঝে মধ্যে কাঁদতেন, তবে মুরীদদের বলতেন তোমরা মনে করনা অসুস্থতার কষ্টে কাঁদছি। শেষ সময়ে মুরীদরা দিল্লিতে নিয়ে যেতে চাইলে বর্তমান মাজার যেখানে সেখানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এখান থেকে যাব না।

শেষ দিনগুলোর একদিন মুরিদদেরকে ডেকে নসিহত করলেন। আর প্রত্যেকের হাতে কিছু কাপড় দিলেন। মৃত্যুর দিন নিজ মুরীদ খাজা নেযামুদ্দীন (রাহ:) এর তাছবীহ চাইলেন। তাছবীহ সামনে রাখলেন, আর নিজের পাগড়ী গলায় ঝুলিয়ে বললেন, মুসলামন হও রাসুলের উম্মত হও। শায়খের মুরীদ হও। আমি নেককার ছিলাম না। নেক কর্মের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করি নাই। অতপর মুরশীদের তাছবীহ দ্বারা নতুন বায়আত গ্রহন করে কাঁদতে লাগলেন।

চাশতের সময় বিশেষ খাদেমকে ডেকে বললেন, বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিয়ে বোর্ডিংয়ে গিয়ে খেয়ে আস। খাজা তাদেরকে নিয়ে গেল। এক দিকে বন্ধুরা খাবার খাচ্ছে অপর দিকে শায়খ (রাহ:) নিজ মুরশিদের বরকতী কাপড় খণ্ড চাইলেন আর এই সময়ই ইন্তেকাল করলেন।

৭৩৮ হিজরীর সফর মাসে মৃত্যু হয়। খলদাবাদ এর মধ্যে দাফন করা হয়। (বজম সুফিয়া ৩৩৭/৩৩৮)

শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ (রাহ:)

শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ বিন ইয়াহইয়া মুনীরী (রাহ:) ৭৮২ হিজরীর ৬ই শাওয়াল বুধবার এশার নামাজের সময় পরকালে পাড়ি জমান। এই দিনের ফজরের নামাজের সময় থেকে আখেরাতের প্রস্তুতি শুরু করেন। মুরীদদের ডেকে কাহারো সাথে মোআনাকা কাহারো সাথে মুসাফাহা করলেন। কাহারো দাড়িতে চুমু দিলেন। কাহাকেও দোয়া দিলেন। নসীহত করলেন। বারবার কুরআনের আয়াত এবং কালিমা পড়লেন। আর বললেন আগামীকাল তোমাকে জিজ্ঞাস করা হবে, কি নিয়ে এসেছ। একথা বলে আবার বলেন

لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم

তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গোনাহ মাফ করবেন।

233

সাথে একটি কবিতাও পড়লেন।
মাগরিবের সময় ওজু করে নামাজ পড়ে কালিমা তাইয়্যিবাহ পড়তে থাকেন। মাগরিবের নামাজের পর শায়খ জলীলুদ্দীন, শিহাবুদ্দীন, কাজী শামছুদ্দীন, কাজী নুরুদ্দীন প্রমুখ গন এসে তাহার চৌকির চার দিকে বসলেন। কিছুক্ষণ পর উচ্চ আওয়াজে بسم الله পড়লেন কয়েকবার بسم الله পড়লেন উচ্চস্বরে অতপর পড়লেন لااله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
আবার উচ্চস্বরে পড়লেন بسم الله الرحمن الرحيم অতপর কালিমায়ে শাহাদত পড়লেন তারপর لاحول ولاقوة الابالله পড়লেন।
অতপর আরো কিছুক্ষণ কালিমা শাহাদত পড়লেন। আবার কয়েক বার
بسم الله الرحمن الرحيم - لااله الاالله محمد الرسول الله পড়লেন অতপর অত্যন্ত আগ্রহভরে পাঠ করলেন اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد
অতপর আয়াত পড়লেন ربنا انزل علينا مائدة من السماء
তারপর বল رضينا بالله رباوبالاسلام ديناوبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
তারপর আবার তিনবার কালিমা তাইয়্যিবাহ পড়েন, আসমানের দিকে হাত উচু করে অত্যন্ত আগ্রহভরে মোনাজাতের মত বললেন।
اللهم اصلح امة محمد اللهم ارحم امة محمد اللهم اغفر لامة محمد اللهم تجاوز عن امة محمد اللهم اغث امة محمد اللهم انصرمن نصر دين محمد اللهم فرج عن امة محمد فرجا عاجلا اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك ياارحم الراحمين
এই বাক্যগুলি বলে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।
এ সময় জবানে চালু ছিল لا خوف عليهم ولاهم يحزنون-لااله الاالله
তারপর بسم الله الرحمن الرحيم বলে প্রাণ আল্লাহর কুদরতি হস্তে অর্পণ করেন।
৭৮২ হিজরীর ৬ই শাওয়াল বুধবার রাতে এশার নামাজের সময় ইন্তেকাল হয়ে। পরের দিন চাশতের নামাজের সময় দাফন করা হয়।
(তারীখে দাওয়াত ও আজীমত ২৩৫)
মৃত্যুকালে ওসিয়ত করেছিলেন, তাঁর জানাযার ইমামতি এমন ব্যক্তি যেন করেন যিনি বিশুদ্ধ সায়্যিদ বংশের হন। বাদশাহী পরিত্যাগকারি হন এবং সাত কেরাতের হাফেজ হন।

234

জানাযার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল, এমন সময় হযরত আশরাফ জাহাঙ্গির সোমনানী (রাহ:) এর আগমন ঘটল। এই তিন শর্ত একমাত্র তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি জানাযার ইমামতির সৌভাগ্য অর্জন করেন।
মোবারক কবর বিহার শরীফ অবস্থিত।
(বজম সুফিয়া ৪৩১/৪৩২)

হযরত সায়্যিদ ইলমুল্লাহ (রাহ:)

১২ই রবীউল আউয়াল তিনি জন্মগ্রহন করেন। ছোট বেলাতেই পিতা-মাতা হারা হন। মামার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। এভাবেই তাঁর জীবনের সূচনা রাসুলের জীবনের ন্যায় শুরু হয়। গোটা জীবন সুন্নতের অনুসরণ অনুকরণ এবং সুন্নতের প্রচারে অতিক্রান্ত করেন। আল্লাহর কি করুণা, রাসুল (সা:) যে বয়সে মারা যান, তিনিও সেই বয়সে মারা যান।
তাযকিরাতুল আবরারে উল্লেখিত, সায়্যিদ শাহ ইলমুল্লাহর অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁর বয়স যেন রাসুলের বয়স থেকে অতিক্রম না করে আল্লাহ তার সেই আশা পুরণ করেন। ১০৯২ হিজরীতে ৯ই জিলহজ্বে ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

আওরঙ্গজেবের স্বপ্ন

আওরঙ্গজেব আলমগীর (রাহ:) ঐ তারিখে স্বপ্নে দেখলেন রাসুল (সা:) এর ইন্তেকাল হয়েছে। ফেরেস্তাগন রাসুলের লাশ মোবারক আসমানের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এ স্বপ্ন দেখে বাদশাহ ইতস্ততায় পড়ে গেলেন। উলামাদের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলেন।
উলামাগণ বললেন, স্বপ্নের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, এই রাতে সায়্যিদ মোহাম্মদ ইলমুল্লাহ (যিনি সুন্নাতে রাসুলের পুরাপুরী অনুসারী ছিলেন) মারা গেছেন। বাদশাহ স্বপ্ন দেখার তারীখ লিখে রাখার হুকুম দিলেন। অতপর অনুসন্ধান করে জানা গেল সায়্যিদ ইলমুল্লাহ ঐ রাতেই মারা গেছেন।
আওরঙ্গজেব পরে বললেন, স্বপ্ন শোনার পরপরই এই তা'বীর উনাদের মাথায় কিভাবে আসল। উলামাগণ বললেন সুন্নতের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ অন্য ব্যক্তিকে আমরা দেখি নাই। সুন্নতের অনুসরণ ও রাসুলের প্রতি অকৃতিম

ভালোবাসা এবং সুন্নত ও মুসতাহাবের অধিক গুরুত্বারোপ ও সর্বদা পালনের কারণে সে কালের অনেক উলামাদের উপরেও তাঁকে সম্মানিত মনে করা হত। (তাযকিরাতে শাহ ইলমুল্লাহ ১০৭/১০৮)

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (রাহঃ)

সিপাহ সালারের বর্ণনা, মাওলানা রুমীর ইন্তেকালের চল্লিশ দিন পুর্ব থেকে প্রত্যেক দিন ভুমিকম্প হত। জ্যোতিস্কবীদের বর্ণনা হলো মাওলানা রুমী (রাহঃ) শয্যাশায়ী হওয়ার পর থেকে লাগাতার সাত দিন ভুমিকম্প হল। লোকেরা অপারগ হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে রুমী (রাহঃ) এর কাছে সাহায্য চাইল। রুমী (রাহঃ) বললেন জমিন ক্ষুধার্ত হয়ে গেছে, খাবার চাচ্ছে, অচিরেই সফল হয়ে যাবে, মানুষের এই কষ্ট দুর হয়ে যাবে। ঐ সময়ে তিনি কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

চিল্পি হুসামুদ্দীন (রাহঃ) বর্ণনা করেন, একদিন শায়খ ছদরুদ্দীন (রাহঃ) মান্যবর বুজুর্গদের সাথে রুমী (রাহঃ) কে দেখতে যান। তিনি রুমী (রাহঃ) এর শারীরীক অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ে দোয়া করলেন, আল্লাহ দ্রুত আরোগ্য করে দেন। রুমী (রাহঃ) বললেন, এখন অসুস্থতা নিরাময় হওয়া আপনার জন্য বরকতময়, কিন্তু আশিক মাশুকের মধ্যখানে জামায় একটি সুতা রয়ে গেছে, তুমি কি চাওনা সেটাও দুর হয়ে যাক? আর নুর নুরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাক।

মৃত্যুকালে আরও কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। হুসামুদ্দীন চিলানী (রাহঃ) এই কবিতাগুলো লিখছিলেন আর কাঁদছিলেন।

যে কবিতাগুলোর মর্ম হল

১. রুমাল বালেশের উপরে রেখে দাও। আমাকে একা ছেড়ে দাও। হে রাতে আগমনকারিরা অমি ধ্বংশশীলের কোমর ফোড়া করে দাও।

২. আমি হলাম কালো রাতের ঢেউ। যাতে একাকিত্বের দিনে তাকে ক্ষমা করা হোক বা তার উপর কঠোরতা করা হোক।

৩. তুমি আমার থেকে পলায়ন কর যাতে তুমিও বিপদে পতিত হয়ে না যাও। নিরাপদ রাস্তা অবলম্বন কর। বিপদের রাস্তা পরিত্যাগ কর।

৪. আমি এবং আমার ঘরের কোণে ক্রন্দন করা, আমার চোখের পানির উপরে শত বিপদের চাক্কি চালানো হয়েছে।

৫. পেরেশান হই যে আমাকে বাঁচানো হয়েছে। কিন্তু শক্ত পাথরের মত টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, রক্ত প্রবাহিত হওয়ার চিন্তা কর।
৬. মৃত্যু ছাড়া এমন কষ্ট রয়েছে যার কোনো ঔষধ নাই। আমি কিভাবে বলব এই কষ্টের চিকিৎসা কর।
৭. সুন্দরের বাদশাহর উপর ওয়াদা পুর্ণ করা ওয়াজিব নয়। হে হলুদ চেহারাধারি আশিক তুমি ধৈর্য ধর। এবং ওয়াদা পুর্ণ কারি থাক।
একদম মৃত্যুর মুহুর্তে কয়েকটি কবিতা পাঠ করলেন (যেগুলোর মর্ম হল)
১. গতকাল আমি স্বপ্নে প্রেমাচ্ছন্ন এক বুযুর্গকে দেখলাম তিনি আমাকে হাত দ্বারা ইশারা করলেন আমার দিকে আস।
২. যদি তুমি মুমিন এবং মিষ্ট হও তাহলে তোর মৃত্যু মুমিন এবং যদি কাঁফির এবং তিক্ত হও তাহলে তোমার মৃত্যুও কাফির।
৬৭২ হিজরী সনের ৫ জুমাদাল উখরা মাগরীবের সময় হকীকত মা'রেফাতের ওয়াজ করা অবস্থায় মারা যান। মরন কালে তাহার বয়স ছিল ৬৮ বছর তিন মাস।
(তারিখে দাওয়াত ও আজিমাত)

শাহ নুর মুহাম্মদ (রাহঃ)

মৃত্যুর এক বছর পূর্ব হতে সকল আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্কের ইতি ঘটান, এমনটা কেন করলেন? তা জিজ্ঞাস করলে তিনি উত্তরে বললেন, আমার তো কথাবার্তা হল কুরআন হাদিস নিয়ে। এটা কার সাথে করব? কে বুঝবে?
যখন শাহ সাহেবের অবস্থা বেশি শোচনীয় হয়ে গেল তখন মুরীদরা দাফন কোথায় করবে এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে চাইল। খাজা মুহাম্মদ আকিল লোকদের অধিক পিড়াপিড়ির কারণে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মাজার কোথায় হবে? শাহ নুর (রাহ:) জবাব দিলেন, আমি অদৃশ্যের জ্ঞানী নয়। আল্লাহই জানেন কোথায় হবে?
১২০৫ হিজরীর ৩ জিলহজ্ব তাহার রুহ মাটির এ পিঞ্জিরা ছেড়ে যায়।
(তাকমিলা ছিয়ারুল আউলিয়া ১৩৯)

237

একজন চুলের সুন্দর্যবর্ধনকারির কাহিনী

খাজা বান্দা নেওয়াজ গিছুদরাজ (রাহ:) বলেন, সমস্ত কল্যাণতার মুল উৎস হল ২টি জিনিস। (১) আত্মার পবিত্রতা। (২) অন্তর আল্লাহর দিকে ধাবিত করা। ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবীগণ (সা:) নিজ নিজ উম্মতকে এই দুই জিনিসের পথপ্রদর্শন করেছেন। নবীগন ওলীগণ এই দুইটি বিষয় দ্বারা নবুওয়াত ওলায়াতের উচ্চস্তর লাভ করেছেন। খান হউক আর বাদশাহ হউক যে কোন ধরনের পেশাজীবী হউক, যাহার এই দুই জিনিস হাসিল হয়ে যাবে সেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে। অপর দিকে কেহ যতই টাকা ওয়ালা হউক যদি এই দুই জিনিস হাছিল করতে না পারে, তাহলে শিকড় বিহীন তৃণলতার সমান কোন মূল্য নাই।

খাজা বান্দা নেওয়াজ কাহিনী বর্ণনা করেন। দিল্লিতে একজন চুলের সুন্দর্যবর্ধনকারি ছিল। একবার দিল্লিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ তাঁর কাছে এসে বলল খাজা সাহেব বৃষ্টি হচ্ছে না। মানুষ খুব কষ্টের মধ্যে আছে।

ঐ ব্যক্তি বলল আল্লাহ কিভাবে পানি বর্ষণ করবেন। পানি বর্ষণ করলেতো আমি ভিজে যাব। এদিকে আমার ছোট ঝুপড়ি ঘর ভেঙ্গে যাবে লোকেরা বলল আমরা নতুন করে নির্মান করে দিব। লোকটি বলল যদি তোমরা নতুন করে নির্মান করে দাও তাহলে আমি আল্লাহকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করতে বলব।

এলাকার লোকেরা এক-দুই ঘন্টার ভিতরে সকলে মিলে ঝুপড়ি ঘর মেরামত করে দিল। অতপর লোকেরা এসে খবর দিল ঘর নির্মান হয়ে গেছে। তখন ঐ ব্যক্তি চেহারা উপরের দিকে উঠাইয়া বলল হে প্রভু তুমি তো পানি বর্ষন করছ না আমি ভিজে যাব এ জন্য। আর এ সকল লোকেরা আমার কুড়ে ঘর নতুন করে নির্মান করেছে এবার পানি বর্ষন কর।

সাথে সাথে দেখা গেল, আকাশে মেঘ জমা হয়ে গেল, ঠান্ডা বাতাশ চালু হলো বড় বড় ফোটা দিয়ে বৃষ্টি বর্ষন হল, সারা দিন বর্ষণ হল, এমনকি প্রবল বর্ষনে তাহার ঘরের রশি ছিড়ে গেল এবং পানি টপ টপ করে ঘরে পড়তে লাগল। তখন ঐ ব্যক্তি আসমানের দিক চেহারা উঠিয়ে বললেন আমি কি বলেছিলাম এমন প্রবল বৃষ্টির কথা যার দরুন রশি ছিড়ে ভিতরে টপ টপ করে পানি ঘরে

238

পড়বে এমন বর্ষন দ্বারা ফায়দা কি? হালকা বৃষ্টি বর্ষন কর। এর দ্বারা ফসলের ফায়দা হবে। এ কথার ফলে বৃষ্টি হালকা হয়ে বর্ষন হল।
এ ঘটনা শায়খ গিছুদরাজ (রাহ:) বর্ণনা করে বলেন, এবার তোমরা কি বল, ঐ ব্যক্তি তো সাধারন চুলের মেকার। কিন্তু সে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। দুনিয়ার কাজ কর্মের কারণে মানুষের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হতে পারে না। (মালফুজাত খাজা ৪২১)

লাহা নামক এক মালির ঘটনা

হযরত গিছুদরাজ (রাহ:) বলেন দ্বীনদার লোকের উচিত এশকের আগুন বারবার জালিয়ে রাখা। তিনি বলেন মাও.রুকুনুদ্দীন (যিনি খাজা নিজামুদ্দীনের একান্ত বন্দুদের একজন ছিলেন) কথার মাঝখানে বললেন সব কিছু হলাম লাহা হতে পারলাম না।
আমরা বললাম লাহা কে?
তিনি বলেন সে একজন মালি। বাগানের রক্ষক। দিল্লির সিমানার বাইরে এক বাগানের রক্ষনাবেক্ষন করতেন। ঐ মালির একবার বাগানের মালিকের শাহজাদীর প্রতি চোখ পড়ে যায়। ফলে ঐ মালি (বাগানের রক্ষক) আসক্ত হয়ে পড়ে। একেক রকমের বাহানা করে সে তার সামনে যেত। বিভিন্ন ধরনের ফল মুলের স্তুপ তার সামনে রাখত। সকাল থেকে মাগরিব পর্যন্ত এ কাজ করত। যখন সন্ধা হয়ে যেত শাহজাদী পালকিতে চড়তেন এবং পালকির পর্দা ফেলে দেওয়া হত। এবং তিনি অড়ম্বরপুর্ণ ভাবে ঘরে ফিরে যেতেন।
কোথায় মাহজাদী এবং কোথায় লাহা। এভাবে শাহজাদী প্রতিদিন বাগানে যাওয়া আসা করত। চড়ুই পাখির মত আসত অর্থাৎ চুড়ই পাখি যেভাবে এক ডালে কিছুক্ষণ বসে আবার উড়ে যায়। শাহজাদী ও কিছুক্ষণ বাগানে অবস্থান করে ফিরে আসে। এদিকে লাহার দিন দিন অস্থিরতা বাড়ছে। একদিন সে নিজেও পালকির পিছনে পিছনে ঘরে যেয়ে পৌঁছল।
লোকেরা মনে করল যেহেতু সারা দিন ফলমুল শাহজাদীর সামনে পেশ করে তাই এবার পুরুস্কার নেওয়ার জন্য মনে হয় শাহজাদীর মহলে এসেছে। শাহজাদী তাকে পুরুস্কার দিলেন কিন্তু সে গ্রহন না করে বলল বিবির জন্য এগুলি উৎসর্গ। আমি এগুলো নিয়ে কি করব? শাহজাদী দরজায় কিছুক্ষণ

দাড়াল। অতপর শাহজাদী ভিতরে প্রবেশ করল। লাহার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। এরপর সে কিছু দিন জীবিত ছিল। একদিন শাহজাদীর দরাজায় এসে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে এখানেই পড়ে মারা গেল। (মালফুজাতে খাজা)

240

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

হযরত হাকাম (রাহ:)

হযরত মু'তামির (রাহ:) বলেন আমি হাকামের ইন্তেকালের সময় পাশে বসে তাঁর জন্য দোয়া করতে লাগলাম। আল্লাহ যেন তাঁর জন্য মৃত্যু যন্ত্রণা হালকা করে দেন। কারণ তাঁর মধ্যে অমুক অমুক ভালো গুণ আছে। আমি তাঁর গুণগুলো একটা একটা করে উল্লেখ করে দোয়া করছিলাম এসময় হাকাম ধ্যানে ছিলেন। যখন তাঁর ধ্যান ছুটে গেল, হুশ ফিরে আসল তখন বললেন এমন এমন কথা কে বলল? মু'তামির বললেন আমি বলেছি। হাকাম বললেন, মালাকুল মাউত বলেছেন আমি প্রত্যেক উদার দানশীল ব্যক্তির সাথে নম্র ব্যবহার করি। একথা বলে হাকাম মারা যান। (ফাযায়েলে সাদাকাত ৪৭৪)

আবু বকর জাফফাক (রাহ:)

আবু বকর রাকী (রাহ:) বলেন আমি এক সকালে আবু বকর জাফফাক এর কাছে গেলাম। তখন তাকে বলতে শুনলাম, হে আল্লাহ আমাকে কত দিন এই দুনিয়াতে ফেলে রাখবেন? এই কথা বলার পর ঐ দিন জোহরের সময় আসার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৭৩)

মাসলামা বিন আব্দুল মালেক (রাহ:)

তিনি মৃত্যুকালে কাঁদতে লাগলেন। কারণ জিজ্ঞাস করা হল তিনি বললেন মৃত্যু ভয়ে কাঁদছি না, বরং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পুর্ণ কামনা আছে। হ্যাঁ কাঁদার

241

কারণ হল, আমি ত্রিশবার জিহাদে অংশগ্রহন করলাম কিন্তু শাহাদত লাভ করতে পারলাম না। আজ মহিলাদের মত বিছানায় শুয়ে প্রাণ বিসর্জন করছি। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮০)

হাছান বছরী (রাহঃ)

ইবনে আউন বলেন হাছান বছরী মৃত্যুকালে انا لله وانا اليه راجعون পড়ে উভয় হাত বাহির করেন। (আহমুহতাজারুন)

সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রাহঃ)

তিনি অনেক ধন সম্পদ রেখে যান। মৃত্যুকালে বললেন হে আল্লাহ আপনি অবশ্যই জানেন আমি সম্পদ জমা করেছি একমাত্র আমার দ্বীনের হেফাজতের জন্য। আত্মিয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা, ভিক্ষা করা থেকে বেচে থাকা এবং ঋণ আদায় করার জন্য। যে ব্যক্তি এমন করে না তার মধ্যে কোন কল্যান নাই।

হযরত মিসআর বিন কিদাম (রাহঃ)

মৃত্যুর সময় সুফিয়ান সওরি তাঁর কাছে গেলেন। সুফিয়ান সওরি তাঁকে ভিত-সন্ত্রস্ত্র অবস্থায় দেখে বললেন আপনার অবস্থা এ রকম কেন? হায় যদি আমি এখন মারা যেতাম। মিসআর উত্তর দিতে গিয়ে বললেন আমাকে বসাও। সুফিয়ান সওরী আবার কথার পুনরাবৃত্তি করেন। তখন মিসআর (রাহঃ) বললেন হে হাছান, নিশ্চয় তোমার আমলের উপর তোমর ভরসা আছে। খোদার কছম আমি যদি পাহাড়ের চুড়ায় হই তাহলে জানা নাই কোথায় পতিত হব। একথা শুনে হাছান বসরী (রাহঃ) কেদে বললেন আপনি আমার থেকে আল্লাহকে বেশি ভয়কারি।

হযরত ইয়াহইয়া আল-জালা (রাহঃ)

তাঁকে জালা উপাধি দেওয়ার কারণ হল, اذا تكلم علينا جلاقلوبنا যখন তিনি কথা বলতেন তখন যার সাথে কথা বলতেন তার অন্তর উজ্জল হয়ে যেত। (ছিফাতুস সাফওয়া)

তাঁর ছেলে আহমদ বলেন মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল করানের সময় হাস্যোজ্বল অবস্থায় দেখা গেছে। মানুষ দ্বিধাদন্ধে পড়ে যায় তিনি মৃত না জীবীত। অবশেষে চেহারা ঢেকে ডাক্তার আনা হল।

ডাক্তার রগ ধরে পরীক্ষা করে বলল هذا ميت তিনি মৃত। আবার যখন চেহারা থেকে কাপড় সরানো হলো তখন দেখা গেল আগের ন্যায় হাস্যমুখি। তখন ডাক্তার বলল আমার বুঝে আসছে না তিনি জীবিত না মৃত। এদিকে লোকেরা গোসল দিতে ভয় পাচ্ছিল। অবশেষে তাঁর বিশেষ বন্ধুরা এসে গোসল দেন কাফন পরান। অতপর জানাযা পড়ে দাফন করেন।

আবুল ওয়াক্ত আব্দুল আউয়াল (রাহঃ)

শায়খুল ইসলাম আবুল ওয়াক্ত আব্দুল আউয়াল আস সিজযী আল হারবী। তিনি ইমাম বুখারীর (রাহঃ) ছাত্র।

ইউসুফ বিন আহমদ আশ শিরাযী স্বীয় কিতাব আরাবাইনুল বুলদানে লেখেন আব্দুল আওয়াল (রাহঃ) মৃত্যু যন্ত্রণার সময় আমি আমার বক্ষ দ্বারা তাঁকে চাপিয়ে ধরলাম। এমতাবস্থায় তিনি যিকিরে মগ্ন ছিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সুফী এসে বললেন হে আমার সর্দার, রাসুল (সাঃ) বলেছেন من كان اخر كلامه لا اله الاالله دخل الجنة একথা শুনে আব্দুল আউয়াল মুহাম্মদ বিন কাসিমের দিকে চোখ উঠালেন এবং পড়তে শুরু করলেন قال ياليت قومى يعلمون بماغفرلى ربى وجعلنى من المكرمين এ আয়াত থেকে সুরা ইয়াসিন পড়া শুরু করেন। সুরা শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। অতপর আল্লাহ আল্লাহ বলতে বলতে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত আদম বিন আবি ইয়াস (রাহঃ)

তিনি বংশগত খুরাসানী ছিলেন। তবে লালিত-পালিত হয়েছেন বাগদাদে। তিনি কুফা, বসরা, শাম ইত্যাদি অঞ্চলে ভ্রমন করেছেন।

মৃত্যুর নিকটবর্তি সময়ে পুর্ণ কুরআন পড়ে খতম করেন। অতপর কালিমা তাইয়্যিবাহ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করেন।

২২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (সিফাতুস সাফওয়া)

243

অপর এক বর্ণনায় এসেছে আদম বিন আবি ইয়াস মৃত্যুকালে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে কুরআন পড়তে থাকেন। যখন খতম করলেন তখন বলতে লাগলেন, আপনার সাথে আমার যে ভালোবাসা আছে তার ওসিলা দিয়ে বলছি আমার সাথে নম্র ব্যবহার করুন। আমার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা আজকের দিনের জন্যই আপনার সাথে জর্জিত ছিল। অতপর কালিমা তাইয়্যিবাহ পড়ে মারা যান। (ফাযায়েলে সাদাকাত ৪৮০)

ইমাম গাযালী (রাহঃ)

সুপ্রসিদ্ধ কিতাব এইয়াউল উলুম যিনি লিখেছেন তিনি হলেন ইমাম গাযালী। রবিবার ফজরের নামাজ ওজু করে আদায় করেন। অতপর কাফনের কাপড় চাইলেন। তাতে চুমু খেয়ে চোখের উপর রেখে বললেন বাদশাহর দরবারে অত্যন্ত আনন্দের সাথে হাজির হব। একথা বলে কিবলামুখি হয়ে পা বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর সাথে সাথেই ইন্তেকাল করেন।
(ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮১)

ইবনে ইদ্রিছ (রাহঃ)

তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তি হওয়ার পর তাঁর মেয়ে কাঁদতে লাগলেন। ইবনে ইদ্রিছ বললেন কাঁদার কোন কারণ নাই। আমি এই ঘরে ৪ হাজার বার কুরআন খতম করেছি। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮৩)

আবু হাকিম হিরি (রাহঃ)

তিনি বসে বসে কি যেন লিখছিলেন। হঠাৎ কলম হাত থেকে রেখে দিয়ে বললেন যদি এটার নাম মৃত্যু হয় তাহলে খোদার কছম অনেক ভালো মৃত্যু। একথা বলেই মারা যান। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮১)

হযরত আবু বকর বিন আইয়াশ (রাহঃ)

তিনি অধিক রোযাদার ছিলেন। ইফতারের সময় পানিতে হাত ডুবিয়ে এই দোয়া করতেন يَامَلَائِكَتِي হে ফেরেস্তারা আমি তোমাদের সাহচর্যের প্রত্যাশি। আল্লাহর কাছে আমার জন্য কিছু বলতে চাইলে আমার জন্য সুপারিশ কর।

ষাট বছর পর্যন্ত তার আমল ছিল চব্বিশ ঘন্টায় একবার কুরআন খতম করতেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাত ঘুমান নাই।
মৃত্যুকালে তাঁর বোন কাঁদতে লাগলেন। আবু বকর বললেন কেঁদনা! এই ঘরের কিনারায় বসে ১৮ হাজার বার কুরআন খতম করেছি।
ছেলে ইব্রাহিমকে কাঁদতে দেখে সান্তনা দিতে গিয়ে বললেন, কাঁদ কেন? তোমার পিতা চল্লিশ বছর একাধারে প্রত্যেক রাতে কুরআন খতম করেছি। আল্লাহ এগুলো কি বিফল করবেন?
৯৩ বছর বয়সে ১৯৩ হিজরীতে কুফায় ইন্তেকাল করেন।
(ছিফাতুস সাফওয়া)

সাফওয়ান বিন সুলাইম (রাহঃ)

তিনি আল্লাহর সাথে অঙ্গিকার বদ্ধ হয়েছিলেন
لا يضع جنبه باالارض حتى يلقى الله আজ থেকে নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত বাহু জমিনে লাগাবেন না। এই অঙ্গিকারের সিমা ত্রিশ বছর থেকে বেশি ছিল।
যখন সাকরাতের অবস্থায় বসে বসে কষ্ট অনুভব করছিলেন তখন তাঁর মেয়ে বললেন বাবা শুয়ে গেলে কিছু আরাম অনুভব করতে পারতেন। তিনি বললেন শুয়ে গেলে আল্লাহর সাথে অঙ্গিকার পুর্ণ হবে না। অবশেষে এভাবে বসা অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।
এক বর্ণনায় উল্লেখিত তার অঙ্গিকারের সিমা চল্লিশ বছরের চাইতে বেশি ছিল।
১২৪ হিজরীতে মৃত্যু হয়। (তাহযীবুল কামাল)

মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল নাসসাজ (রাহঃ)

তিনি মৃত্যুকালে ঘরের কিনারার দিকে চেয়ে মালাকুল মাউতকে সম্বোধন করে বলতে থাকলেন একটু থামেন। কারণ তোমার উপর যেমন একটি হুকুম আছে আমার উপরও একটি হুকুম আছে। তোমার হুকুমের সময় শেষ হওয়ার সুযোগ নাই তবে আমার হুকুমের সময় শেষ হওয়ার আশংকা আছে। অতপর বিছানা থেকে উঠে ওজু করে নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লেন। আর সাথে সাথে প্রাণ বের হয়ে গেল।

245

মৃত্যুর পর কেহ স্বপ্নে দেখে বলল আল্লাহ কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন তোমাদের ময়লা অপবিত্র দুনিয়া থেকে রেহাই পেলাম।
(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

ইয়াযিদ আর রুকাশী (রাহ:)

হাওসব বিন উকাইল বলেন ইয়াজিদ রুকাশী (রাহ:) মৃত্যুর সময় আয়াত পড়লেন كل نفس ذائقة الموت-وانماتوفون اجوركم يوم القيامة এ আয়াত পড়ে বললেন

الا ان الاعمال محظورة ولاجود مكملة ولكل ساع ما يسعى وغاية الدنياوأهلهاالى الموت

একথা বলতে থাকলেন আর কাঁদতে থাকলেন।
(আল-মুহতাজারুন)

আবু মুহাম্মদ জাফর আল মুরতাইশ (রাহ:)

তিনি বাগদাদের বাসিন্দা, বাগদাদ সম্পর্কে বলা হত বাগদাদের আশ্চর্যজনক বিষয়াদি হলো শিবলী রহ: এর ইশারা, মুরতায়িশ (রাহ:) এর সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম দর্শন, জাফর খাত্তাছ এর কাহিনি।
শুনিজিয়া মসজিদে যখন মুহাম্মদ জাফর (রাহ:) এর মৃত্যর সময় ঘনিয়ে এল তখন তিনি বলতে লাগলেন আমি আল্লাহর কাছে তিনটি দোয়া করেছি।

(١) وأن يجعل وقاتى فى هذا المسجد فانى صحبت فيه (٢) ان يميننى فقيرا اقواما وان يجعل عندى من انس به واحبة

১ম আমাকে যে ফকির অবস্থায় মৃত্যু দান করেন। ২য় আমার মৃত্যু যেন মসজিদে হয়। কেননা আমি এখানে অনেক লোকের সাথে ছিলাম। ৩য় নাম্বারে দোয়া করেছিলেন যাদের সাথে আমার প্রেম ভালোবাসা ছিল তার যেন মৃত্যুর সময় কাছে থাকে।
আল্লাহ আমার তিনটি দোয়া কবুল করেছেন।
একথা বলে চোখ বন্ধ করে মারা যান। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আয যাহিদ আল-বুসতী (রাহ:)

তিনি ৭০ বছর পর্যন্ত কোন দেওয়ালে অথবা কোন বালিশে হেলান দেন নাই। একাধারে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হল। তিনি বললেন أرى بين يدى امورا هائلة ولا ادرى كيف انجومنها আমার সামনে ভয়াবহ অবস্থা দেখছি, জানিনা কিভাবে নাজাত পাব।

৮৫বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁর মাতাকে স্বপ্নে দেখলেন, মূল্যবান কাপড় পরিধান করে সজ্জিত হয়ে বসে আছেন।

ঐ ব্যক্তি তাঁকে বলল হে মা আপনি কিসের জন্য এভাবে সজ্জিত হয়ে আছেন। মা বললেন نحن فى عيد لاجل قدوم عبيدالله بن محمد الزاهد البستى علينا আজ আমাদের খুশির দিন। কেননা আজ আমাদের কাছে উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আয-যাহিদ আসতেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

আমির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনবারী (রাহ:)

মৃত্যুকালে তাঁকে কান্নারত দেখে বলা হল, আপনার এই অবস্থা কেন? একথা শ্রবনে আরো বেশি কাঁদতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন আমাকে কুরআনের একটি আয়াত কাঁদাচ্ছে। আয়াত হল انما يتقبل الله من المتقين জানিনা আমি মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত কি না। (আত-তাবারী, জামেউল বয়ান)

আবু হাসিন,আছিম, আ'মাশ (রাহ:)

আবু বকর আয়্যাশ (রাহ:) বলেন, আমি আবু হাসিনের মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে গেলাম। এমতাবস্থায় তিনি বেহুশ ছিলেন। যখন হুশ ফিরে আসল তখন আয়াত পড়লেন وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين এ আয়াত পড়েই বেহুশ হয়ে যান। আবার হুশ আসল। আবার এই আয়াত পড়লেন। আবার বেহুশ হয়ে গেলেন। এ অবস্থা মৃত্যু পর্যন্ত চলল।

আবু বকর আয়্যাশ আরো বলেন, আমি আছেমের মৃত্যুকালে তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম মেহরাবে দাড়িয়ে তেলাওয়াত করছেন। মাঝে মধ্যে এ আয়াতও তেলাওয়াত করছেন

ثم ردوا الى الله مولهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين

আবু বকর আয়্যাশ অন্যত্র বলেন আমি আ'মাশের মৃত্যুকালে কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন মৃত্যুর সংবাদ কাউকে জানানোর প্রয়োজন নেই। আমাকে মরুভুমিতে নিয়ে ফেলে দিবে। একথা বলে কাঁদতে লাগলেন। আমি বললাম মৃত্যুর সময় আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন কাঁদব না কেন? আমার অবস্থা আমি জানি। (আল-মুহাতাজুরুন)

হযরত আবু হাফস (রাহ:)

আবু উসমান হিরি (রাহ:) বলেন আবু হাফসের মৃত্যুর সময় একজন তাঁকে ওসিয়ত করতে বলল। আবু হাফস বললেন আমার কথা বলার শক্তি নাই। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁকে কিছুটা সুস্থ দেখা গেল তখন আমি বললাম এবার ওসিয়ত করুন। আমি মানুষের কাছে পৌঁছাব। আবু আছেম বললেন নিজের ত্রুটির উপর আন্তরিক ভাবে লজ্জিত হও। এটাই আমার শেষ ওসিয়ত। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮৩)

হযরত রুয়িম (রাহ:)

মৃত্যুকালে একজন তাঁকে কালিমার তালকিন করল। তিনি বললেন আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে চিনিই না। (ফাজায়েলে জিকর ১১৮)

জুবাইদা (রাহ:) এর ঘটনা

এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করল, আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে? জুবাইদা (রাহ:) বললেন চারটি কালিমার বদৌলতে মাফ পেয়েছি।

لا اله الاالله افنى بها عمرى+ لا اله الاالله ادخل بها قبرى

لا اله الاالله اخلو بها وحدى+ لا اله الاالله القى بها ربى

248

আমি لاالہ الاالله দ্বারা জীবন শেষ করব। لاالہ الاالله কে সঙ্গে কবরে নিয়ে কবরে যাব। لاالہ الاالله এর সাথে একাকিত্বের সময়কে পার করব। لاالہ الاالله কে সাথে নিয়ে রবের কাছে যাব। (ফাজায়েলে জিকির)

শায়খ আবু তুরাব নখশবী (রাহঃ)

২৪৫ হিজরীর ১৪ই জুমাদাল উলাতে মৃত্যুবরণ করেন। বসরার এক জঙ্গলে তিনি মারা যান। কিছু দিন পর এক দল লোক সেখানে পৌঁছে দেখল শায়খ আবু তুরাব কিবলামুখি হয়ে দাড়ানো। শরীর শুকিয়ে গেছে। আর হাতে একটি লাঠি। পাহাড়ের গিরিপথ তার সামনে। কোন হিংস্র প্রাণি তাঁর কোন ক্ষতি করে নাই। (জহিরুল আসফিয়া ১৬৭)

শায়খ মুহাম্মদ বিন ফজল (রাহঃ)

আখওয়ান্দ ছাহেব (রাহঃ) বলেন মৃত্যুর পুর্বে মুহাম্মদ বিন ফজল ওসিয়ত করলেন যে, আমার মরদেহ সংরক্ষণ করবে যতক্ষণ একজন ডোরাকাটা ঘোড়ার আরোহি না এসেছেন। তিনি এসে আমর জানাযার নামাজ পড়াবেন।

আখওয়ান্দ ছাহেব বলেন মুহাম্মদ বিন ফজল মারা যাওয়ার পর এভাবে করা হল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার পিতা শায়খ ফসীহুদ্দীন (রাহঃ) একটি ডোরাকাটা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসে জানাযা পড়ালেন।

তিনি ১০০৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। যন্দজান নামক স্থানে তাঁর মাজার অবস্থিত। শায়খ ফসীহুদ্দীন (রাহঃ) এর মৃত্যু ১০৭০ হিজরী সনের ২২ রামাজান বৃহস্পতিবারে হয়। লাহোরে তাঁর মাজার বিদ্যমান।
(সাফিনাতুল আউলিয়া ২৪৫)

শায়খ দানিয়াল (রাহঃ) (কুদ্দিছা ছিররুহু)

একবার শায়খ দানিয়াল তার বাসস্থান সতরকাহের দিকে রওয়ানা হন। লক্ষ্ণৌ পার হওয়ার পর একদল ডাকাত তাঁর সবকিছু লুণ্ঠন করে তাকে শহিদ করে দেয়। এই হামলায় তাঁর পরিবার-পরিজনও শহীদ হন। ডাকাতরা যখন তাঁর মাল ছামানা নিয়ে রওয়ানা হল তখন এক ভয়ংকর আওয়াজ আসল। এ আওয়াজ একটা কবর থেকে আসল। সাথে সাথে সকল ডাকাত অন্ধ হয়ে

249

গেল। কিছু দিন পর বাদশাহ তাদেরকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দিল। আর শায়খের লাশ সতরকাহে নিয়ে দাফন করল। এ ঘটনাটি ঘটে ৭৪৮ হিজরীতে। (খাজিনাতুল আসফিয়া ২১৪)

শায়খ মুজাফফর বলখী (রাহঃ)

তিনি মৃত্যু নিকটবর্তি সময়ে লাগাতার প্রায় ২২ দিন খাবার খান নাই। কারো সাথে কথাও বলেন নাই। মৃত্যুর সময় তাঁর ভাতিজা শায়েখ হুসাইন কে ব্যবহৃত জামা খেলাফত প্রদান সহ দেন। ৭৮৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। শায়খ মুজাফফার তার পীর হযরত মুনীরীর ইন্তেকালের ছয় বছর পর ইন্তেকাল করেন। (খাজিনাতুল আসফিয়া ২৭৮)

হযরত দাউদ তায়ী (রাহঃ)

জনৈক ব্যক্তি দাউদ তায়িকে স্বপ্নযোগে বাতাশে উড়তে দেখল। আর বলতে শুনল এখন আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি।

স্বপ্ন দেখনেওয়ালা ব্যক্তি যখন এ খবর জানানোর জন্য আসল, তখন এসে দেখল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর আসমান থেকে আওয়াজ এসেছিল। দাউদ তায়ী অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ঠ। (জহিরুল আসফিয়া ২১৯)

শায়খ হামদান কাসসার (রাহঃ)

তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন লোকেরা তাঁকে বলল নিজ সন্তানদেরকে ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন তাদের ব্যাপারে দরিদ্রতার চাইতে বাদশাহীকে আমি বেশি ভয় করি।

মৃত্যু যন্ত্রণার সময় তিনি বললেন আমার মৃত্যুর পর মহিলাদের সামনে আমার লাশ প্রকাশ কর না। ২৯১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। (জহিরুল আসফিয়া ৩১৫)

শায়খ আবুল হাছান নুরী (রাহঃ)

তিনি এক ব্যক্তিকে আল্লাহ আল্লাহ বলতে দেখে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাস করেন, তুমি ঐ সত্ত্বা সম্পর্কে কি জান? যদি তাকে জানতে তাহলে জিন্দা কতক্ষণ

থাকতে? একথা বলেই বেহুশ হয়ে পড়েন। হুশ আসার পর তিনি জঙ্গলে চলে গিয়ে এক বাঁশ বাগানে পৌঁছেন। বাঁশ বাগানের বাঁশ-পালার আঘাতে তিনি জখম হন। ফলে শরির থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে। রক্তের যেই ফোটা জমিনে পড়ে তা আল্লাহ শব্দে অংকিত হয়ে যায়।

আবু নছর সিরাজ বলেন, যখন তাঁকে ঘরে আনা হল এবং বলা হল যে, لا اله الاالله বল তখন তিনি বললেন আমি সেখানেই গিয়েছি সেখানেই মৃত্যু বরণ করেছি।

জুনাইদ (রাহ:) বলেন নুরী (রাহ:) এর মৃত্যু যখন হল তখন থেকে বাস্তব সত্য সম্পর্কে কেহই কথা বলল না। তিনি কালের মহা সত্যবাদি ছিলেন।

(জহিরুল আসফিয়া ৩৬৬)

শায়খ উছমান আল হিরি (রাহ:)

তাঁর মৃত্যুর নিদর্শন যখন পেতে শুরু হল, তখন সন্তানরা কাপড় ছিড়ে ফেলল। তিনি বললেন হে ছেলেরা তোমরা সুন্নতের খেলাফ কাজ করলে। আর সুন্নাতের খেলাফ করা মুনাফিকির নিদর্শন। কারণ রাসুল (সা:) বলেছেন।

كل اناء يترشح بما فيه পাত্রে যা থাকে তাই পড়ে। একথা বলে মারা যান।

(জহিরুল আসফিয়া ৩৭৩)

শায়খ নাসসাজ (রাহ:)

তাঁর মৃত্যুকালে নামাজের সময় ছিল। আজরাঈল যখন আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তিনি বললেন عفاك الله সামান্য অপেক্ষা করুন। তুমি প্রাণ হরন করার জন্য আদেশ প্রাপ্ত আমিও নামাজের হুকুম প্রাপ্ত। তোমাকে যার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা ছুটে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আমাকে যার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা আদায় না করলে জিম্মায় থেকে যাবে। অতএব ওজু করা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধর।

অতপর তিনি ওজু করে নামাজ আদায় করে প্রাণ আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেন। লোকেরা তাঁকে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাস করল আপনার সাথে কিরূপ আচরন করা হয়েছে? উত্তরে বললেন এটা জিজ্ঞাস কর না। তবে তোমাদের অপবিত্র দুনিয়া থেকে রেহাই পেয়েছি। (জহিরুল আসফিয়া ৪১২)

251

শায়েখ আবু বকর কাত্তানি (রাহঃ)

মৃত্যুকালে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাস করল কোন আমলের মাধ্যমে এত উঁচু মর্যাদা লাভ করলেন? তিনি বললেন আমার মৃত্যু যদি ঘনিয়ে না আসত তাহলে বলতাম না। অতপর বললেন চল্লিশ বৎসর যাবৎ নফসের দারোয়ান ছিলাম। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইলে দরজা বন্ধ করে দিতাম। এমনকি আল্লাহ ছাড়া বাকি সব কিছু অন্তর থেকে দুর করে দিয়েছি। অবস্থা এমন হয়েছে আমার অন্তর আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বুঝত না। (জহিরুল আসফিয়া ৪২৩)

শায়খ আব্দুল্লাহ ছাকিফ (রাহঃ)

মৃত্যুকালে স্বীয় খাদেমকে বললেন আমি পলায়নকৃত গোলাম ছিলাম। আমি মারা যাওয়ার পর আমার ঘাড়ে জিঞ্জির পায়ে বেড়ী পরিয়ে আর হাত পিছনের দিকে নিয়ে বেঁধে কিবলামুখি করে দিও। হতে পারে এইজন্য আমাকে কবুল করা হবে।

মৃত্যুর পর খাদেম ওসিয়ত মোতাবেক কাজ করতে চাইলে অদৃশ্য থেকে একজন ঘোষক আওয়াজ দিয়ে বললেন সাবধান এরূপ কর না। তুমি কি আমার প্রিয়জনকে অপদস্থ করতে চাও? গোলাম এ ঘোষণা শুনে আর এরূপ করল না। (জহিরুল আসফিয়া ৪২৯)

খাজা উবায়দুল্লাহ মুরাওওয়িজে শারইয়্যাহ (রাহঃ)

মানুষকে আত্মসংশোধনে এবং শরীয়তের অধিক অনুসারি হওয়ার কারণে তাঁকে মুরাওওয়িজে শারইয়্যাহ উপাধি দেওয়া হয়। ১০৮৩ হিজরী সনের ১৯ রবীউল আওয়াল রোজ শুক্রবার সিরহিন্দে আগমনের পথে সানহালকর নামক স্থানে তিনি সাথিদেরকে জিজ্ঞাস করলেন নামাজের সময় বাকি আছে কিনা? সময় বাকি থাকা সত্বেও অসুস্থতার কারণে ওজু করতে সক্ষম ছিলেন না। তাই তায়াম্মুম করলেন। অতপর কপালে হাত রেখে বললেন السلام عليكم يارسول الله সালামান্তে নামাজের নিয়ত বাঁধেন। কপাল জমিনে ঠেকালেন। এ অবস্থায় পবিত্র আত্মা আরশে চলে যায়। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজী ৩০১)

শায়খ মমশাদ দিনওয়ারী (রাহ:)

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তাঁকে জিজ্ঞাস করা হল আপনার অসুস্থতা কি? তিনি বললেন আমাকে অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাস করছ? অতপর বলা হল لا اله الا اللهবলুন। তখন তিনি দেওয়ালে চেহারা রেখে বললেন আমি তোমার জন্য পরিপুর্ণভাবে বিলিন হয়ে গেলাম। এমন ব্যক্তির প্রতিদান এটাই, যে তোমার সাথে বন্ধুত্ব রাখে। অতপর বললেন তিন বছর যাবত বেহেস্তকে আমার সামনে পেশ করা হচ্ছে। কিন্ত আমি উহার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছি না। তিন বছর যাবৎ আমার হৃদয় তোমার জন্য অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু আমি তাকে সে অবস্থা থেকে ফিরাতে চাচ্ছি না। সকল ছিদ্দিকিনদের অন্তর আল্লাহর জন্য অস্থির থাকা প্রয়োজন। আমি কিভাবে চাইব? একথা বলে মারা যান। (জহিরুল আসফিয়া ৫৪৮)

শায়খ আবু হামযা মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বাগদাদী (রাহ:)

তিনি চমৎকার বয়ান করতেন। একদিন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, তুমি চমৎকার বয়ান কর, তবে তোমার জন্য নিরব থাকা শ্রেয়। এরপর থেকে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। যেই সপ্তাহে ঘোষক ঘোষণা করেন সেই সপ্তাহেই তিনি ইন্তেকাল করেন। শুক্রবার দিন খুতবাহ প্রদান কালে তাঁর বিশেষ এক অবস্থা সৃষ্টি হয়। তখনই পড়ে গিয়ে মারা যান।

(জহিরুল আসফিয়া ৫৫৩)

শায়খ আবুল ফজল হাছান সরখসী (রাহ:)

তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তি হওয়ার পর লোকেরা বলল মাশায়িখ বুজুর্গদের যেখানে দাফন করা হয় আপনাকেও সেখানে দাফন করা হবে। তিনি বললেন কখনও না। আমি কে? আমাকে যে বুজুর্গদের স্থানে দাফন করা হবে? বরং আমি চাই আমাকে অমুক টিলায় দাফন করা হউক যেখানে খারাপ লোকদের দাফন করা হয়। কারণ এরা রহমতের অধিক নিকটবর্তি। পানি অধিক পিপাসার্তকেই প্রদান করা হয়। যেহেতু সে মুখাপেক্ষি। আর দয়ালু ব্যক্তি মুখাপেক্ষিকেই দান করেন।

(জহিরুল আসফিয়া ৫৬৮)

হযরত বাবা ওয়ায়ে কাশ্মিরী (রাহঃ)

ইতিহাসের পুস্তকে হযরত বাবা (রাহঃ) সম্পর্কে শিক্ষনীয় ঘটনা লিখিত আছে। কয়েকজন শিয়া জীবিত এক যুবককে মৃত লাশ বানিয়ে বাবা (রাহঃ) এর কাছে জানাযা পড়াবার জন্য নিয়ে আসল। তাদের উদ্দেশ্য হল, বাবা (রাহঃ) যখন আল্লাহু আকবার বলে জানাযার তাকবীর বলবেন সাথে সাথে যুবক কাফন থেকে বের হয়ে দাড়িয়ে যাবে। যা দ্বারা ইতিহাসের একটি হাস্যকর অধ্যায় স্থাপিত হবে। কিন্তু হল কি জানেন? যখনই বাবা (রাহঃ) জানাযার তাকবীর বললেন সাথে সাথেই মালাকুল মাউত এই ঠাট্রাকারি দুর্ভাগ্যের অধিকারি যুবকের দুনিয়ার স্বাদ মিটিয়ে দেন।

(খাজিনাতুল আসফিয়া খন্ড ২ পৃষ্টা ৩৩৮, উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি খন্ড; ১ পৃষ্টা ৩৫০)

শায়খ জামালুদ্দীন হাঁসবী (রাহঃ)

তিনি ৬৬৮ হিজরীতে মারা যান। গওহরবার হাঁসবীতে তাঁর মাজার বিদ্যমান। মৃত্যুর পরে এক লোক স্বপ্নে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাস করল। তিনি বললেন আমাকে দাফন করার পর আজাবের দু'জন ফেরেস্তা আমার কাছে আসলেন শাস্তি দেওয়ার জন্য। তখন তাদের পিছনে পিছনে আর দুইজন ফেরেস্তা এসে খবর জানালেন আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ তিনি মাগরিবের সুন্নতের পর সুরা বুরুজ ও তারিক দ্বারা দুই রাকাত পড়তেন। তাছাড়া প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পড়তেন।

(খাজিনাতুল আউলিয়া খন্ড ২ পৃষ্টা ১০৬)

শায়খ আহমদ নাহরওয়ানী (রাহঃ)

তিনি কাজী হামিদুদ্দিন নাগুরী (রাহঃ) এর প্রসিদ্ধ খলিফা ছিলেন। উচু মানের একজন বুজুর্গ ও বাস্তবতার রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

শায়েখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়্যাহ মুলতানী (রাহঃ) যে কাউকে বেশি একটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু শায়খ নাহরওয়ানী সম্পর্কে বাহাউদ্দিন যাকারিয়্যাহ বলতেন তিনি সুফিদের উৎসস্থল।

খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (রাহঃ) বলেন যে ধর্মিয় সঙ্গিতানুষ্ঠানে খাজা কুতবুদ্দিন বখতিয়ার (রাহঃ) মারা যান সে অনুষ্ঠানে শায়খ নাহরওয়ানী উপস্থিত ছিলেন।

শায়খ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চেরাগ বলেন শায়খ নাহরওয়ানী (রাহ.) কাপড় বুননকারি ছিলেন। কখনও কখনও কাজ কর্মের অবস্থায় এক বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হত যদ্দরুন তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন। তিনি কাজে উপস্থিত নয়। কিন্তু দেখা যেত কাপড় নিজে নিজে তৈরী হচ্ছে।
(খাজিনাতুল আসফিয়া খন্ড ২ পৃষ্টা ১০৭)

হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাহঃ)

তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে যা জানা গেছে, সে অনুযায়ি বলা যায় মৃত্যু ৬২৭ হিজরীতে হয়। যদি আজমিরে তাঁর আগমন ৫৮৮ হিজরীতে হয়ে থাকে তাহলে আজমিরে তাঁর অবস্থান সময় সিমা ৩৯ বছর।
ছিয়ারুল আকতাবে উল্লেখিত মৃত্যুর দিন এশার নামাজ পড়ে নিজ কামরায় দরজা বন্ধ করে দেন। রুমের বাহিরে খানকায় অবস্থানকারিগণ ধর্মিয় সঙ্গিত অনুষ্ঠানে আনন্দ উল্লাসের সময় পায়ের আঘাতের ন্যায় আওয়াজ শুনল। খানকা ওয়ালা মনে করল হয়তো খাজা সাহেবের খোদা প্রেমের উম্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। রাতের শেষ দিকে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। ফজরের নামাজের সময় দরজায় নাড়া দেওয়ার পর ভিতর থেকে কোন আওয়াজ আসল না। অবশেষে দরজা খুলে দেখা গেল আল্লাহর প্রেমিক আল্লাহর প্রেমে জান বিসর্জন দিয়ে দিছেন।
(বুজমে সুফিয়া ৬৪/৬৫)

কাজি হুমাইদুদ্দীন নাগুরী (রাহঃ)

তিনি দিল্লিতে আগমন করে খাজা কুতবুল ইসলাম বখতিয়ার কাকী (রাহঃ) এর সাথে অবস্থান করেন। মৃত্যুর পর তাঁর পাশেই দাফন করা হয়। লাতায়িফে আশরাফিতে মৃত্যুসন ৬৪১ হিজরী উল্লেখ করা হয়। রমজান মাসে তারাবীহ এর নামাজের পর বিতিরের নামাজে সেজদায় প্রাণ চলে যায়।
(বযমে সুফিয়া ১১০)

শায়খ আব্দুল আজিজ (রাহঃ)

তাঁর জীবন মুজাহাদা ও রিয়াজতের সমষ্টির নাম ছিল। তিনি ছোট বেলা যে সকল বিষয় নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়ে ছিলেন মৃত্যু অবধি তাতে অটল ছিলেন। পুর্ববর্তিদের অনুসরনে সামান্য বিচ্যুতি হয়নি। বুজুর্গদের সম্মান

255

প্রদর্শনে অভাবিদের সাহায্যে প্রাণপণ চেষ্ঠা করতেন। বিনয়, নম্রতা, ইলম, সহনশিলতা, ধৈর্য্য, অল্পে তুষ্টি সকল উত্তম গুণাবলির বেলায় চিশতীয়া তরিকার উজ্জল দৃষ্ঠান্ত ছিলেন। ৯৭৫ হিজরী সনের ৬ষ্ট জুমাদাস সানীতে ইন্তেকাল করেন। প্রান বের হওয়ার সময় জবানে নিম্নের আয়াত চালু ছিল

فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ واليه ترجعون

(আনফাসুল আরিফিন ৩৫১)

হিশাম বিন আব্দুল মালিক (রাহঃ)

তাঁর মৃত্যুর সময় পাশে বসা স্বীয় সন্তানদের দিকে চেয়ে ক্রন্দনরত দেখে বললেন, হিশাম তোমাদেরকে দুনিয়া দিয়েছে আর তোমরা কান্না করছ। স্বীয় জমাকৃত ধনস্তুপ ছেড়ে রেখেছে আর তোমরা এগুলোর দ্বারা গুণাহ অর্জন করেছ। (অর্থাৎ আমি তোমাদের উপকার পৌঁছিয়েছি কিন্তু তোমাদের পক্ষ থেকে অনর্থক ক্ষতিসাধনকারি কথাবার্তা ছাড়া কিছুই মিলল না।) এতএব এখন হিশামের পরিনতি খুবই খারাপ যদি খোদা ক্ষমা না করেন।

হযরত মুগীরা আল-খিরায (রাহঃ)

তাঁর মৃত্যুর সময় কাছে গমনকারি লোকেরা অবস্থা জানতে চাইল, তিনি বললেন গুণাহের বোঝায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। লোকেরা বলল আপনার কোন চাওয়া পাওয়া আছে কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমি চাই মৃত্যুর পুর্বে আল্লাহর কাছে অপছন্দনিয় সকল বিষয় থেকে তওবা করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ যেন আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন।

হযরত ইবরাহিম নখয়ী (রাহঃ)

তিনি মৃত্যুর সময় কাঁদতে লাগলেন। কেহ কাঁদার কারণ জিজ্ঞাস করল। তিনি বললেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূতের অপেক্ষা করছি। সে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাবে না জাহান্নামের খবর দিবে তা জানি না।
(এই ভয়ে কাঁদছি)

256

আবু বকর ইবনে আব্বাস (রাহঃ)

তিনির অসুস্থতার সময় একজন নাসারা ডাক্তার তাকে দেখতে আসল। তার ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করতে চাইল। কিন্তু তিনি ডাক্তারের নিকট হাত দিলেন না, সে চলে যাওয়ার সময় তাকে দেখে বললেন হে আল্লাহ আপনি যেহেতু এই ডাক্তারে কুফরীর পীড়া থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছ, বস এটাই আমার জন্য যতেষ্ট আমি আর অন্য কোন রোগের পরোয়া করিনা। এবার আপনি ইচ্ছা করলে সুস্থ করেন অথবা অসুস্থতা বাড়িয়ে মৃত্যু দেন যা ইচ্ছা তাই করেন।

ওয়াহাব ইবনুল ওয়ারদ (রাহঃ)

তিনির অসুস্থতার সময় মক্কার শাসক তাহার কাছে এক খৃষ্টান ডাক্তার প্রেরন করেন। ডাক্তার এসে বলল, আপনার সমস্যা কি? তিনি বললেন সমস্যার কথা তোমাকে বলবনা। লোকেরা মনে করল ডাক্তার খৃষ্ঠান হওয়ার কারনে ঘৃনা করে সমস্যার কথা বলছেন না। তাই তারা বলল তাহলে আমাদেরকে বলুন। ওয়াহাব (রহঃ) বললেন আশ্চর্যের বিষয়, তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধি কোথায় গেল? হে বুদ্ধিজিবীরা একটু বুঝার চেষ্ঠা কর, তোমরা কি চাও আমার রবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার দুশমনের কাছে করব ? তোমরা সবাই আমার কাছ থেকে সরে যাও।

(এমন কল্যানকামী লোকের কোন প্রয়োজন নাই।)

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

তিনি মৃত্যুকালে বলতে লাগলেন হে প্রভু আপনি আমাকে এমন ভাবে মাফ করুন যাহাতে মানুষ মনে করে আমাকে মাফ করা হয় নাই। হযরত উমর ইবনুল আব্দুল আজিজ (রাহঃ) হাজ্জাজের বক্তব্য অনুধাবন করেছিলেন, ফলে উমর ঈর্ষা করতেন। হাছান বছরী কে হাজ্জাজের এ কথা শুনানো হলে তিনি বললেন সে কি এরূপ বলেছে? লোকেরা বলল হ্যাঁ, হাছান বছরী (রাহঃ) বললেন এখানে আবার আশ্চর্যের কি আছে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেছেন।

(এহইয়াউল উলুম ৬৭৮)

257

হযরত ইবনুল মুনযির (রাহঃ)

মৃত্যুকালে তিনি কাঁদতে লাগলেন কারন জিজ্ঞাস করা হলে, পরে তিনি বললেন আমি এমন কোন গোনাহের কারনে কাঁদছিনা যাতে আমি লিপ্ত ছিলাম বরং আমার ভয় হলো, আমি এমন কোন কাজ করে ফেলি কি না যাহা আমার কাছে সাধারন মনে হলেও আল্লাহর কাছে অনেক বড়। (এহইয়াউল উলুম)

কতিপয় আল্লাহ ওয়ালাদের মরণের চিত্র যাহাদের নাম জানা নাই

আতা বিন ইয়াসার বলেন, এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় শয়তান কাছে এসে বলল, তুমি আমার হাত ছাড়া হয়ে গেলে, (অর্থাৎ তুমি আমার আয়ত্বে নও।) ঐ লোক বলল তোমার ব্যাপারে আমি আমাকে এখনো নিরাপদ মনি করিনা। (ফাযায়েলে সাদাকাত ৪৭৩)

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, এক ফকীর ব্যক্তি ছাকরাতের সময় ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাদতে থাকল, অপর দিকে মাছি তার মুখে অধিক হারে বসতেছে। তার এ অবস্থা দেখে আমার ভয় হল। আমি তার কাছে গিয়ে মাছি গুলো তাড়াতে লাগলাম। তখন সে চোখ খুলে বলল, যুগ যুগ ধরে একটি বিশেষ প্রচেষ্ঠা ছিল। সারা জীবন চেষ্ঠা করে অর্জন করতে পারলাম, এখন অর্জন হলো, কিন্তু তুমি মধ্যখানে এসে প্রবেশ হয়ে গেলে, যাও নিজের কাজ কর আল্লাহ ভালো করুন। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৫০২)

আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ মাজনী বলেন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি বহু সম্পদ জমা করল। মৃত্যুর সময় নিজ সন্তানদেরকে বলল আমার সম্পদ আমার সামনে একত্র কর, সন্তানরা দ্রুত সকল মাল একত্র করল। অনেক ঘোড়া, উট, দাস ইত্যাদি সকল মাল একত্র করল। ঐ ব্যক্তি এগুলো দেখে আক্ষেপ করে কাঁদতে লাগল, (কারন) এখন এগুলো হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

এ অবস্থায় মালাকুল মাউত সামনে হাজির হয়ে বললেন কান্না করে কি ফায়দা হবে? ঐ জাতের শপথ যিনি এ সকল সম্পদ তোমাকে দান করেছেন এখন তোমার প্রান নিয়ে যাব। ঐ ব্যক্তি বলল একটু সময় দেন যাতে সম্পদগুলী ভাগ করে দিতে পারি। ফেরেস্তা বললেন অবকাশ দেওয়ার সুযোগ শেষ হয়ে

258

গেছে। আগে বষ্ঠন করলে না কেন? একথা বলেই তার প্রান বের করেন। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪২৯)

হযরত ইবরাহিম খাওয়াছ (রাহ:) বলেন একদা আমি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে একজন খৃষ্টান দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ হল, যাহার কমরে পৈতা বাধা ছিল। (যা অমুসলিম হওয়ার চিহ্ন) সে আমার সথে থাকার কামনা ব্যক্ত করল। আমি তাকে সাথে নিয়ে নিলাম। একাধারে সাত দিন চললাম। (খানা পিনা ছাড়া)

সপ্তম দিন ঐ নাসারা ব্যক্তি বলল, হে মুহাম্মদী তোমার কিছু কারামতি দেখাও। কয়েক দিন চলে গেল কিছু খাই নাই। ইবরাহীম বলেন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম হে আল্লাহ এই কাফিরের সামনে অপদস্থ করনা। দোয়ান্তে সহসাই দেখলাম রুটি, ভুনা গোস্ত, তাজা খেজুর পানির পাত্র সহ একটি থালা সামনে রাখা হলো, আমরা উভয়ে খানা পিনা করে আবার চলতে লাগলাম।

একাধারে সাত দিন চললাম। সপ্তম দিন আমি ঐ নাসারা ব্যক্তিকে বললাম এবার তোমার সফলতা দেখাও (আমার উদ্দেশ্য হলো সে যেন ২য় বার আমাকে আর বলার সুযোগ না পায়) নাসারা ব্যক্তি সাথে সাথে লাঠিতে ভর দিয়ে দোয়া করল দেখা গেল ২ থালা ভর্তি খাবার সামনে রাখা হলো আগের খাবার থেকে ২ গুন বেশী।

এ অবস্থা দেখে আমি লজ্জিত হলাম, চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, আমি দু:খে পেরেশানিতে খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানালাম। সে আমাকে খাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করতে লাগল আমি বার বার অজুহাত দেখাতে থাকলাম এক পর্যায়ে সে বলল তুমি খাও আমি তোমাকে দুটি সুসংবাদ শুনাব, ১ম সুসংবাদ হলো

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدارسول الله

আমি মুসলমান হয়ে গেলাম এ কথা বলে পৈতা ফেলে দিল, ২য় সুসংবাদ হল আমি খানার জন্য যে দোয়া করেছিলাম তাহা এইভাবে করেছিলাম হে আল্লাহ এই মুহাম্মদীর (ইবরাহীম খাওয়াস) কোন মরতবা তোমার কাছে থাকলে এর বদৌলতে আমাদেরকে খানা দাও। এই দোয়ার ফলে খানা পেলাম। ফলে আমি মুসলমান ও হলাম।

অতপর আমরা উভয়ে খানা খেলাম, তারপর পথ চলে মক্কা শরীফে আসলাম, এবং হজ্ব পালন করলাম, হজ্বের পর ঐ নও মুসলিম মক্কাতে রয়ে গেল এবং সেখানে মারা গেল। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৫৫৫/৫৫৬)

ফাজায়েলে সাদাকাতে এক কাফন চুরের ঘটনা উল্লেখ করেছেন শায়খ জাকারিয়া (রাহঃ) তা হলো, ঐ কাফন চুর এক কবর খনন করে দেখল এক ব্যক্তি উচু চেয়ারে বসা। তার সামনে কুরআন শরীফ সে কুরআন তেলাওয়াত করছে। চেয়ারের নিচ দিয়ে নদী ও প্রবাহীত হচ্ছে। ঐ ব্যক্তি এসব দেখে ভয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। লোকেরা তাকে কবর থেকে উঠাল। তিন দিন পর হুশ আসার পর লোকেরা ঘটনা কি জানতে চাইলে সে পুরা কাহিনি বলল।

কিছু লোক ঘটনা শুনে কবর দেখার আকাঙ্ক্ষা করল। লোকেরা বলল কবর কোথায় বলে দাও। ঐ ব্যক্তি ইচ্ছা করেছিল তাদেরকে নিয়ে ঐ কবরে যাবে। কিন্ত রাতে স্বপ্নে দেখল ঐ কবরের বুজুর্গ তাকে বলছেন যদি তুমি আমার কবরের সন্ধান বল তাহলে স্বরনীয় এক মসীবতে আক্রান্ত হবে। তখন সে ওয়াদা করল কবরের সন্ধান দিবে না। (পৃষ্ঠা ৪৭৫)

আবু আলী রোদবারী (রাহঃ) বলেন, একদা এক ঈদের দিনে একজন ফকির লোক আমার কাছে আসল, জীর্নশীর্ণ অবস্থা তার পরনে ময়লা কাপড়। আমাকে বলল নিঃস্ব ফকির কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার মত কোন পরিস্কার স্থান এখানে আছে কিনা? আমি তার কথাটা অনর্থক বেহুদা মনে করে বিনা দীধ্বায় বললাম ভিতরে আস যেখানে ইচ্ছা মৃত্যুবরন কর।

আমার আদেশ পেয়ে সে ভিতরে প্রবেশ করে ওজু করে কয়েক রাকাত নামাজ পড়ে শুয়ে মারা গেল। আমি তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করলাম। দাফন করার সময় আমি মনে মনে বললাম যদি তাহার চেহারার উপর থেকে কাফন সরিয়ে চেহারা জমিনে রেখে দেই তাহলে তার নিঃস্বস্ততার কারনে আল্লাহ রহম করবেন। এ কথা মনে মনে ভেবে যখনই চেহারা থেকে কাফন সরাতেই তার চোখ খুলল, আমি বললাম আমার সরদার মৃত্যুর পরও জীবীত নাকি? তখন সে বলল আমি জিবিত, আল্লাহর প্রত্যেক আশেকই জীবিত হয়ে থাকে। কিয়ামতে তোমার শ্রদ্ধার কারনে তোমাকে সাহায্য করব। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮২)

শায়খ আবু ইয়াকুব ছানুসি (রাহঃ) বলেন আমার কাছে একজন মুরীদ এসে বলতে লাগল, আগামীকাল দুপুর বেলা আমি মারা যাব। পরদিন জোহরের সময় সে হারাম শরীফে আসল। তওয়াফ করে কিছু দুর যাইয়া মারা গেল। আমি তাকে গোসল করালাম, দাফন দিলাম। কবরে রাখার পর সে চোখ

260

খুলল। আমি বললাম মরার পরও দেখি জীবিত? সে বলল আমি জিবিত আল্লাহর প্রত্যেক আশিকই জিবিত থাকেন (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৭৬)

এক ব্যক্তি বলেন আমি মমশাদ দিনুরীর কাছে বসা ছিলাম। একজন ফকির এসে বলল, মারা যাওয়ার মত পাক পবিত্র কোন স্থান আছে কি ? মমশাদ (রাহ:) পানির ঝর্নার কাছে একটি স্থানের দিকে ইশারা করলেন। সে সেখানে গিয়ে ওজু করল নামাজ পড়ল, অতপর পা সোজা করে শুয়ে পড়ে মারা যায়।
(ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৭৩)

এক বুজুর্গ বলেন আমি এক মুরিদকে গোসল দেওয়ার সময় সে আমার বৃদ্ধাঙ্গুল চেপে ধরল। আমি বললাম আমার আঙ্গুল ছেড়ে দাও আমি বুঝে নিয়েছি তুমি মৃত নও। বরং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরীত হয়েছ। একথা বলার পর আঙ্গুল ছেড়ে দেয়। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৭৬)

আবু সাইদ খাজ্জাজ (রাহ:) বলেন একবার মক্কা শরীফে অবস্থানের সময় বাবে বনী হাশিম দিয়ে বাহির হওয়ার সময় দরজার কাছে সুদর্শন একজন লোককে মৃত দেখলাম। আমি ভাল ভাবে তার দিকে তাকিয়ে দেখি সে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। আর বলছে হে আবু সাইদ তুমি তো জান না আল্লাহ প্রিয়জন মরে না, বরং এক জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তর হয়।
(ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৮৩)

আবুল আব্বাস বলেন একদা আশবিলা শহরে আমি অসুস্থা হয়ে পড়লাম। আমি দেখলাম সাদা, লাল, সবুজ রঙ্গের বড় বড় পাখি এক সাথে ডানা খোলে আবার একসাথে গুটিয়ে রাখে আর অনেক লোককে দেখলাম যাদের হাতে বড় বড় ঢাকাকৃত পাত্র যাহার ভিতরে কিছু রয়েছে।

আমি তা দেখে বুঝলাম এটা মৃত্যুর উপঢৌকন। আমি দ্রুত কালেমা পড়লাম ইত্যবসরে ঐ সকল লোকদের একজন আমাকে বলল তোমার সময় এখন ও হয় নাই। এটা একজন মুমীন বান্ধার উপঢৌকন যাহার মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে।
(ফাজায়েলে সাদাকাত ১১৮)

আব্দুল ওয়াহহাব বিন আব্দুল হামিদ ছাকাফি বলেন আমি দেখলাম তিন জন পুরুষ এবং একজন মহিলা একটি লাশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য কোন মানুষ সাথে নাই দেখে আমি তাদের সাথে গেলাম, আমি মহিলার অংশ কাধে নিয়ে কবরস্থানে গেলাম। সেখানে তার জানাযার নামাজ পড়ে দাফন করার পর

261

জিজ্ঞাস করলাম এটা কার লাশ? মহিলা বলল আমার ছেলের লাশ। আমি বললাম তোমার গ্রামে ৪র্থ কোন পুরুষ মানুষ নাই খাটিয়া বহন করার জন্য? মহিলা বলল পুরুষ অনেক আছে কিন্তু লোকেরা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে আসে নাই। আমি বললাম হে প্রতিপন্ন করার কারন কি ? মহিলা বলল সে হিজড়া ছিল, (মহিলাদের ন্যায় চাল-চলন ছিল) মহিলার কথা শুনে তার প্রতি দয়া হলো। আমি তাহাকে বাড়িতে নিয়ে কিছু কাপড় খাবার দিলাম।

রাতের বেলা স্বপ্নে দেখি পুর্ণিমার রাত্রের ন্যায় উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট সাদা কাপড় পরিহিত একজন লোক আমার কাছে এসে কৃতজ্ঞতা জানাল। আমি বললাম তুমি কে? সে বলল ঐ হিজরা যাকে তুমি দাফন করেছো। মানুষ আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার কারনে আল্লাহ আমাকে দয়া করেছেন। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৫২০)

বর্ণিত আছে, শায়খ জালালুদ্দীন (রাহ:) এর মুরীদদের এজন বহুদিন তার খেদমতে ছিল। এই সময়ে সে তাহার কোন কারামতী দেখে নাই। একদিন শায়খের সঙ্গে কথা বলার সময় মুরিদের অন্তরে এ কথা উদয় হলো, যে আগের জামানায় শায়খ নজমুদ্দীন কুবরা (রাহ:) নামে একজন বুজুর্গ এমন ছিলেন যে, তাহার একটি দর্শন মানুষকে ওলীদের স্তরে পৌছে দিত। তাহার মত এখন আর কাউকে পাওয়া যায়না।

শায়খ জালালুদ্দীন তার মনের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাকে বললেন আজও এমন ব্যক্তি আছেন যাহার একটি চাহনিতে মানুষ ওলীদের স্বরে পৌছে যাবে। একথা শুনে মুরীদ বেহুশ হয়ে পড়ে গেল, পরক্ষনে হুশ ফিরল অন্যদিকে ওলীদের স্থরে পৌছে গেল, কিন্তু সামান্য সময় জিবিত থেকে মারা যায়। অতপর শায়খ জালালুদ্দীন বলেন কোন ব্যক্তিই তার লাশ বহন করার সামর্থ রাখল না। (ছাফিনাতুল আউলিয়া ১০৮৩)

শায়খ আব্দুর রশিদ জৌনপুরী (রাহ:) উরফে শামছুল হক (রাহ:) নামে এক বুজুর্গ অতিক্রান্ত হন। তিনি কবিতা আবৃতি করতেন একদিন ফজরের নামাজের জন্য উঠে সুন্নত পড়ে ফরজ শুরু করলেন, তাকবীরে তাহরীমার জন্য আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে রূহ সৃষ্টি কর্তার কাছে সোপর্দ করেন। মৃত্যু সন ১০৮৩ হিজরী। (উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাজি ৩৮৫)

ইয়াজিদ রুকাশি (রাহ:) বলেন বনী ঈসরাইলের অত্যাচারীদের একজন ঘরে বসে স্ত্রীর সাথে একাকি গল্প গুজব করছে। হঠাৎ দেখল অপরিচিত একজন

ব্যক্তি দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে। লোকটি আগন্তুকের দিকে গোস্বাভরে থাকিয়ে বলল তুমি কে? কার অনুমতি নিয়ে ঘরে এসেছ? আগুন্তুক বলল এ ঘরের মালিক ভিতরে আসার জন্য বলেছেন। আর আমি এমন এক ব্যক্তি যাহাকে কোন কিছু বাধা দিতে পারে না। কোন বাদশাহর কাছে যেতে অনুমতি লাগেনা। কোন অত্যাচারীর হুমকী দমকিকে ভয় করি না। কোন অহংকারীর কাছে যেতে আমার কোন বাধা নাই।

অগন্তুকের এসব কথা শুনে ভিত হয়ে পড়ল। শরিরে কম্পন শুরু হল। এক পর্যায়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল, অতপর অত্যান্ত নম্র হয়ে বলল আপনি তো মালাকুল মাউত? আগুন্তুক বললেন হ্যাঁ। লোকটি বলল আমাকে ওসীয়ত লেখার সময় পর্যন্ত সুযোগ দেন। ফেরেস্তা বললেন এটার সময় অনেক আগে চলে গেছে। তোমার জন্য সমান্য সময় বিলম্ব করার সুযোগ নাই।

লোকটি বলল এখন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, ফেরেস্তা বললেন তোমার আমল যা আগে প্রেরণ করেছ সেখানে নিয়ে যাব। (অর্থাৎ আমল অনুযায়ী গন্থব্যে নিয়ে যাব) যে রকমের ঘর এই দুনিয়াতে বানিয়েছ এমন ঘর তোমার জুটবে। লোকটি বলল আমি তো কোন নেক আমল করি নাই। নিজের জন্য কোন উত্তম ঘর ও বানাই নাই। ফেরেস্তা বললেন انها لظى نزاعة للشوى এর দিকে নিয়ে যাব, আয়াতের অর্থ হলো নিশ্চয় উহা হলো প্রজ্জলিত আগুন, যা চামড়া পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসবে। যে ব্যক্তি দুনিয়া সত্য বিমুখ ছিল আগুন তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসবে।

অতপর ফেরেস্তা তার রূহ কবজ করেন। ঘরে কান্না কাটির রুল পড়ে গেল। ইয়াজিদ রুকাশি বলেন যদি মানুষ জানত মৃত্যুর উপর কেমন কষ্ট অতিবাহিত হয় তাহলে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য না কেঁদে ঐ সময়ের কঠিন কষ্টের জন্য কাঁদত। (ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৭০/৪৭১)

ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ বলেছেন, আমি একবার এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার অবস্থা তাকে জিজ্ঞাস করলাম। লোকটি বলল আমি পৃথীবীতে জালেম অবস্থায় জীবিত ছিলাম। এখন লজ্জিত হয়ে দুনিয়া ছাড়ছি। (এবার বুঝে নাও যার জীবন এমন তার বর্তমান অবস্থা কেমন)

আবুল আব্বাস দিনুরী (রাহ:) তাঁর মজলিসে কিছু বলছিলেন ইত্যবসরে একজন মহিলা এসে চিৎকার করল। তিনি মহিলাকে বললেন মরে যাও। ঐ

মহিলা মজলিস থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল আমি মরে গেলাম একথা বলে মৃত হয়ে পড়ে যায়। (এহইয়াউল উলুম ৪/৪৭৯)

কোন এক বুজুর্গকে বলা হল আপনি আল্লাহ বলুন। বুজুর্গ বললেন তুমি কতক্ষন বলতে থাকবে, আমি তো ঐ নামের দিকে চললাম। (এহইয়াউল উলুম)

মাআজালী (রাহ:) বলেন, আমি একবার মৃত্যশয্যায় শায়িত এক বৃদ্ধার কাছে গেলাম। আমি তাকে বলতে শুনলাম, সে বলছে হে প্রভু আপনি সবকিছু করতে সক্ষম, অতএব আমার অসুস্থার প্রতি রহম কর। (এহইয়াউল উলুম)

অন্য আরেক বুজুর্গের মৃত্যু যন্ত্রনা শুরু হল। তখন তার স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। বুজুর্গ বললেন কাঁদ কেন? স্ত্রী বললেন আপনার জন্য। বুজুর্গ বললেন নিজের নফসের জন্য কাঁদ কারণ আমি নিজের নফসের জন্য ৪০ বছর কেঁদেছি।

আতা ইবনে ইয়াছার বলেন এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় শয়তান তার সামনে প্রকাশ হয়ে বলল, তুমি মুক্তি পেয়ে গেছ। লোকটি বলল আমি এখনও নিরাপদ নয়।

আরেকজন আল্লাহ ওয়ালা মরনের সময় কাদতে লাগলেন। লোকেরা কারন জিজ্ঞাসা করল। তখন বুজুর্গ কুরআনের এক খানা আয়াত পড়লেন

انما يتقبل الله من المتقين

264

কবিতা শুনে শুনে যারা প্রাণ দিলেন

শায়খুল মুমিন চিশতি ছাবেরীর ছেলে শায়খ সুন্ধা (রাহঃ)

শায়খ সুন্ধার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তি হওয়ার পর কবিদেরকে ডেকে বললেন হাফিজ সিরাজীর সেই কবিতাটি আবৃতি কর।

যার মর্ম হল, আমি অন্যের সান্নিধ্য চাই না যাতে খোদার সান্নিধ্য অর্জন হয়। তোমার ধারণা মতে এটা কেমন করে হতে পারে যে, গাফিল অবস্থায় আল্লাহর কাছে যাব।

কবিরা এই কবিতা শুরু করতেই তিনি খোদা প্রেমের উম্মাদনায় ডুবে যান। আর এ অবস্থায় ২৪ শে জমাদাল উলা ১১২৯ হিজরীতে মারা যান।

(খাজিনাতুল আসফিয়া ৪৫৪)

শায়খ সুলতান ওলদ (কুদ্দিসা সিররুহু)

তিনি ৭১২ হিজরী সনের ১০ই রজব শুক্রবার মৃত্যুবরন করেন। ৬২৩ হিজরীতে তাহার জন্ম হয়। যে রাতে তিনি মারা যান সেই রাতে তার জবান দিয়ে নিম্নোক্ত কবিতার আবৃত্তি চলছিল।

যার মর্ম হল,আজ রাত হলো সেই রাত যে রাতে আমি আনন্দের দৃশ্য উপভোগ করছি। আজ আমার মুনিব থেকে আমার স্বাধীনতা লাভ হবে।

(খাজিনাতুল আসফিয়া ২৫)

শায়খ আব্দুল আজিজ বিন হামীদুদ্দীন নাগুরী (রাহঃ)

তিনি তাঁর পিতার বিশেষ মুরীদ ছিলেন, যৌবনে ইসলামী কবিতা অনুষ্ঠানে মারা যান। আখবারুল আখয়ার কিতাবে উল্লেখিত একদিন কবিতা অনুষ্ঠানে কবি আবৃত্তি করছিল (যার মর্ম হল)

প্রাণ বিসর্জন কর, প্রাণ বিসর্জন কর, অধিক কথাবার্তা হতে পারবে না হে প্রিয়।

এ কবিতা শুনতেই শায়খ আব্দুল আজিজ উচ্চ স্বরে চিৎকার করে

دادم- دادم- دادم-

অর্থাৎ দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম বলে প্রাণ আল্লাহর হাতে অর্পণ করেন।

(খাজিনাতুল আসফিয়া ১৫২)

শায়খ ফয়েজ বখস লাহোরী (রাহঃ)

তিনি লাহোরের খোদা প্রেমে উম্মাদ সুফিদের অন্যতম ছিলেন, সায়্যিদ হায়দার আলী শাহ (রাহঃ) এর অন্যতম মুরীদ ছিলেন। রেশমের কাপড় তৈরী করে জিবীকা উপার্জন করতেন। ইসলামী সংঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। কাহারো প্রতি বিশেষ দৃষ্ঠি ফেললে যে বেহুশ হয়ে যেত।

তাঁর মুরীদদের মধ্যে তার কারামতির আলোচনা প্রসিদ্ধ আছে। প্রত্যেক রাতে তিনবার গোসল করতেন। সারা রাত ইবাদতে কাটাতেন। দুনিয়ার সুস্বাধু জিনিস থেকে দুরে থাকতেন। তাইতো কখন কখন মিষ্টান্ন দ্রব্যের মধ্যে মরিছ ঢেলে দিতেন, তামাকের সাথে লবণ মিশাতেন।

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে জ্বালাময়ী জ্বরে আক্রান্ত হন। কিছু দিন অসুস্থ থেকে ১২৮৬ হিজরী সনের ৯ই রজব মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যুর কিছুক্ষন আগে হাফিজ কাদির বখস কবিকে ডেকে বললেন রাসুলের প্রসংশা সম্বলীত কিছু কবিতা আমাকে শুনাও তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন (যার মর্ম হল)

আমি যেন মুহাম্মদ (সাঃ) এর চলার পথের মাটি হই। মুহাম্মদ (সাঃ) এর চুলগুচ্ছ দ্বারা আমি যেন বন্দি হই। মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাহনীর তালোয়ারের ফলাতে আমি যেন শহীদ হই। মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইজ্জতের তরবারীর আঘাতে আমি যেন মারা যা্ই।

এ কবিতা শুনতেই শরিরে কম্পন শুরু হলো, শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে গেল, আর এ অবস্থায় মারা যান।

(খাজিনাতুল আসফিয়া ৪৭৩)

হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাহঃ)

সিয়ারুল আকতাবে উল্লেখিত তাঁর মৃত্যু বিশেষ এক অবস্থায় হয়। তিনি তাঁর অনুষ্ঠিত কবিতা অনুষ্ঠানে গমন করেন। গায়ক এই কবিতা আবৃত্তি করছিল
(যার মর্ম হল)

আপনার নুরানী দৃষ্টির প্রেমিক কাকে কখন দৃষ্টিতে নিবে, আপনার চুলগুচ্ছের দ্বারা বন্দি কখন মুক্তি পাবে।

এই কবিতা শুনা মাত্রই তিনি রাসুল (সাঃ) এর প্রেমের উম্মাদনায় ডুবে গেলেন। ঐ সময় সালাহুদ্দীনের ছেলে কারিমুদ্দীন, নাসীরুদ্দীনের মত কবিতা কবিতা আবৃত্তিকারিাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা উভয়ে খাজা আহমদ জাম এর নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন (যার মর্ম হল)

অনুগত্য ও সন্তুষ্টির খঞ্জরে শহীদগণ সর্বাক্ষণ নতুন জীবন লাভ করে।

এই কবিতা শুনে খাজা বখতিয়ার (রাহঃ) এর অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল। গোটা মজলিসে কান্নার রুল পড়ে গেল। অনেকের উম্মাদনা শুরু হয়ে গেল। বখতিয়ার (রহঃ) ১০ গজ উচু পর্যন্ত উঠে লাফাতে লাগলেন একাধারে তিন দিন তিন রাত এ অবস্থা চলতে থাকল। তাহার প্রত্যেকটি পশমে আল্লাহর যিকির চালু হল। রক্তের ফোটা প্রবাহিত হতে লাগল, যেই রক্ত ফোটা জমিনে পড়ে তা আল্লাহ নামের আকৃতি ধারন করে। ৪র্থ দিন শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ থেকে سبحان الله এর আওয়াজ শুনা গেল রক্তের ফোটা থেকেও سبحان الله এর আওয়াজ শুনা গেল। কবিরা যখন কবিতার এ অংশ পড়তেন ‘অনুগত্য ও সন্তুষ্টির খঞ্জরে শহীদগণ’ তখন মনে হত খাজা সাহেব এই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। কিন্তু আবার যখন কবিতার এ অংশ পড়তেন ‘সর্বাক্ষণ নতুন জীবন লাভ করে’ তখন আবার জীবিত হয়ে লাফাতে শুরু করতেন। গলাকাটা মুরগের মতো বিছানাতে ছটফট করতে থাকতেন।

অবশেষে ১৪ই রবীউল আউয়াল কবিতা অনুষ্ঠানের ৫ম দিন কবিদেরকে কবিতার ২য় চরণ পড়তে নিষেধ করা হলো। বখতিয়ার কাকী ঐ দিন জোরে চিৎকার মেরে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

মৃত্যুকালে তাহার মাথা খাজা হামিদুদ্দীন নাগুরী (রাহঃ) এর রানের উপর ছিল। উভয় পা শায়খ বদরুদ্দীণ গজনী (রাহঃ) এর কোলে ছিল, উপস্থিত লোকেরা শোরগোল করতে লাগল, কিছু লোক মজলিস থেকে উঠে তাহার জানাযার

267

প্রস্তুতি করতে লাগল। হিন্দস্তানের বাদশাহ সুলতান শামছুদ্দীন আলতামাস (রাহঃ) নিজে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন মাশায়িখ এবং তাহার খলিফাগন মুরীদ গন জন সাধারন জড়ো হলো, গোটা দিল্লী শহরের লোক উপচে পড়ল।

খাজা আবু সাঈদ দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন বখতিয়ার কাকী ওসীয়ত করেছিলেন আমার জানাযার নামাজ এমন ব্যক্তি যেন পড়ায় ১. যে সারা জীবন যিনা থেকে বিরত ছিল। ২. বালেগ হওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আছরের সুন্নত কাযা হয়নি ৩. তাকবীরে উলা ছুটে নাই।

এই ঘোষণার সাথে সাথে উপস্থিত সকল লোক কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে পড়েন। অবশেষে সুলতান আলতামাশ অগ্রসর হয়ে বললেন আমি চেয়েছিলাম আমার এ সকল কর্ম প্রকাশ না হউক, কিন্তু আমার পীর ও মুরশিদের ওসীয়তের কারণে প্রকাশ করতে হলো।

অতপর তিনি জানাযার ইমামতি করেন। নামাজের পর খাটিয়ার এক অংশ নিজের কাঁধে উঠান। বাকী তিন পায়া ঐ সময়ের প্রসিদ্ধ বুজুর্গগণ উঠিয়ে কবরস্থান পর্যন্ত যান।

তাঁর মৃত্যুসন সাফিনাতুল আউলিয়া, আখবারুল আখয়ার, মেরাজুল ওলায়াত প্রমুখ কিতাবে উল্লেখ করা হয় ১৪ রবীউল আউয়াল ৫৩৪ হিজরী।(খাজিনাতুল আসফিয়া ৮৮/৮৯)

বখতিয়ার কাকী (রাহঃ) মৃত্যুর আগে ঈদের দিন ইদগাহ থেকে বাড়ী ফেরার পথে এমন একটি মাঠের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন যেখানে কোন কবর বা লোকালয় ছিলনা। তিনি এখানে দীর্ঘক্ষন দাড়িয়ে থাকলেন। একজন খাদেম বলল ঈদের দিন লোকেরা আপনার অপেক্ষা করছে, আপনি এখানে থামলেন কেন? খাজা (রাহঃ) বললেন 'এখান থেকে আমার কাছে আত্মা সমুহের সুঘ্রাণ আসছে'। পরবর্তিতে ঐ জমিনের মালিকের কাছ থেকে শুধু নিজের জন্য তা ক্রয় করেন। এবং ঐ স্থানকেই নিজের দাফনের জন্য মনোনিত করলেন। এবং ওখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

তাঁর খলিফার সংখ্যা ৯/১০ এর কম ছিল না। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং খাজা মুঈনুদ্দীন (রাহঃ) এর কর্মের পুর্ণতা ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের সৌভাগ্যময় দায়িত্ব খাজা ফরীদুদ্দীন গাঞ্জে শাকার (রাহঃ) এর উপর আসে। (তারিখে দাওয়াত ও আজিমাত ৩য় খণ্ড পৃষ্টা ৩৫-৩৬)

268

খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (রাহঃ)

তিনি বুখারার নিকটে কসরে আরিফাঁয় ৭১৮ হিজরী সনের মুহাররাম মাসে জন্ম গ্রহন করেন। ৭৩ বছর বয়সে ৭৯১ হিজরীতে ৩০ রবীউল আউয়ালে সোমবার দিন মৃত্যুবরণ করেন। কসরে আরেফাঁয় তাঁর মাজার বিদ্যমান আছে। তিনি ওসীয়ত করেছিলেন আমার জানাযার সামনে নিম্নোক্ত কবিতা যেন পাঠ করা হয়। (যার মর্ম হল)

আপনার পানে নিঃস্ব হয়ে আমি এসেছি। আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু সময়ের জন্য আপনার নুরানী চেহারা দেখার সুযোগ দিন।

তাঁর অনেক মুরীদ ছিল। মা-ওরাউন নহরের অধিকাংশ বাসিন্দা তাঁর কাছে বায়আত হন। তাঁর বিশেষ মুরীদ ও কামিল ব্যক্তি হলেন, খাজা পারছা, খাজা আলাউদ্দিন আত্তার, মোল্লা ইয়াকুব চারখী, আলাউদ্দিন গজদুওয়ানী প্রমুখ। (সাফিনাতুল আউলিয়া ১১২)

শায়খ আবু সাঈদ বিন আবুল খায়ের (রাহঃ)

তিনি ৩৫৭ হিজরী সনের মুহাররাম মাসে রবিবার জন্ম লাভ করেন। আর ৪৪০ হিজরীতে শুক্রবার দিন ৮৩ বছর বয়সে মারা যান। তিনি ওসীয়ত করেছিলেন তাঁর লিখা কবিতা যেন জানাযার সামনে পাঠ করা হয়।

যে কবিতাগুলোর মর্ম হলো,

বন্ধু বন্ধুর কাছে যাওয়ার চেয়ে দুনিয়াতে উত্তম আর কি আছে? ওটাতো পুর্ণটাই বিপদ আর এটা হল সরাসরি শান্তি। ওটা শুধু কথা এবং এটা হল পুর্ণ আমল। তাঁর কবর মাহতা নামক স্থানে বিদ্যমান ।(সাফিনাতুল আউলিয়া ২০৮)

শায়খ মুহাম্মদ দাউদ বিন সাদিক গাঙ্গুহী (রাহঃ)

তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার পর তাঁর ছোট ভাই শায়খ মুহাম্মদ কে বললেন আমার কফিন তৈরী কর। কেননা আজ তিন রাত যাবৎ রাসুল (সাঃ) স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে এসে বলছেন দাউদ, আমি তোমার জন্য অধির আগ্রহে আছি, আমার কাছে আস।

শায়খ মুহাম্মদ একথা শুনে কফিন তৈরী করলেন। ১০৯৫ হিজরী সনের রমাজান ইফতারের পর কবিদেরকে ডাকা হলো। কবিতার অনুষ্ঠান শুরু হতেই

তাঁর উম্মাদনা শুরু হয়ে গেল। সারা রাত এ অবস্থায় থাকলেন। সকাল হতেই কবিতা শ্রবণ অবস্থায়ই মারা যান। গাঙ্গুহ প্রদেশে তাঁকে দাফন করা হয়। (খাজিনাতুল আসফিয়া ৪৪৭)

সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সোমনায়ী (রাহঃ)

তাঁর মৃত্যুসন জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা গেছে যে, গিলবার গাহ নামক স্থানে হযরত গিছুদরাজ (রাহঃ) এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গিছুদরাজ (রাহঃ) যেহেতু ৮২৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, তাই বলা যায় ৮২৫ হিজরীর পরও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ ভ্রমনে অনুমান হয় শত বছরের চাইতে বেশী জীবন লাভ করেন।

মৃত্যুর কিছু দিন আগ থেকেই খোদার ধ্যানের জগতে ডুবে যান। শুধু নামাজের সময় জ্ঞান ফিরে আসত। মৃত্যুযন্ত্রণার ভিতর দিয়েও মানুষকে পথ পদর্শনের কাজ চালু ছিল। তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণার সময়ের অবস্থার আলোচনা করতে যেয়ে লাতায়িফে আশরাফির মুসান্নিফ লিখেন

প্রশিদ্ধ লোকেরা ও বুজুর্গগণ উপস্থিত হলেন। প্রত্যেককে তিনি সুসংবাদ দিলেন, কল্যানের জন্য দোয়া করলেন। তিন দিনে অগণিত মানুষ তাঁর কাছে তওবা করে বায়আত গ্রহণে ধন্য হয়। দেশের সরকার ১২ হাজার লোক নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ করে।

মৃত্যুর দিন হযরত নুরে আইন (রাহঃ) শায়খ নুজমুদ্দীন ইস্পাহানী, মুহাম্মদ দুররে ইয়াতিম, খাজা আবু মাকারিম, আহমদ আবুল ওফা, খাত্তাব জামী, আব্দুস সালাম হারবী, আবুল ওয়াসিল, মারুফ দিমুবী, আব্দুর রহমান খাজন্দী, আবু সঈদ খারাযী, মালিক মাহমুদ, শামছুদ্দীন আওদী সহ আরোও অন্যান্য আকাবিরদেরকে ডেকে কাছে বসিয়ে নসীহত করলেন, বরকত দিলেন।

সায়্যিদ আব্দুর রাজ্জাক (যার উপাধি ছিল নুরুল আইন) কে হযরত জাহাঙ্গির নিজের ধর্মিয় সন্তান বানিয়ে ছিলেন, তাই তাঁকে মৃত্যুকালে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানালেন। আর তাঁকে নিজের ঐ বরকতী জামা প্রদান করলেন যাহা তিনি শায়খ আলাউদ্দিন লাহোরী থেকে পেয়েছিলেন। চিশতিয়া তরীকার বুজুর্গ দের ঐ সকল বরকতও প্রদান করলেন যা নিজ মুর্শিদের মাধ্যমে পেয়েছেন। অতপর নুরুল আইনের ছেলেদের ডেকে এনে তাদের জন্য দোয়া করলেন। নিজের বিভিন্ন খলিফাদের ডেকে নসীহত করলেন। বিশেষ দিক নিদর্শনা দিলেন।

270

বরকত প্রদান করলেন। জোহরের নামাজের পর কবিদের ডেকে অনুষ্ঠান আয়োজনের চাহিদা প্রকাশ করলেন। কবিরা শেখ সাদীর কবিতা গাইতে শুরু করল। যখন তাঁর নিম্নোক্ত কবিতা গাইল যার মর্মার্থ হল, যদি আপনার হাতে আমার জীবন আসে তাহলে কলমের লিখার উপর আমি সন্তুষ্ঠ।

কবিতা শ্রবনের সাথে সাথে উম্মাদনা চলে আসল। এত বেশি কাঁদতে লাগলেন যা সীমার বাইরে ছিল। একবার কিছু সময় শান্ত হলেন। তখন কবিরা অন্য আরেকটি কবিতা আবৃত্তি করল, যার মর্মার্থ হল, 'এর চাইতে যদি ভালো না হয় তাহলেও বন্ধ বন্ধুর কাছে হেসে হেসে যচ্ছে' অর্থাৎ প্রেমিকের সৌন্দর্য্যতা প্রাণ ভরে দেখবে, হেসে হেসে প্রাণ বিসর্জন দিবে।

এ কবিতা শুনতেই সীমাহীন কম্পন হতে লাগল, আত্মাতে আগুন লেগে গেল, বুক ধরফর করতে লাগল, গলা কাটা মুরগীর মত লাফাতে লাগলেন, পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায় জমিনে পড়ে গড়াগড়ি করতে লাগলেন। শেষ পর্যায়ে জবান দিয়ে আহ! বের হলো, আর প্রাণ খোদার হাতে সোপর্দ করেন।

মৃত্যুকালে বয়স ছিল একশত বিশ বছর। জীবদ্দশায় তাঁর মাজার নির্মাণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মাজার শরীফ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, কোন জিন ভুতে আক্রান্ত ব্যক্তি তাঁর মাজারে কিছুদিন অবস্থান করলে তাঁর জিন দুর হয়ে যায়। তাইতো আজ অবধি বিভিন্ন স্থান থেকে জিন ভুত আক্রান্ত লোকদের একটি বড় দল সেখানে অবস্থান করে। (বজম সুফিয়া-৫৩৭/৫৩৮)

আবু সাঈদ খাররাজ (রাহঃ)

তিনি মৃত্যুকালে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন যার মর্মার্থ হল, আরিফদের অন্তরে প্রত্যেক নিঃশ্বাসের কামনা হচ্ছে যিকর। এবং মোনাজাতে তাদের ভেদের কথাবার্তা। অস্তিত্বকে মিটানোর পেয়ালা পান করায় তারা দুনিয়াকে ভুলে গেছে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেভাবে সব কিছু ভুলে যায়। এই ময়দানে দ্রুত গতিতে চলাই তাদের ভাবনা। আলোকিত তারকার মত মহব্বতকারিদের জাহান হবে। জমিনের উপর তাদের দেহ এশকের দ্বারা আসক্ত। অদৃশ্যের পর্দার অন্তরালে তাদের রুহের বিচরণ। বন্ধুর নিকটবর্তি হওয়ার জায়গা ছাড়া কোথাও নিঃশ্বাস ফেলেন না। কিছু ক্ষতি হয়ে গেলেও তাদের কোনো বিরক্তি নাই।

271

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহ:) কে বলা হলো যে, আবু সাঈদ খাররাজ এর মরণের সময়ের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। জুনাইদ বাগদাদী (রাহ:) বললেন, খোদা প্রেমে তাঁর রূহ যদি উড়ে যেত, তাহলেও তা আশ্চর্য্যজনক কিছু ছিল না।

(এহইয়াউল উলুম ৪/৬৭৯)

শায়খ হাসান (রাহ:)

শায়খ হাসান (রাহ:) প্রথমে আধ্যাত্মিকতার ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, অতপর দিল্লি সালতানাতের অন্যতম ন্যায় পরায়ন শাসক সুলতান সিকন্দর (রাহ:) এর অনুরুধে দিল্লি চলে আসেন। দিল্লিতে চার দেয়ালে ঘেরা একটি বাস ভবনে জীবন যাপন করলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন তাঁর মাজারও সেখানে বিদ্যমান।

বর্ণিত আছে, বাদশাহ সিকান্দরের পুত্র ফতেহ খান শায়খের উপর আস্থাশীল ছিল। হঠাৎ অন্তরে বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চিন্তা আসল, বাদশাহর প্রজাগণ এক্ষেত্রে একমত হল। কিন্তু যখন তিনি শায়খ হাছানের সাথে পরামর্শ করলেন, তখন শায়খ হাছান তাকে এটা থেকে বাধা দিলেন এবং নিরাপত্তার সুসংবাদ দেন। আর এ বিষয় বাদাশাহকে তার অনুসারী হতে প্রেরনা যোগায়।

আরো বর্ণিত আছে, যখন শায়খ হাসান দিল্লিতে আসেন তখন বাদশাহ স্বপ্নযোগে তাঁর কামালাত ও বুজুর্গী সম্পর্কে অবগত হন। ফলে তিনি শায়খের প্রতি আকৃষ্ঠ হন।

শায়খ হাসান (রাহ:) ৯০৯ হিজরীতে আল্লাহর প্রেমে উম্মাদ অবস্থায় মারা যান। তখন তার মজলিসে নিম্নোক্ত পংক্তি পড়া হচ্ছিল যারা অর্থ হল, যেই শরাবের মধ্যে আমার প্রাণ সম্পৃক্ত। ঐ শরাব থেকে পান করাও হে পানকারি ব্যক্তি।

তাঁর লিখিত কিতাব "মিফতাহুল ফয়জ" আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মধ্যে তাঁর স্মৃতি চিহ্ন।

(আনফাছুল আরিফিন ৩৪৯)

272

শায়খ ফখরুদ্দীন ইরাকী (রাহঃ)

উনার বড় ছেলে শায়খ কবিরুদ্দীন হিন্দুস্তান থেকে তাঁর সাক্ষাতে আসলেন। ছেলে আসার কিছু দিন পর তাঁর চেহারা ফুলে যায়। যদ্দরুন একাধারে পাঁচদিন ঘুমাতে পারেন নাই। এই অসুস্থতায় তিনি মৃত্যুবরন করেন।

মৃত্যুকালে বড় ছেলেকে ডেকে নিম্নের আয়াত পড়ে শুনালেন

يَوْمَ يَفِرُّالْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ

অর্থাৎ সে দিন মানুষ তার ভাই, মা, বাবা থেকে, স্ত্রী থেকে, সন্তান থেকে, পলায়ন করবে, প্রত্যেক ব্যক্তি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, সে অন্য দিকে মনযোগি হতে পারবে না, এই আয়াত পাঠ করে একটি কবিতা পাঠ করেন।

যার অর্থ হল, পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে এ বিশ্ব জগত অস্তিত্বে আসে। মানুষের চাওয়ার ভিত্তিতে নয়। যার জন্য যতটুকু নির্ধারিত তার থেকে বেশি ও পাবে না কমও পাবে না।

এই কবিতা পাঠ করার পর কালিমা তাইয়্যিবাহ পড়ে পড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় হন। (বজম সুফিয়া ২০০)

মিরআতুল খিয়ালের মধ্যে ঐ কবিতার অপর অংশ ছিল যার অর্থ হল, প্রত্যেককে তার জন্য নির্ধারিত হারে দেওয়া হবে, তাতে বেশকম করা হবে না।

হযরত শাহ ফখরুদ্দীন (রাহঃ)

হযরত শাহ ফখরুদ্দীন (রাহঃ) ২৭ জুমাদাছ ছানী ১১৯৯ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

(শাজারাতুল আনওয়ার)

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর। মৃত্যুর একদিন পুর্বে নিজ জবানে মসনবীর কবিতা পাঠ করেন। যার অর্থ হল, আসার সময় উলঙ্গ ছিলাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন অতিবাহিত করেছিলাম আশা-আকাঙ্ক্ষায় ।

মৃত্যুকালে তিনি ওসিয়ত করেছিলেন, মৃত্যুর পর তার লাশ যেন মিড়ু খাঁনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মিড়ু খাঁন তার মুরিদদের মধ্যে প্রিয় একজন ব্যক্তি ছিল। তিনি পাহাড় গঞ্জ নামক স্থানে বসবাস করতেন। হাজি মুহাম্মদ আমিন (যিনি শাহ ওলী উল্লাহ (রাহঃ) এর মুরিদ ছিলেন) তাকে গোসল দিলেন। খাজা

কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাহ:) এর মাজারের পার্শ্বে দাফন করা হয়। তাঁর বক্তবৃন্দের এক বিরাট দল লাশের সাথে সাথে ছিলেন। বাদশাহ ২য় আকবর শাহ বিরাট বাহিনি নিয়ে কেঁদে কেঁদে কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছেন
(তারীখে মাশায়িখে চিশত ৫১৩-৫১৪)

পানি বহনকারির সন্তানের ঘটনা

হযরত গিছুদরাজ (রাহ:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বাদশাহ ছিল। প্রতি দিন বাড়ীর আঙ্গিনায় বল খেলতেন, তীর নিয়ে খেলা করতেন। আর পানি বহনকারীর এসে আঙ্গিনায় পানি ছিটিয়ে ঝাড়ু দিত। এদিকে বাদশাহর মেয়ে জানালার কাছে বসে এ সকল তামাশা দেখত। একদিন বাদশাহর মেয়ের দৃষ্টি পানি বহনকারীর ছেলের উপর পড়ে যায়। আর মেয়ের অন্তরও তার দিকে ধাবিত হয়ে যায়। সে আসক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিদিন জানালায় দাড়িয়ে মেয়েটি ছেলেকে দেখত।

একদিন ছেলেকে দেখতে না পেয়ে মেয়েটি ধৈর্য্যহারা হয়ে নিম্নের কবিতাটি পড়ে কান্না করতে লাগল।

অর্থাৎ হে মাতাল লোকদেরকে পানি পান করানেওয়ালা। পানি বহনকারীরর ঐ ছেলেকে বলে দাও, সে যেন মাথা থেকে ঐ চুলের গোছা কেটে দেয়, যা আমার অন্তরকে দু:খ দিয়েছে।

এদিকে বাদশাহ উপরের তলার জানালায় বসে বসে কবিতা আবৃত্তি ও কান্নার আওয়াজ শুনে নিচে নেমে এসে দেখল তার মেয়ে কবিতা পড়ছে আর কান্না করছে। সে মেয়েকে বলল কেন কান্না করছ? কোন কবিতা পড়তে ছিলে? সে বলল এই কবিতা আবৃত্তি করছিলাম

যার অর্থ হল, হে মাতাল লোকদেরকে পানি পান করানেওয়ালা, পানি বহনকারির ছেলেকে বল, মাথার উপরে রাখা নিজের ঐ পাত্রকে যেন দেখে যা প্রত্যেক রকমের অনিষ্টতাকে দূর করে দেয়।

এটা শুনে বাদশাহ বুঝে নিতে পারলেন, মেয়েটি পানি বহনকারির ছেলের প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। এবং এখন কবিতা পরিবর্তন করে বরছে। তাই বাদশাহ এ ব্যাপারে উজিরের সাথে পরামর্শ করলেন। উজির বলল এটাতো বড় ভয়ংকর বিষয়। শাহজাদিকে বলুন, শরীরে রক্ত অতিরিক্ত হয়ে গেছে। রগ থেকে রক্ত বের করার প্রয়োজন হলো চিকিৎসার একটি পদ্ধতি অসুস্থ ব্যক্তির একটি রগে

অস্ত্র ঢুকিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা, কিছুক্ষন পর ডাক্তার অবস্থাভেদে আবার বন্ধ করে দেয়। এর দ্বারা শরীরের ময়লা রক্ত বের হয়ে যায়) উজির বাদশাহকে বলল মেয়েকে রক্ত বের করার কথা বলে বাথরুমে নিয়ে রক্ত নালি কেটে দিয়ে তা আর বন্ধ করবে না। উজিরের কথামত এরূপ করা হলো। মেয়েটি মৃত্যুর পুর্বে নিজের আঙ্গুলী রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে তিন লাইন কবিতা লেখে গেল।

যার অর্থ হল, যদি আমি মরে যাই, তাহলে আমার মৃত শরীর তাকে দিয়ে দিবে। যদি সে আমার ঠোঁটে চুমু খায়।

বাদশাহ যখন মেয়ের অবস্থা দেখতে বাথরুমে গেল তখন এই তিনটি লাইন দেখতে পেলেন।

চতুর্থ লাইন লেখার আগেই সে মারা যায়। নারিদেরকে ডেকে বাদশাহ চতুর্থ লাইন পূর্ণ করার জন্য বললেন। কিন্তু কারো বুঝে আসিছিল না। একটি মেয়ে চতুর্থ লাইন এভাবে লাগিয়ে দিল যার অর্থ হল যদি সে ঠোঁটে চুমু খায় আর আমি জিবিত হয়ে যাই তাহলে তা আশ্চর্য্যের কিছু না। (মালফুজাতে খাজা গিছুদরাজ ৪২৩)

এক সুদর্শন বাদশাহর ঘটনা

হযরত গিছুদরায আপন শায়েখ থেকে বর্ণনা করেন। এক ছিল সুদর্শন বাদশাহ যখন সে সওয়ার হয়ে কোথাও বাহির হত তখন লোকেরা আসক্ত হয়ে তার চতুর্দিকে জমা হত।

একদিন বাদশাহ তার প্রহরিকে বলল, এ সকল ভালোবাসার দাবীদার লোকদের মধ্যে তুমি সত্যিকার মহব্বতকারি কাউকে পেয়েছো? প্রহরী বলল একজন ব্যক্তিকে পেয়েছি। বাদশাহ বলল সে সত্যিই আমার প্রতি আসক্ত তার প্রমান কি? প্রহরী বলল সে যেখান থেকে আপনার থেকে পৃথক হয় আপনি সেস্থানে ২য় বার না আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরে না। খানা-পিনা সব ছেড়ে দেয়। কেহ জোরপুর্বক খাওয়ালে খায়।

বাদশাহ বলল তুমি সঠিক বলেছ। এটাই হল সত্যিকার অর্থে ভালোবাসার আলামত। বাদশাহ বলল এখন সে কোথায় আমার অপেক্ষা করছে? প্রহরী বলল অমুক ময়দানে। বাদশাহ সওয়ার হয়ে সেই ময়দানে পৌঁছলেন। আর প্রহরীকে বললেন ঐ ব্যক্তি কোথায়? প্রহরী বলল ঐ যে ভীতু অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। সেই হল ঐ ব্যক্তি। বাদশাহ ঐ ব্যক্তির দিকে গোলাকৃতির একটি বস্তু

275

(বল) ছুড়ে মারলেন। বলটি তার কাছে পড়ল। অতপর বাদশাহ ঘোড়া ধীরে ধীরে চালিয়ে তার কাছে পৌঁছলেন আর বললেন বলটি দাও। ঐ মিসকিন বলের উপরই প্রাণ দিয়ে দিল। (মালফুজাতে খাজা গিছুদরাজ)

276

কবর জগতের অবস্থা

রূহ সমুহের পরস্পর সাক্ষাৎ ও পরিচিতি

স্পষ্ট হাদিসসমুহ দ্বারা রূহ সমুহের পরস্পর সাক্ষাতের বিষয় প্রমানিত। আবু লুবাবা বর্ণনা করেন বিশর বিন মারূফ (রা:) এর মৃত্যুতে তার মাতা উম্মে বিশর একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। রাসুলের কাছে যেয়ে বললেন হে আল্লাহর রাসুল, মরণশীল বংশ সালামা বংশের লোকই বেশী মারা যায়। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন মৃত ব্যক্তিরা একে অপরকে চিনতে পারে কি? যদি চিনে থাকে তাহলে আমি বিশরের কাছে সালাম প্রেরন করলাম। রাসুল বললেন খোদার কছম গাছের মধ্যে অবস্থানকারী পাখি যেভাবে চিনা যায় তেমনি মৃত ব্যক্তিরা একে অপরকে চিনে। অতপর সালমা বংশের কেহ মৃত্যুবরণ করলে উম্মে বিশর মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়ে সালামের পরে বলতেন বিশরকে আমার সালাম দিও।

উবাইদ বিন উমাইর (রাহ:) বলেন, রূহ সমুহ সংবাদের অপেক্ষায় থাকে। যখন তার কাছে কোন মৃতব্যক্তি আসে তখন তারা জিজ্ঞাসা করে অমুকের খবর কি? অমুকের খবর কি? তখন ঐ ব্যক্তি বলেন ভাল আছে। আর যদি কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন সে বলে সে তো মারা গেছে। তোমাদের কাছে কি আসে নাই? তখন মৃত ব্যক্তিরা বলে না আসে নাই। তখন তারা انا لله পড়ে আর বলে তাকে অন্য রাস্তা দিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাস্তা দিয়ে আনা হয়নি।

সালেহ আল মুররী বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, মৃত্যুর সময় রূহসমুহ পরস্পর মিলিত হয়ে আগত রূহকে জিজ্ঞাসা করে তোমার ঠিকানা

277

কোথায়? তুমি ভাল কাজ করেছ না মন্দ কাজ করেছ? একথা বলে সালেহ (রাহ:) কাঁদতে থাকেন। এক পর্যায়ে আওয়াজ স্তব্দ হয়ে যায়।

উবাইদ বিন উমাইর (রাহ:) বলেন রূহসমুহ নতুন মৃত্যুবরনকারী রূহকে স্বাগত জানায় এবং তার কাছে নিজেদের নিকটাত্মিয়দের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে। যেভাবে প্রবাসী ব্যক্তি নিজ দেশ থেকে আগত ব্যক্তির কাছে আত্মিয় স্বজনের কথা জিজ্ঞাস করে।

যদি আগত নতুন রূহ কোন আত্মিয় সম্পর্কে মৃত্যুর খবর দেয় আর ঐ রূহের সাথে সাক্ষাৎ না হয় তখন আগে মরে যাওয়া রূহগুলো বলে তার মা তাকে হাবিয়াতে (জাহান্নামের এক স্তর) পৌঁছে দিয়েছে।

সায়িদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাহঃ) বলেন যখন মানুষ মারা যায় অদৃশ্য ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর ন্যায় তার পিতা তাকে স্বাগত জানান।

উবাইদ বিন উমাইর (রাহ:) থেকে একথাও বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তি বলে, যদি আমি নিজের পরিবারের লোকের রূহের সাথে সাক্ষাতে নৈরাশ হই তাহলে ভিষণ চিন্তায় আমি শেষ হয়ে যাব।

রাসুল (সা:) বলেন মুমিন ব্যক্তির রূহ কবজ করার পর রহমতের ফেরেস্তারা এভাবে স্বাগত জানান যে ভাবে কোন সুসংবাদ দাতাকে মানুষ স্বাগত জানায়। আর ঐ মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে অন্যান্য মৃত্যু ব্যক্তিদেরকে বলা হয় একটু আরাম করতে দাও। সে খুব কষ্টের মধ্যে ছিল। অতপর মৃত ব্যক্তিরা জিন্দা ব্যক্তিদের নাম নিয়ে নিয়ে অবস্থা জিজ্ঞাস করেন। অমুক মহিলার খবর কি? অমুক মহিলার বিবাহ হয়ে গেছে নাকি? যখন তাহারা এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে মারা গেছে। তখন নতুন মৃত ব্যক্তি বলে সে তো আমার আগে মারা গেছে। তখন রূহ সমুহ اِنَّالِلّٰہ পড়েন আর বলতে থাকেন তাকে তার মা হাবিয়াতে প্রেরন করেছে। মাও খারাপ, তার কোলে যাকে নিয়েছে সেও খারাপ।

(কিতাবুর রূহ, ইবনুল কাইয়্যিম ৫৯-৬০)

একজন ইবাদতকারি যুবক

জুয়াইরিয়া বিনতে আছমা (রাহ:) বলেন আমরা আকদান নামক স্থানে থাকাকালে আমাদের পাশেই কুফা নগরের একজন যুবক বসবাস করত। সে

খুবই ইবাদতকারি ছিল। সে মৃত্যুবরন করার পর আমরা মনস্থ করলাম আবহাওয়া কিছু ঠান্ডা হওয়ার পর তার দাফনের ব্যবস্থা করব।

দাফনের পূর্বে আমার ঘুম আসল। স্বপ্নে দেখি আমি একটি কবরস্থানে আছি। সেখানে একটি মুতির গুম্বুজ রয়েছে। আমি এটার সৌন্দর্য্যতা দেখতে থাকলাম। ইত্যবসরে দেখলাম গুম্বুজ ফেটে গিয়ে একজন উজ্জল সুদর্শন যুবক বাহির হয়ে আমার কাছে এসে বলল, আল্লাহর কছম দিয়ে তোমাকে বলছি জুহরের সময় থেকে অধিক সময় ঐ যুবক কে আটকে রেখ না।

এটুকু বলার পর পরই ভয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সাথে সাথে ঐ যুবকের কাফন দাফনের কাজ শুরু করি। আমরা তাকে ঐ স্থানেই দাফন করলাম যেখানে গুম্বুজ দেখে ছিলাম (স্বপ্নে)

(কিতাবুর রূহ ৬৮)

একটি ছোট্ট মেয়ের ঘটনা

ইয়াযিদ বিন নুআমা (রাহ:) বলেন, একটি ছোট মেয়ে প্লেগ মহামারিতে মারা গেল। তার পিতা তাকে স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা জানতে চাইলেন। মেয়েটি বলল আমরা এমন মহান জায়গায় পৌঁছেছি যে, আমাদের ইলম আছে কিন্তু আমলের শক্তি নাই। কিন্তু তোমাদের আমলের শক্তি আছে কিন্তু ইলম থেকে বঞ্চিত। আল্লাহর কছম এক দুই তাছবীহ এবং এক দুই রাকাআত যা আমার আমল নামাতে আছে তা আমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু থেকে প্রিয়।

(কিতাবুর রূহ ৬৯)

কয়েক আল্লাহওয়ালা নারীর ঘটনা

কাছির ইবনে মুররাহ (রাহ:) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম জান্নাতের কোন এক উচু ভবনে প্রবেশ করছি। আর ভবনটি ঘুরে ঘুরে দেখছি আর আনন্দ লাভ করছি। ইত্যবসরে দেখলাম একটি মসজিদের এক প্রান্তে কিছু মহিলা। আমি তাদের কাছে গিয়ে সালাম করলাম আর বললাম কোন আমলের দ্বারা এ স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছ? তারা বলল সিজদা আর তাকবীরের মাধ্যমে।

(কিতাবুর রূহ)

279

হাফিজ খাজা সায়্যিদ আব্দুল্লাহ (রাহঃ)

শাহ ওলীউল্লাহ ছাহেব (রাহঃ) এর পিতা বলেন যে সময় আওরঙ্গজেব আকরাবাদ ছিলেন, তখন আমি মির্জা জাহিদ হারবীর নিকট পড়তাম সেনাবাহিনিকে পড়ানোর এই সুবাদে পিতার সাথে আকরাবাদ আসলাম। তখন সায়্যিদ আব্দুল্লাহও সায়্যিদ আব্দুর রহমানের বন্ধুত্বের কারণে এখানে ছিলেন। সায়্যিদ আব্দুল্লাহ অসুস্থতার ধরুন এখানেই মারা গেলেন।

তিনি মৃত্যুকালে ওসিয়ত করেছিলেন মিছকিনদের কবরস্থানে আমাকে দাফন দিও। যাতে কেউ আমাকে চিনতে না পারে। ওসিয়ত মোতাবেক লোকেরা তাঁকে ওখানেই দাফন করল। আমি অসুস্থতার কারণে জানাযায় শরীক হতে পারি নাই। সুস্থ হওয়ার পর একজন সাথি নিয়ে তার কবর জিয়ারতে গেলাম। এই সাথি তাঁর দাফনে শরিক ছিলেন। কিন্তু ঐ সাথিও তখন তাঁর কবর চিনতে পারলেন না।

এটা ছিল তার ওসিয়ত পুরণের নিদর্শন। এক পর্যায়ে ঐ সাথি অনুমান করে একটি কবরের দিকে ইশারা করলেন। আমি ওখানেই বসে কুরআন পড়তে শুরু করলাম। আমার পিছন দিক থেকে সায়্যিদ সাহেব আওয়াজ দিয়ে বললেন, কবর এ দিকে। তবে যা কিছু শুরু করেছ তা পুর্ণ করে নাও। উহার ছাওয়াব ঐ কবর ওয়ালাকে বখশিয়ে দাও। তাড়াহুড়া কর না। যা পড়ছ তা পুর্ণতায় পৌঁছাও।

আমি এই আওয়াজ শুনে সাথিকে বললাম, তুমি ভাল করে চিন্তা করে দেখ যেই কবর তুমি আমাকে দেখিয়েছ এটাই কি সায়্যিদ সাহেবের কবর না আমার পিছনের কবর? কিছুক্ষন পর আমার সাথি বলল আমার বলতে ভুল হয়েছে তোমার পিছনেই সায়্যিদ সাহেবের করব। অতপর আমি সায়্যিদ সাহেবের কবরের বরাবর সামনা সামনি হয়ে পড়তে শুরু করলাম। অন্তরের বিরহ বেদনায় আমি কুরআন পড়তে গিয়ে বেশ কিছু জায়গায় ক্বেরাতের নিয়ম কানুন রক্ষা করি নাই। অতপর কবর থেকে আওয়াজ আসল, অমুক অমুক স্থানে পড়তে গিয়ে অলসতার সাথে পড়েছ। ক্বেরাতের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সতর্কতার প্রয়োজন।

(আনফাছুল আরিফিন ৫৬-৫৭)

মৃত ব্যক্তিদের আল্লাহর যিকির

শাহ আব্দুর রহিম (রাহঃ) বলেন, এক রাতে আমি ভ্রমন করতে করতে খুবই সুন্দর এক কবরস্থানে উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলাম। অবস্থানকালে আমার অন্তরে উদয় হল যে, এই মুহূর্তে আমি ছাড়া আর কেহ আল্লাহর জিকির ব্যস্ত নয়। এ ধারনা উদয় হওয়া মাত্র সহসাই আমার সামনে বয়স্ক কুজো এক ব্যক্তি আত্মপ্রাকাশ হয়ে পাঞ্জাবী ভাষায় গান গাওয়া শুরু করল।

তার গানের ভাবার্থ হল বন্ধুর সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা আমার প্রবল হয়ে গেছে। আমি গান শুনে প্রভবিত হয়ে তার দিকে অগ্রসর হলাম। কিন্তু আমি যত অগ্রসর হই তিনি তত পিছন দিকে যেতে থাকেন। এক পর্যায়ে ঐ ব্যক্তি বলল তোমারতো ধারনা এখানে তুমি ছাড়া আর কেহ যিকির করছে না। আমি বললাম আমার ধারনা ছিল যিন্দা কেহ যিকির করছে না। তখন লোকটি বলল আগে তোমার অন্তরে যিন্দা মুর্দা সবার ব্যাপারে যিকির না করার ধারনা ছিল, এখন তুমি নির্দিষ্ট করেছ। একথা বলে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কবরবাসির কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ প্রদান

শাহ ওলীউল্লাহ (রাহঃ) এর পিতা বলেন। একদা বায়োজিদ (রাহঃ) বায়তুল্লাহ জিয়ারতের ইচ্ছা করলেন। তাঁর সাথে বৃদ্ধ, ছোট বাচ্চা ও মহিলারা যেতে প্রস্তুত হলো। অথচ কারো কোন পাথেয়ের ব্যবস্থা ছিল না। আমি ও অন্যান্য সহ পাঠিরা মনস্থ করলাম তাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে দিতে।
যখন আমরা তুগলকাবাদ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন দিন অত্যন্ত প্রখর হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা একটা ছায়াদার বৃক্ষের নিচে আরামের জন্য বসলাম আমি ছাড়া অন্যান্য সকল সাথিরা ঘুমিয়ে পড়ল। আমি জাগ্রত থেকে কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য আসবাবপত্রের পাহারাদারি করছিলাম। আমি নিজেকে সজাগ রাখার জন্য কুরআন তেলাওয়াত শুরু করলাম। কয়েকটি সুরা তেলাওয়াত করে নিশ্চুপ হয়ে থাকলাম। তখন পার্শে অবস্থিত এক কবর থেকে আওয়াজ আসল। তিনি বলতেছেন বহুদিন যাবৎ কুরআনের সুমধুর তেলাওয়াত

শুনতে ব্যাকুল হয়ে আছি, আপনি আরো তেলাওয়াত করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।
আমি তখন আরো কিছু তেলাওয়াত করে নিশ্চুপ থাকলাম। তখন কবরবাসি ব্যক্তি আরো তেলাওয়াত করার জন্য বললেন। আমি আরো কিছুক্ষন তেলাওয়াত করে নিশ্চুপ রইলাম। তখন ৩য় বার আমাকে তেলাওয়াত করার জন্য কবরবাসি অনুরূধ করলেন। আমি আরো কিছুক্ষন তেলাওয়াত করে নিরব থাকলাম। অতপর এই কবরবাসি ব্যক্তি আমার অন্যান্য সাথিবৃন্দকে স্বপ্ন যোগে বললেন, আমি আপনাদের সাথিকে আবার তেলাওয়াত করার আদেশ দিতে লজ্জা অনুভব করছি। আপনারা তাঁকে বলুন সে যেন আবারো কিছু তেলাওয়াত করে আমার রূহের খোরাক প্রদান করে।
তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করল। আমি অন্য বারের তুলনায় কিছু বেশী তেলাওয়াত করলাম। তখন আমি ঐ কবরবাসির আনন্দ অনুভব করলাম এবং তিনি আমাকে বলেন আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।
আমি তখন তাঁকে আলমে বরযখ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। কবরবাসি বললেন আমি এই কবরস্থানের অন্যদের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। তবে আমার নিজের অবস্থা শুনাতে পারি। অতপর তিনি তার নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি যেই দিন পৃথিবী থেকে এসেছি সেই দিন থেকে আমি কোন প্রাকারের শাস্তি দেখি নাই এবং সম্মান পাইনি। যদিও অধিক পুরুস্কৃত হইনি। আমি বললাম কোন আমলের বরকতে আপনি আযাব থেকে নিস্কৃতি পেলেন? তিনি বললেন আমি সর্বদা চেষ্টা করতাম দুনিয়ার ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন রাখার। ইবাদত থেকে অন্য মনস্ক করে দেয় যে সকল বস্তু তা থেকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতাম। যদিও আমলের চাদর পুর্ণভবে পরিধান করতে পারি নাই। তথাপি আল্লাহর উত্তম নিয়াতের কারণে আমাকে আযাব থেকে নিস্কৃতি দান করেছেন।
(আনফাছুল আরিফিন ১১৪)

হযরত শায়খ মুহাম্মদ (রাহ:)

তিনি বলেন আমার আত্নিয়দের মধ্যে থেকে মুহাম্মদ সখী নামে এক ব্যক্তি ইউরোপের এক স্থানে শহিদ হন। আমি ছাত্রজীবনে একবার জেটু মসজিদের

একটি কামরায় দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম। হঠাৎ করে আমার ঐ আত্মিয় আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করল। তার পরিধানের কাপড় ও হাতিয়ারের ঝলমলতা জমিনে পড়ছিল। আমি তাকে বললাম তোমার ব্যাপারে কিছু আমাকে বল। তিনি বললেন আমি যখন আঘাত প্রাপ্ত হলাম তখন এমন স্বাদ অনুভব করলাম যার মিষ্টতা এখনো আমর অন্তরে অনুভুত হচ্ছে। এই মুহুর্তে বাদশাহর সৈন্যবাহিনি অমুক মন্দির ভাঙ্গতে যাচ্ছে। আমিও তাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। এই স্থান দিয়ে অতিক্রমের সময় আপনার সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি হল বিধায় আপনার কাছে আসলাম।

যখন শায়খ মুহাম্মদ (রাহঃ) এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তখন শাহ আব্দুর রহিম (শাহ ওলীউল্লাহ এর পিতা) তার কবরের পাশে উপস্থিত লোকদেরকে উচ্চস্বরে যিকিরের নির্দেশ প্রদান করলেন। যিকিরের মজলিস শেষ হওয়ার পর আব্দুর রহিম (রাহঃ) বললেন, শায়খ মুহাম্মদ (রাহঃ) এর রূহ আমার সামনে আত্মপ্রকাশ হয়ে বলেছেন, আল্লাহ আমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে, শরীর সহ আপনাদের কাছে হাজির হওয়ার। কিন্তু এটা নিয়মের বহির্ভূত বিষয় তাই এরূপ করা থেকে বিরত রইলাম।

(আনফাছুল আরিফিন ৩৬৫)

মাওলানা ফয়জুল হাসান সাহেব (রাহঃ)

মাও.ফয়জুল হাসান হলেন সাহারানপুরী (রাহঃ) এর জামাতা। যে স্থানে মাও.ফয়জুল হাসান সাহেব (রাহঃ) মারা যান সেখানে এক মাস যাবত আতরের খুশবু পাওয়া যায়। হযরত কাসিম সাহেব (রাহঃ) এই ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, এটা দুরুদ শরীফ পাঠের বরকত। মাও.সাহেবের অভ্যাস ছিল প্রত্যেক জুমআর রাত্রে জাগ্রত থেকে দুরুদ শরীফ পড়তেন।

(ফাজায়েলে দুরুদ শরীফ ৯৫)

উছমান বিন সাওয়াদ তুফাবী (রাহঃ) এর মা

উছমান বিন সাওয়াদ বলেন তাঁর মাতা ইবাদাত কারিনী নারীদের একজন ছিলেন। তাঁকে রাহিবাহ (দরবেশ নারী) বলা হত।

283

তাঁর মৃত্যুর সময় যখন নিকটবর্তি হল তখন তাঁর মা আকাশের দিকে চেহারা উঠিয়ে বললেন হে আমার আল্লাহ, যার উপর আমার জিবনের এবং মৃত্যুর পরের ভরসা, আমাকে মৃত্যুর সময় অপদস্থ কর না, কষ্টে নিপতিত কর না। এ কথা বলেই মারা যান। আমি প্রত্যেক শুক্রবার তাঁর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর জন্য দোয়া-ইস্তেগফার করি। অতপর অন্যান্য কবরবাসির জন্যও দোয়া করি।
এক রাতে স্বপ্নে আমার মাকে দেখে বললাম আপনি কেমন আছেন? মা বললেন মৃত্যু বড় কঠিন মুসিবত। আলহামদু লিল্লাহ আলমে বরযখে ভাল অবস্থায় আছি। সেখানে আমার জন্য ফুল বিছানো হয়েছে। রেশমের বালিশ রাখা আছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে থাকবে।
আমি বললাম আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? মা বললেন হ্যাঁ। আমার যিয়ারতে আসা ছেড়ে দিও না। যখন তুমি শুক্রবার ঘর থেকে আস তখন আমি অনেক খুশি হই। আমার আশ পাশের কবরবাসিরা খুশি হয়। তারা আমাকে ডেকে বলেন হে রাহিবা, তোমার ছেলে আসতেছে।
(মিনহাজুল কাসিদিন ৫৭৯)

এক আল্লাহর ওলীর ঘটনা

আনাছ বিন মনছুর (রাহ:) বলেন এক ব্যক্তি জানাযায় অংশগ্রহন করে নামাজ পড়ত। যখন সন্ধ্যা হয়ে যেত তখন কবরস্থানের গেইটে দাড়িয়ে বলত। আল্লাহ তোমাদের দু:খ-কষ্ঠ দুর করুন। আল্লাহ তোমাদের অসহায়ত্বের প্রতি দয়া করুন। তোমাদের ভুলগুলো মাফ করে দিন। নেকিগুলো কবুল করুন। এছাড়া আর কিছু বলত না।
এই ব্যক্তি বলেন একদিন আমি সন্ধ্যা বেলা কবরস্থানে যাইনি, দোয়াও করিনি, প্রতিদিন যেভাবে করে থাকি। রাত্রি বেলা ঘুমানোর পর দেখলাম অনেক লোক আমার সামনে জড়ো হল। আমি বললাম তোমরা কারা? কেন এসেছ? তারা বলল আমরা কবরবাসি আপনার হাদিয়া গ্রহনের অভ্যাস আমাদের সৃষ্টি করছেন। আমি বললাম কি হাদিয়া? তারা বলল আপনি যে দোয়া করেন তাই হলো হাদিয়া। আমি বললাম আগামিকাল অবশ্যই দোয়া করব। এরপর থেকে আমি আর কোন দোয়া করা পরিত্যাগ করি নাই।
(মিনহাজুল কাসিদিন)

284

হযরত রাবেয়া বসরী (রাহঃ)

এক ব্যক্তি রাবেয়া বসরীকে শরীরে পাতলা রেশমি কাপড় এবং মাথায় ঘাড় রেশমি উড়না পরিহিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখল। রাবেয়া বসরীকে একখানা কম্বল এবং দুইখানা উড়নার দ্বারা দাফন করা হয়। ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে বলল কম্বল ওয়ালা কাফন কোথায়? রাবেয়া বসরী (রাহঃ) বললেন তা আমার শরীর থেকে খুলে নিয়ে এই কাপড় পরানো হয়েছে। আর কম্বল খানা ভাঁজ করে পেকেট করে ইল্লিয়িনে রাখা হয়েছে। যাতে কিয়ামতে এর বিনিময় আমাকে দেওয়া হয়।

ঐ লোকটি বলল আপনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে দুনিয়াতে আমল করতেন? রাবেয়া বললেন আমর ধারনা মতে আল্লাহর ওলীদের সম্মান এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়।

লোকটি বলল আবাদাহ বিনতে আবী কিলবের অবস্থা কি? রাবেয়া বললেন আল্লাহর কছম সে তো আমাদের থেকে অনেক উঁচু মর্যাদায় আসীন হয়েছে।

লোকটি বলল কেন? মানুষের দৃষ্টিতে তো আপনি সবচেয়ে বেশী ইবাদতকারিনী ছিলেন। রাবেয়া বললেন সে দুনিয়াতে কোন অবস্থায়ও কাউকে ভয় করত না।

লোকটি বলল আবু মালিক এর অবস্থা কি? রাবেয়া বললেন সে যখন চায় তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করে। লোকটি বিশর বিন মানছুরের অবস্থা জিজ্ঞাস করলে রাবেয়া বললেন হায় হায়! তাঁকে আল্লাহ আশাতিত প্রতিদান দিয়েছেন।

লোকটি বলল আল্লাহর নৈকট্য লাভের কোন আমল বলে দিন। রাবেয়া বললেন, অধিক হারে আল্লাহর যিকির কর। এর দ্বারা তোমার কবরের অবস্থা ঈর্ষনীয় হবে। (কিতাবুর রূহ)

বাশশার বিন গালেব (রাহঃ) বলেন আমি রাবেয়া বসরী (রাহঃ) এর জন্য অনেক দোয়া করতাম। একদিন স্বপ্নে তাঁকে দেখলাম তিনি আমাকে বললেন হে বাশশার, তোমার উপহার নুরের পাত্রে রেখে রেশমী রুমাল দ্বারা ডেকে আমার সামনে পেশ করা হয়। আমি বললাম এটা কেমন কথা? রাবেয়া বললেন জীবিত লোকেরা যখন মৃতদের জন্য দোয়া করে আর দোয়া কবুল হয় তখন ঐ দোয়া নুরের পাত্রে রেখে রেশমী রুমাল দ্বারা ডেকে যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করা হয় তার সামনে রাখা হয়। আর বলা হয় অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। (মিনহাজুল কাসিদিন ৫৭৯)

285

হযরত আছেম জাহদারী (রাহঃ)

বর্নিত আছে আছেম জাহদরী রাহ. এর মৃত্যুর দুইবছর পর তাঁর পরিবারের এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন আপনি মারা যান নাই? তিনি বললেন হ্যাঁ। লোকটি বলল তাহলে এখন আপনি কোথায় আছেন? আছেম বললেন খোদার কছম আমি জান্নাতের একটি বাগানের মধ্যে আছি। আমি আর আমার সাথিরা প্রতি শুক্রবার রাতে ও সকালে আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ মাজনি (রাহঃ) এর কাছে গিয়ে তোমাদের খবর নিয়ে থাকি।

লোকটি আছেমকে বললেন তোমাদের শরীর তার সাথে সাক্ষাৎ করে? না শুধু রূহ সাক্ষাৎ করে? আছেম বললেন শরীর গলে পঁচে শেষ হয়ে গেছে। রূহ সমুহ সাক্ষাৎ করে। লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল আমাদের সম্পর্কে তোমরা অবগত হয়ে থাক? আছেম বললেন শুধু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সুর্যোদয় পর্যন্ত তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হই। লোকটি বলল সপ্তাহের অন্য দিনে অবগত হও না কেন? আছেম বললেন শুক্রবারের মহান সম্মান এর কারণন? (মিনহাজুল কাসিদিন)

আমলের গ্রহনযোগ্যতা

হযরত গিছুদরাজ (রাহঃ) বলেন, নেক আমল সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে আর মন্দ আমল আমলকারি সহ অন্যজনকেও অপদস্থ ও বঞ্চিত করে।

একথা সাপেক্ষে তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। এক শহরে এক যাহিদ (দুনিয়া বিমুখ) দরবেশ বসবাস করতেন। স্বপ্নযোগে আল্লাহ তাঁকে অবগত করলেন আমি এই শহরে গজব নাযিল করব। কেহই এই গজব থেকে রক্ষা পাবে না। দরবেশ বললেন কোন প্রকারের গজব নাযিল করবেন? আল্লাহ বললেন আগুন প্রেরন করব, এক ঘর ব্যতিত সকল ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিব। দরবেশ বললেন আমার অবস্থা কি হবে? জবাব আসল তোমাকেও জ্বালিয়ে দিব। হ্যাঁ যদি তুমি ঐ ব্যভিচারিনীর ঘরে আশ্রয় নাও তাহলে তার উছিলায় তুমি বেঁচে যাবে।

সকাল বেলা দরবেশ ঘুম থেকে জায়নামাজ কাধে নিয়ে ঐ ব্যভিচারিনীর ঘরে গেলেন। ব্যভিচারিনী দরবেশকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল আপনি এখানে কিভাবে আসলেন? তুমি কি জান প্রতিদিন কোন প্রকারের লোক এখানে আসে?

286

আর কি কি মন্দ কাজ করে? দরবেশ বললেন আমি কিছু দিন তোমার ঘরে আশ্রয় নেওয়ার জন্য এসেছি। ঘরের একটি পার্শ্ব আমাকে দিয়ে দাও। আমি এখানে বসে আল্লাহ আল্লাহ করব।

ব্যভিচারিনী ঘরের এক পার্শ্বে দরবেশকে থাকার জন্য দিলেন। দরবেশ সেখানে বসে ইবাদত বন্দেগী করতে লাগলেন। কিছু দিন পর শহরে আগুন লাগল, সবকিছু জ্বলে ভস্ম হয়ে গেল, কিন্তু এই মহিলার ঘর অক্ষত রইল।

আগুন শেষ হওয়ার পর দরবেশ নিজ ঘরে চলে আসলেন। আল্লাহকে বললেন হে আল্লাহ, এখানে কি রহস্য আমাকে বলে দাও। সকল বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলেন আর ঐ ব্যভিচারিনীর ঘরকে অক্ষত রাখলেন। তার উছিলায় আমকে হেফাজত করলেন।

আল্লাহ বললেন আমার একটি কুকুর ক্ষুধার্ত হয়ে পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে পাড়ায় পাড়ায় চক্কর দিচ্ছিল। কেহই তাকে এক ফোটা পানিও দেয়নি। ঘরের ছায়ায়ও বসতে দেয়নি। সে যেখানেই গেছে লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঐ ব্যভিচারিনীর ঘরে যাওয়ার পর সে তাকে তার ঘরের ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছে রুটি খাইয়েছে, পানি পান করিয়েছে। এই কুকুরের কারণে ঐ ব্যভিচারিনীকে এই মুসিবত থেকে রক্ষা করেছি। আর ঐ কাজের শাস্তি স্বরুপ সমস্ত শহর জ্বালিয়ে বিরান বানিয়ে দিয়েছি। আর তোমাকে ঐ ব্যভিচারিনীর উছিলায় রক্ষা করেছি। (মালফুজাতে গিছুদরাজ ৪২৫)

একটি চিৎকার দিলেন এবং জান দিয়ে দিলেন

একটি বাদি

হযরত আতা (রাহ:) বলেন একদিন আমি বাজারে গেলাম, সেখানে একটি দাসী বিক্রয় হচ্ছে। যাকে পাগল বলা হচ্ছে। আমি সাত দিরহাম দ্বারা এটাকে ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে আসলাম।

রাতের কিছু অংশ অতিক্রম হওয়ার পর আমি দেখলাম ঐ দাসী বিছানা থেকে উঠে ওজু করে নামাজ শুরু করে দিল। তার নামাজের অবস্থা ছিল এমন যে, নামাজে কেঁদে কেঁদে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হত। নামাজের পর সে দোয়াতে বলল, হে প্রভু আপনি যে আমাকে ভালোবাসেন এর কছম দিয়ে বলছি আমার প্রতি দয়া কর। আমি এটা শুনে বললাম এরূপ বল না বরং এভাবে বল হে প্রভু, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি তার কছম দিয়ে বলছি। আমার কথা শুনে দাসী রাগান্বিত হয়ে বলল ঐ সত্তার কছম, যদি তিনি আমাকে ভাল না বসতেন তাহলে মিষ্টঘুম থেকে আমাকে জাগ্রত করে নামাজে দাড় করাতেন না। একথা বলে দাসী উপুড় হয়ে পড়ে কয়েকটি কবিতা পড়ল। যার মর্মার্থ হলো অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল, অন্তর দগ্ধ হচ্ছিল, ধৈর্য্য চলে যাচ্ছিল, অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। ঐ ব্যক্তি কিভাবে আনন্দ লাভ করবে যে প্রেম আসক্ততার সাথে শিকলবদ্ধ নয়। হায় আল্লাহ আনন্দের কোন জিনিস দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। অতপর উচ্চ আওয়াজে দোয়া করল হে আল্লাহ, এতদিন আমার আর আপনার মোয়ামালাহ গোপনে ছিল। এখন মাখলুক জেনে গেছে এবার আমাকে উঠিয়ে নাও। এ কথা বলে চিৎকার দিয়ে মারা যায়। (ফাজায়েলে নামাজ ৬৯)

288

আবু আমির (রাহ:) বলেন আমি স্বল্প মুল্যে একটি বাদী বিক্রয় হতে দেখলাম। যে অত্যন্ত দুর্বল-শীর্ণ। তার পেটকে কমরের সাথে লেগে গেছে, চুল এলোমেলো। আমি তার প্রতি দয়াদ্র হয়ে ক্রয় করে নিলাম। তাকে বললাম আমার সাথে বাজারে চল, রমজান মাসের জন্য কিছু জিনিস ক্রয় করব। দাসীটি তখন বলতে লাগল আল্লাহর শোকর যিনি আমার জন্য সারা মাস এক রকম করে দিয়েছেন। ঐ দাসী সর্বদা দিনে রোযা রাখত এবং সারা রাত নামাজ পড়ত।

ঈদের সময় যখন নিকটবর্তি হল আমি তাকে বললাম, আগামীকাল সকালে আমি বাজারে যাব তুমিও আমার সাথে যেতে হবে। ঈদের জন্য প্রয়োজনীয় সওদা ক্রয় করব। দাসী বলল হে আমার মুনিব। তুমি দুনিয়া নিয়ে অনেক ব্যস্ত। একথা বলে নিজ রূমে প্রবেশ করে নামাজে রত হয়ে গেল। প্রশান্ত চিত্তে একটি একটি করে আয়াত পড়ছিল। যখন وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ পর্যন্ত পৌঁছল তখন এ আয়াত বারবার পড়ছিল। এক পর্যায়ে চিৎকার করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। (ফাজায়েলে নামাজ ৭১)

এক বুজুর্গের ঘটনা

এক বুজুর্গ মরনকালে স্বীয় খাদেমকে বললেন আমার উভয় হাত বেধে আমার চেহারা জমিনের দিকে করে রাখ। অতপর বুজুর্গ বলতে লাগলেন। যাত্রার সময় হয়ে গেছে কিন্তু আমি গুণাহ থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহর সামনে পেশ করার মতো কোন ওজরও আমার নাই। সাহায্য চাওয়ার মত শক্তিও নাই। অতএব আমার জন্য তুমিই যথেষ্ট।

একথা বলতে বলতে একটি চিৎকার করেই মারা যান। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল এই বান্দা নিজের অক্ষমতা আমার সামনে পেশ করেছে, আমি তা কবুল করে নিয়েছি। (ফাজায়েলে নামাজ ৪৮২)

হযরত জুরারাহ বিন আওফা (রা:)

বাহয বিন হাকিম রাহ., ইতাব বিন মুছান্না (রাহ:) এর সুত্রে বর্ণনা করেন, হযরত জারারাহ বিন আউফা (রা:) বসরার বিচারক থাকাকালে বনু কুশাইর গোত্রে ইমামতি করতেন।

289

এক সকালে নামাজ পড়তে ছিলেন। যখন তেলাওয়াত করতে করতে فَاِذَا نُقِرَ فِىْ النَّاقُوْرِ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ (যে দিন শিঙ্গায় ফু দেওয়া হবে যে দিন অত্যন্ত ভয়ংকর হবে) এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন, সাথে সাথে পড়ে যান আর রূহ পিঞ্জিরা থেকে বের হয়ে যায়।

রাবী বলেন, তাঁর লাশ উঠিয়ে ঘর পর্যন্ত যারা পৌঁছে দিয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। (জামে তিরমিযি ১/৫৯)

সালেহ বাররাদ (রাহ:) বলেন আমি জারারাহ বিন আউফা (রা:) কে স্বপ্নযোগে দেখে বললাম আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। আমাকে বলুন আল্লাহ আপনাকে কি জিজ্ঞাস করেছিলেন? আর আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন? তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি তাকে আবার বললাম আল্লাহ আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন? তখন তিনি বললেন আল্লাহ নিজ দয়াগুণে আমাকে মাফ করেছেন। আমি বললাম আবুল আলা বিন ইয়াযিদ মাতরাফ (রাহ:) এর ভাইয়ের সাথে কেমন আচরন হয়েছে? জারারাহ বললেন তিনি উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়ে আছেন। আমি বললাম কোন আমল আপনার কাছে উত্তম? তিনি বললেন তাওয়াক্কুল এবং স্বল্প আশা। (কিতাবুর রূহ)

একজন বেদুইন

আসমায়ী (রাহ:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি বসরার জামে মসজিদ থেকে আসছিলাম। পথে এক বেদুইনের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে অত্যন্ত দুর্বল শীর্ণ একটি উটে আরোহিত অবস্থায় ছিল। গলায় তরবারি ঝুলানো, হাতে কামান।

আমার কাছে পৌঁছার পর সালাম দিয়ে বলল তুমি কোন লোকদের অন্তর্ভুক্ত? আমি বললাম আসমায়ী গোত্রের। সে বলল তুমি কি আসমায়ী? আমি বললাম হ্যাঁ। সে বলল কোথা থেকে আসতেছ? আমি বললাম যেখানে আল্লাহর কুরআন তেলাওয়াত হয় সেখান থেকে। সে বলল আমাকে কিছু তেলাওয়াত করে শুনাও।

আমি বললাম আরোহনের জন্তু থেকে নেমে আস। সে নেমে আসার পর আমি সুরা যারিয়াত পড়তে শুরু করলাম। যখন আমি তেলাওয়াত করে

290

وَفِىْ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَاتُوْعَدُوْنَ (অর্থাৎ তোমাদের রিযিক এবং যা কিছুর ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা আসমানে) এ পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন সে বলল হে আসমায়ী এটা আল্লাহর কালাম ? আমি বললাম ঐ সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মদ (সা:) কে সত্য নবী বানিয়ে প্রেরন করেছেন, এটা তারই কথা, যা তার নবীর উপর অবতির্ণ করেছেন। বেদুইন তখন বলল থাম। একথা বলে সে তার উট যবাই করল। চামড়া সহ টুকরা টুকরা করে আমাকে বলল উহা বন্টনে আমাকে সহযোগিতা কর।

আমরা উভয়জন ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারি লোকদের মধ্যে এগুলো বন্টন করে দিলাম। অতপর বেদুইন তার তলোয়ার এবং কামান ভেঙ্গে মাটির নিচে পুতে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হল। আর বলতে লাগল

وَفِىْ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَاتُوْعَدُوْنَ তখন আমি আমার নিজের আত্মাকে তিরস্কার করলাম। যেই আয়াত এই ব্যক্তিকে সজাগ করল সেই আয়াত তোমাকে করল না কেন ?

আসমায়ী বলেন যখন আমি হারুনুর রশিদের সাথে হজ্বে গেলাম, তখন কাবা শরীফ তওয়াফ কালে একজন ব্যক্তি নম্রস্বরে আমাকে ডাকল। আমি পিছন দিকে ফিরে দেখি ঐ বেদুইন ব্যক্তি। সে একেবারেই দুর্বল ও হলদে বর্ণ হয়ে গেছে। সে আমাকে সালাম করে হাতে ধরে নিয়ে মাকামে ইবরাহিম এর পিছনে বসিয়ে বলল। আল্লাহর কালাম কিছু তেলাওয়াত কর। আমি আবার সুরা যারিয়াত তিলাওয়াত করলাম। যখন وَفِىْ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَاتُوْعَدُوْنَ পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন ঐ বেদুইন চিৎকার করে বলল আমার রব সত্য বলেছেন। অতপর বলল আর কি কিছু আছে, আমি বললাম একটু অগ্রসর হয়ে আল্লাহ বলেছেন فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ- اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ অর্থাৎ কছম আসমান ও জমিনের রবের নিশ্চয় উহা সত্য। যেমন ভাবে তোমরা পরস্পর কথা বল।

এই আয়াত শুনেই সে চিৎকার করে বলল, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহকে কে রাগান্বিত করল? এমনকি তিনি কছম করলেন। লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে না। একথা তিন বার বলে সে মারা গেল।

(নুজহাতুল বাসাতিন ৩৫৭-৩৫৮)

দুই যুবকের ঘটনা

বর্ণিত আছে এক যুবক জুনাইদ (রাহ:) এর সাহচর্যে থাকত। যখন সে যিকির শুনত সাথে সাথে চিৎকার করত। একদিন জুনাইদ (রাহ:) বলালেন তুমি যদি এরূপ কর তাহলে আমার সামনে আর আসবে না। এর পর থেকে যখন সে কিছু শুনত তখন তার রং পাল্টে যেত। কিন্তু এটা সে এমনকি শরীরের লোম থেকে রক্ত টপকে পড়ত। একদিন চৎকার করল আর এ অবস্থায় রূহ চলে যায়।

শায়খ আলি রুদবারী (রাহ:) বলেন। বাড়িতে আমার যাওয়া হল, সেখানে আমি এক সুদর্শন যুবক কে মৃত দেখলাম। তার চারপাশে লোক বসে আছে। আমি তার অবস্থা জিজ্ঞাস করলাম। লোকেরা বলল এই ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এই বাড়িতে একজন দাসী এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করছিল

كَبُرَتْ هِمَّةُ عَبْدٍ* طَمَعَتْ فِىْ اَنْ تَرَاكَ

اَوْمَا حَسْبُ بِعَيْنٍ* اَنْ رَاى مَا قَدْرَاكَ

অনুবাদ: বড় সাহস ঐ বান্দার যে তোমাকে দেখার লোভ রাখে, চোখের জন্য কি যথেষ্ট নয় তোমাকে দর্শনকারিকে দেখে নেয়া? এটা শুনেই সে একটা চিৎকার করে প্রান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করল।

(নুজহাতুল বাসাতিন ১/২৭৫)

আল্লাহকে ভয়কারি এক যুবকের ঘটনা

মানছুর বিন আম্মার (রাহ:) বলেন, একদিন এক যুবককে খোদা ভীতুদের ন্যায় নামাজ পড়তে দেখলাম। আমার মনে হলো হয়তো সে আল্লাহর কোন ওলী হবে। আমি লোকটাকে দেখতে থাকলাম। এক পর্যায়ে সে নামাজ শেষ করার পর আমি তাকে সালাম করলাম। সে জবাব দিল।

আমি তাকে বললাম তুমি কি জান না জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম লাজা (لظى)। যা চামড়াকে উঠিয়ে দেয়। এই জাহান্নামে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হবে যে সত্য বিমুখ হয়ে যায়, সম্পদ জমা করে থাকে। এগুলো সংরক্ষণ করে। এই কথাগুলো যুবক শুনামাত্রই চিৎকার করে বেহুশ হয়ে যায়।

যখন হুশ ফিরে আসল তখন বলল আরো কিছু শুনাও। আমি এই আয়াত শুনালাম

292

يَا اَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَاالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَاأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ

হে ঈমানদাররা তোমরা নিজেকে এবং পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। সে জাহান্নামে অত্যান্ত কঠোর স্বভাবের ফেরেস্তারা নিয়োজিত আছেন। তারা আল্লাহর নাফরমানি করেন না। আল্লাহ যে হুকুম দেন তা তারা পালন করেন। একথা শুনে লোকটি পড়ে গিয়ে মারা যায়।

আমি তাঁর বুক খুলে দেখলাম কুদরতের কলম দ্বারা লিখা

فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

অর্থাৎ সে সাচ্ছন্দ্য জিবনে থাকবে, উচ্চ জান্নাতে, যার ফল নিকটে।

মারা যাবার ৩য় রাতে আমি স্বপ্নে তাকে উজ্জল সিংহাসনে বসা দেখলাম। তার মাথায় রয়েছে মুকুট। আমি বললাম আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? সে বলল আমাকে ক্ষমা করেছেন। আহলে বদরের প্রতিদান আমাকে দান করেছেন। বরং আরো বেশী দিয়েছেন। আমি বললাম বেশী কেন? সে বলল বদরী সাহাবীগন তলওয়ার দ্বারা শহিদ হয়েছেন আর আমি আল্লাহর কুরআন দ্বারা শহিদ হয়েছি। (নুজহাতুল বাসাতিন)

খোদাভীতু এক যুবতির ঘটনা

হযরত যুন্নুন মিসরী (রাহ:) বলেন আমার কতিপয় বন্ধু বলেছেন, কুহে মাকতামে অধিক ইবাদত কারিনী এক যুবতি ছিল। এটা শুনে তার সাক্ষাতে আমি উদগ্রিব হয়ে পড়লাম। আমি সেখানে গিয়ে তাকে খুজে পেলাম না, তবে আবেদ জাহিদদের দলভুক্ত এক ব্যক্তিকে পেলাম। তাকে ঐ যুবতির কথা জিজ্ঞাস করলাম। সে বলল তুমি বুদ্ধিমান কে জিজ্ঞাস না করে পাগলকে জিজ্ঞাস করছ? আমি বললাম আমাকে বল ঐ আল্লাহ পাগল যুবতি কোথায়? লোকটি বলল অমুক জঙ্গলে আছে।

আমি তার দেওয়া ঠিকানামত সেই স্থানে গেলাম। সেখানে পৌঁছেই দুর থেকে বেদনাময়ী একটা আওয়াজ শুনতে থাকলাম। আমি ঐ আওয়াজের পিছনে পিছনে গেলাম। কিছু দুর যাওয়ার পর এক যুবতিকে বিশাল আকৃতির একটি পাথরের উপর বসা দেখলাম। আমি সালাম দিলাম সে সালামের জবাব দিয়ে

293

বলল হে যুন্নুন, পাগলদের সাথে তোমার কাজ কি? আমি বললাম তুমি পাগল নাকি? সে বলল পাগল না হলে মানুষ পাগল বলে কেন?

আমি বললাম কোন জিনিস তোমাকে পাগল বানিয়েছে? সে বলল উনার ভালোবাসা আমাকে পাগল বানিয়েছে এবং তার প্রতি আকাংঙা পেরেশান করে দিয়েছে। তার অনুসন্ধান দু:খ যাতনায় ফেলে দিয়েছে। কেননা মহব্বত আত্মায় (قلب) হয়ে থাকে আর আকাঙ্ক্ষা হয় (فواد) হৃদয়ে, আর অনুসন্ধান করা এটা মাথার কাজ।

আমি বললাম হে মেয়ে! আত্মা এবং হৃদয়ে কি ভিন্ন জিনিস? যুবতি বলল হ্যাঁ, فوادবলা হয় কলবের নুরকে আর سِرْ বলা হয় فواد এর নুরকে। অতএব কলব করে মুহাব্বাত আর فواد উদগ্রিব হয়ে سر অর্জন করে। আমি বললাম কি অর্জন করে? যুবতি বলল সত্যকে অর্জন করে। আমি বললাম সত্য কিভাবে পাওয়া যায়? যুবতি বলল হে যুন্নুন, পাওয়া কোন আকৃতি ছাড়াই হয়ে থাকে, আমি বললাম তুমি যে সত্যকে পেয়েছ তার কি কোন প্রমান আছে?

একথা শুনে সে কাঁদতে শুরু করল। এমন ভাবে কান্না করতে লাগল যে প্রান বাহির হওয়ার উপক্রম হলো। যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসল তখন উচ্চস্বরে হায় হায় বলে আওয়াজ করতে থাকল। অতপর দরদি কণ্ঠে কয়েকটি কবিতা আবৃতি করল। তারপর বলল দেখো সত্যবাদিরা এভাবে দুনিয়া থেকে যায়। সে আবার বেহুশ হয়ে গেল। আমি কাছে গিয়ে নাড়া চাড়া করে দেখলাম সে মারা গেছে। আমি তাকে কবর দেওয়ার জন্য গর্ত খননের হাতিয়ার তালাশ করতে দেখি সে আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। (নুজহাতুল বাসাতিন ৭৮)

হযরত শায়বান মুসাব (রাহ:)

হযরত যুন্নুন মিসরী (রাহ:) বলেন, লেবননের পাহাড়ের একটি গুহায় এক বুজুর্গকে দেখলাম। তাঁর চুল দাড়ি সম্পুর্ণ সাদা। মাথার চুল ধুলোয় ধুসরিত অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ দেহ। আমি তাঁকে নামাজরত পেলাম। সালাম ফেরানের পর আমি তাকে সালাম দিলাম তিনি সালামের জবাব দিলেন। তারপর আবার নামাজের নিয়ত বেধে ফেললেন। আছর পর্যন্ত এভাবে নামাজরত থাকলেন। অতপর একটি পাথরের উপর বসে سُبْحَانَ الله পড়তে লাগলেন। আমার সংগে কোন কথা বার্তা করলেন না।

294

আমি নিজেই কথা বলতে শুরু করলাম। বললাম আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, বুজুর্গ দোয়া করলেন আল্লাহ আপনাকে তার নৈকট্যতা দ্বারা ধন্য করুক। আমি বললাম আরো কিছু বলুন। বুজুর্গ বললেন বেটা যাকে আল্লাহ তার নৈকট্য দ্বারা ধন্য করেন তাকে চারটি বৈশিষ্ট দান করেন। ১. উচ্চ বংশের না হওয়া সত্ত্বেও মহা সম্মান দান করেন। ২. তলব ছাড়া ইলম দান করেন। ৩. সম্পদ ছাড়া ধনি বানিয়ে দেন। ৪. দল ছাড়া শক্তিমান করেন। একথা বলে জোরে চিৎকার করে বেহুশ হয়ে পড়েন। তিন দিন পর হুশ আসল। তারপর ওজু করে আমাকে জিজ্ঞাস করে নামাজের কাযা আদায় করেন। তারপর সালাম দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকেন।
আমি বললাম আমি তিন দিন যাবত এখানে অবস্থান করলাম এই আশায় যে, আপনি কোন নসিহত করবেন। একথা বলতেই আমার কান্না এসেগেল। বুজুর্গ তখন বললেন আপনি আপনার মাওলার সাথে বন্ধত্ব রাখুন। এর বিনিময় স্বরূপ কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা কর না। কারণ আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব যে রাখে সে সকল বান্দাদের সর্দার। এবং আল্লাহর কাছে সম্মানি ও প্রিয় হয়ে থাকে। একথা বলে একটি চিৎকার করে মারা যান। (নুজহাতুল বাসাতিন ৮৩)

হযরত আবু জাহিজ (রাহঃ)

হযরত ছালেহ মুররী (রাহঃ) বলেন একদিন আমি হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসিয়, হাবীবে আজমী, মালেক ইবনে দিনার, ছাবেত বুনানী (রাহঃ) গংদের সাথে হযরত আবু জাহিজ (রাহঃ) এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছায় রওয়ানা হলাম। তিনি অন্ধ ছিলেন, শহর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। তার জন্য একটি মসজিদ বানানো হয়েছিল, সেখানে তিনি ইবাদত করতেন। আমরা সবাই তার অবস্থান স্থলে আকস্মিক গিয়ে হাজির হলাম।
তার ঘরে পৌঁছার আগে এক সবুজ শ্যামল জায়গা দেখে ছাবিত বুনানী বললেন চল, এখানে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নেই তাহলে এ জায়গা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আমাদের পক্ষে সাক্ষি প্রদান করবে। আমরা এখানে দুই রাকাত নামাজ পড়ে তাঁর ঘরে পৌঁছলাম। তাঁকে আগমনের সংবাদ দেওয়াটা সমিচিন মনে করলাম না তাই বাহিরে বসে রইলাম।

295

যখন জুহরের সময় হল তখন তিনি ঘর থেকে বের হলেন আযান ও ইকামত দিয়ে নামাজ পড়া শুরু করলেন আমরাও তার সাথে নামাজ পড়লাম। নামাজের পর মুহাম্মদ বিন ওয়াসিয় দাড়িয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। আবু জাহিজ বললেন তুমি কে? মুহাম্মদ বিন ওয়াসিয় বললেন আপনার ভাই। আবু জাহিজ বললেন তুমি ঐ লোক যার ব্যাপারে শুনা যায় বসরার মধ্যে সব চেয়ে উত্তম নামাজি? মুহাম্মদ বিন ওয়াসিয় তখন নিশ্চুপ থাকলেন।

তারপর ছাবিত বুনানী তার সাথে মিলিত হলেন। তাকে বললেন তুমি কে? ছাবিত বুনানী বললেন আমি ছাবিত বুনানী। আবু জাহিজ বললেন তুমি তো সেই লোক যার ব্যাপারে শুনা যায় বসরার সবচেয়ে বেশী নামাজ আদায়কারি। তিনিও তখন নিশ্চুপ রইলেন।

অতপর মালেক ইবনে দিনার মিলিত হলেন। আবু জাহিজ বললেন তুমি কে? মালেক বললেন আমি মালেক ইবনে দিনার। আবু জাহিজ বললেন তুমি তো সেই লোক যার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে বসরার সবচেয়ে বড় জাহেদ (দরবেশ)।

৪র্থ নম্বারে মিলিত হলেন হাবীবে আজমী। তাকেও বললেন তুমি কে? তিনি বললেন আমি হাবীবে আজমী। আবু জাহিজ বললেন তুমি তো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, তুমি এমন ব্যক্তি যার দোয়া কবুল হয়। হাবীবে আজমী একথা শুনে নিরব রইলেন।

সর্বশেষে আমি ছালেহ মুররী সাক্ষাৎ করলাম। আবু জাহিজ বললেন তুমি তো সেই যার ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে বসরার সবচেয়ে ভালো কণ্ঠের অধিকারি, অতপর আবু জাহিজ আমাকে বললেন তোমার তেলাওয়াত শুনার জন্য বহুদিন থেকে অপেক্ষায় আছি। আস পাঁচ আয়াত তেলাওয়াত কর। ছালেহ বলেন আমি يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ থেকে পড়া শুরু করলাম, যখন هَبَاءً مَّنْثُوْرًا পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন আবু জাহিজ চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুশ আসল তখন ঐ আয়াত আবার পড়তে বললেন। আমি আবার পড়লাম, তিনি ২য় চিৎকার করলেন আর সাথে সাথে মারা গেলেন।

ইত্যবসরে তাঁর স্ত্রী বের হয়ে আমাদেরকে বললেন তোমরা কারা? আমরা তখন আমাদের পরিচয় দিলাম, তিনি (স্ত্রী) আমাদের পরিচয় শুনে

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়লেন, আর বললেন আবু জাহিজ কি মারা গেছেন ? আমরা বললাম হ্যাঁ আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি

বুঝলেন কিভাবে তিনি যে মারা গেছেন ? স্ত্রী বললেন আমি অধিকাংশ সময় আবু জাহিজকে এই দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ আমার মরনের সময় আপনার ওলীদের একত্রিত করে কাছে রেখ। আপনাদের একত্রিত হওয়ায় আমি বুঝে ফেলেছি তিনি মারা গেছেন। ছালেহ বলেন তারপর আমি তাঁকে গোসল দিলাম। কাফন পড়িয়ে জানাযা পড়ে দাফন করলাম।
(নুজহাতুল বাসাতিন ৩৮০)

লায়লা মজনুর ঘটনা

গিছুদরাজ রাহ. আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন, লায়লার জানালার নিচে একটি পাথর ছিল। মজনু প্রতিদিন এ স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় পাথরে শুয়ে জানালার দিকে মুখ দিয়ে লায়লিকে দেখতে নিমগ্ন হয়ে থাকত।
লায়লার প্রহরিরা লায়লাকে বলল এই পাগল প্রতিদিন এখানে এসে জানালা দিয়ে তোমাকে দেখে। এমন এক কৌশল করা প্রয়োজন যাতে মজনু এখানে এসে না বসে। একদিন সকল প্রহরিরা লাকড়ি জমা করে পাথরের উপর রেখে আগুন ধরিয়ে দিল। ফলে পাথর আগুনের মত হয়ে গেল।
মজনু প্রতিদিনের ন্যায় এই দিনও এসে পাথরে বসে শুয়ে শুয়ে জানালার দিকে চেয়ে লায়লিকে দেখতে নিমগ্ন হয়ে গেল। এ দিকে তার শরীর পাথরের গরমে ঝলসে যাচ্ছে। সে এটা অনুভব করতে পারতেছে না। মজনুর শরীরের অবস্থা দেখে তার প্রহরিদের দয়া এসে গেল। তারা এসে তাকে বলল আরে পাগল জ্বলে যাচ্ছ। এখানে কি কর?
তখন মজনু অন্তরের দিকে ইশারা করে বলল, শরীর তো নয় বরং অন্তর জ্বলছিল। প্রেমের আগুনে আমার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। সেখানে শরীরের জ্বালা বুঝবো কিভাবে? এই কহিনী বর্ণনা করে গিছুদরাজ (রাহঃ) বলেন সুলুকের কিতাবে লিখা আছে যে,

اِنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ الْقُلُوْبَ قَبْلَ الْاَجْسَادِ هَكَذَا بِأُلُوْفِ سَنَةٍ وَجَعَلَ فِيْهَا نَارَ مَحَبَّةٍ
فَاَخْرَجَ مِنْهَا شِرَارَ نَارِ الْمَحَبَّةِ فَخَلَقَ مِنْهَا سَبْعَةً دَرَكَاتِ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা শরীর সৃষ্টির কয়েক হাজার বছর আগে অন্তর সমুহ সৃষ্টি করেছেন। আর তার মধ্যে নিজের ইশকের আগুন রেখে দিয়েছেন। এই আগুনের এক ফুলকি বাহিরে আসল। যার দ্বারা সাত স্তরের জাহান্নাম সৃষ্টি হল।

297

এই জন্য ইশকের আগুন জ্বলে উঠলে দুনিয়ার আগুনের জ্বালার খবর থাকে না। এটার অনুভতি হাছিল হয় না। এ ব্যাপারে মুতানাব্বী বলেন

فَفِیْ قَلْبِ الْمُحِبِّ نَارُ هَوى* اَحَرُّ نَارُ جَهَنَّمَ بَرْدَهَا

প্রেমিকের অন্তরে প্রেমের যে আগুন থাকে জাহান্নামের আগুনও এর থেকে ঠান্ডা। (মালফুজাতে খাজাগিছু দরাজ ৪২৪)

মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে অবস্থা জিজ্ঞাস করা যে কী অতিবাহিত হয়েছে

জীবিত ও মৃত্যুদের রূহের সাক্ষাত

জীবিত ও মৃতদের রূহ সমুহের সাক্ষাত হয়। এর সাপেক্ষে বহু প্রমানাদী রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা এ ব্যাপারে বড় সাক্ষি। জীবিত ও মৃতদের রূহ সমুহ পরস্পর এভাবে সাক্ষাৎ করে যেভাবে জীবিতরা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে। কুরআনে করীমে আল্লাহ বলেন اللهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا আল্লাহ মৃত্যুকালে রূহসমুহ হরণ করেন। আর ঘুমের সময় ঐ সকল রূহ সমূহ কব্জা করেন যেগুলি এখনো মরে নাই। অতপর যার ব্যাপারে মৃত্যুর ফয়ছালা হয়ে যায় তার রূহ আটকে দেন। অপরাপর রূহ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছেড়ে দেন।
(সুরা জুমার আয়াত ৪২)

ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, ঘুমের মধ্যে জীবিত ও মৃতদের রূহের সাক্ষাত হয়। অতপর আল্লাহ তা'য়ালা জীবিতদের রূহ ছেড়ে দেন আর মৃতদের রূহ আটক করে রাখেন।

ইমাম সুদ্দি (রাহ:) বলেন আল্লাহ তায়ালা ঘুমের অবস্থায়ও রূহ সমুহকে কব্জা করে নেন। জীবিত ও মৃতদের রূহসমুহ মিলিত হয়ে একে অপরকে পরিচয় করে। আলাপ আলোচনা করে। অতপর জীবিতদের রূহ তাদের শরীরে প্রবেশ করে দুনিয়াতে ফিরে আসে। কিন্তু মৃতদের রূহ নিজ নিজ শরীরে প্রবেশ করতে চাইলে আটকে দেওয়া হয়।

299

সুরা জুমারের আয়াতের আরেকটি মর্ম হলো, যে মারা যায় তার রূহ আটকে দেওয়া হয়। আর যে জীবিত তার রূহকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্য মর্ম হল, আটকে দেওয়া রূহ ছেড়ে দেওয়া রূহ। উভয়টি জীবিতদের রূহ হয়ে থাকে অতপর যার মৃত্যু অবধারিত হয় তার রূহ আটকে দেওয়া হয়। কিয়ামতের পুর্ব পর্যন্ত আর শরীরে প্রবেশ করে না। যার মৃত্যু অবধারিত নয় নির্দিষ্ঠ সময়ের জন্য আবার রূহ শরীরে প্রবেশ করে।

শায়খুল ইসলাম এই মর্মকে পছন্দ করেছেন। আর বলেছেন কুরআন হাদীস এই মর্মকে সমর্থন করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা যে সকল রূহসমুহকে ঘুমের হালতে মৃত্যু দেন, এই সকল রূহসমুহের মধ্য থেকে যে গুলোর উপর মৃত্যুর ফয়ছালা করেন সেগুলো আটকে রাখার হুকুম দেন। আর যে সকল রূহগুলোকে মৃত্যুকালে কব্জা করা হবে এ সকল রূহকে না ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়। না আটকে রাখার হুকুম করা হয়। বরং এগুলো ৩য় আরেক প্রকার রূহ।

তবে প্রথম মর্মটাই অধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কারণ আয়াতে দুইটি মৃত্যু উল্লেখ করা হয়েছে, ১. বড় মৃত্যু তথা মৃত্যু ২. ছোট মৃত্যু তথা ঘুম। আর রূহেরও দুইটি প্রকার বর্ণনা করেছেন ১. ঐ সকল রূহ যেগুলোর উপর মৃত্যুর হুকুম অবধারিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দেন এবং মৃত্যু দান করেন। ২. আরেক প্রকার ঐ সকল রূহ যার সময় এখনো বাকি আছে। তার নির্দিষ্ট মেয়াদ পুরনের জন্য শরীরে ফিরিয়ে দেন। আর আল্লাহ উল্লেখিত মৃতদের দুই হুকুম (আটকে দেওয়া, ছেড়ে দেওয়া) বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন জীবিত রূহ হল যাকে ঘুমন্ত মৃত্যু দেওয়া হয়েছে।

যদি মৃত্যুর প্রকার শুধু দুইটি হয় ১. মৃত্যুকালীন মরন ২. ঘুমের মরণ, তাহলে وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا বলার প্রয়োজন ছিল না। কেননা তা কব্জা করার সময়ই মারা যায়। অথচ আল্লাহ বলেন সে মরে নাই।

তাহলে আবার فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهِاالْمَوْتَ কিভাবে সঠিক হলো? উত্তর প্রদানকারিরা উত্তর এভাবে দেন যে, ঘুমের মৃত্যুর পর আল্লাহ মৃত্যুর ফয়ছালা করেন। সঠিক কথা হলো, আয়াত মৃত্যুর উভয় প্রকারকে অন্তর্ভূক্তকারি। কেননা আয়াতে দুই মৃত্যুর বর্ণনা হয়েছে (মৃত্যুকালীন মরন, ঘুমের মরণ)। অতপর মরে যাওয়া রূহকে আটকে দেওয়া এবং অন্য রূহকে ফিরিয়ে দেওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। আর এ কথা তো স্পষ্ট আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক

300

মৃত্যুবরনকারির রূহ আটকে দেন। চাই সে ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যাক বা জাগ্রত অবস্থায় মারা যাক।

জীবিত ও মৃতদের রূহ সমুহের সাক্ষাতের এটা একটা প্রমান যে, জীবিতগন স্বপ্নে মৃতদের দেখেন। তাদেরকে অবস্থা জিজ্ঞাস করেন। মৃতরা অনেক অজানা অবস্থা বলে দেন যা ভবিষ্যতে হুবহু ফলে যায়। কখন দেখা যায় এ বিষয় অতিত হয়ে গেছে। কখনও মৃত ব্যক্তি তার ধন ভান্ডারের খবর দেয় যা সে ছাড়া আর কেউ জানত না। কখন ও তার ঋণের কথা বলে। (আমার উপর অমুকের পাওনা আছে) তার প্রমানাদিও বলে দেয়। কখনও এমন কর্মের কথা বলে দেয় যা সে ছাড়া কারো জানা নাই। কখনো এরূপ বলে আমার কাছে অমুক অমুক সময় এসো আর তার সংবাদ সত্য হয়। কখনো এমন সংবাদ দেয় যা জীবিতদের বিশ্বাস হয়ে যায়। তিনি ছাড়া আর কেউ এ সংবাদ জানেন না। যা পিছনে বর্ণিত অনেক ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও সালমান ফারসী (রা:) এর চুক্তি!

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাহ:) বলেন একবার আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও সালমান ফারসীর সাক্ষাত হল। উভয় জন এ বিষয়ে একমত হলেন যে, জীবিত ও মৃতদের রূহ পরস্পর সাক্ষাত করে। আর নেককারদের রূহ জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে আসা যাওয়া করে।

অতপর উভয়জন চুক্তি করলেন তাদের দুইজন থেকে যে আগে মারা যাবে তিনি অন্যজনকে তার অবস্থা জানাবেন। এক পর্যায়ে তাদের একজনের ইন্তেকাল হল। ইন্তেকালের পর যিনি মারা গেছেন তিনি জীবিত ব্যক্তির কাছে স্বপ্নে এসে বললেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে অটল থাক। আমি তাওয়াক্কুলের ন্যায় কোন আমল পাইনি। (কিতাবুর রূহ ৬১-৬৩)

ইমাম শাফেয়ী (রাহ:)

রবী বীন খাছয়াম (রাহ:) বলেন আমি ইমাম শাফেয়ীর ইন্তেকালের কিছু দিন আগে স্বপ্নে দেখলাম আদম (আ:) মারা গেছেন। আর মানুষ জানাযার জন্য বাহির হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমি স্বপ্ন ব্যাখ্যাকার একজনকে এ স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন যিনি এই জামানার সবচেয়ে বড় আলিম তার মৃত্যু হবে। কারণ আদম (আ:) এর বৈশিষ্ট্য হলো وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاِسْمَاءِ كُلَّهَا কিছু দিন পর দেখা গেল ইমাম শাফেয়ী (রাহ:) মারা গেছেন। (জহিরুল আসফিয়া ২০৮)

ইমাম শাফেয়ী (রাহ:) এর ইন্তেকালের পর কেহ তাঁকে স্বপ্নে দেখে ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করল। ইমাম শাফেয়ী বললেন জুমআর রজনিতে পাঠকৃত পাঁচটি দুরুদ শরীফের কারণে ক্ষমা পেয়েছি।

দুরুদ গুলো হলো

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِمَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ
وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ
وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ
وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُصَلّٰى عَلَيْهِ

এই গুলিকে দুরুদে খামছা বলে। (ফাজায়েলে দুরুদ ৯৫-৯৬)

রাফি বিন সুলায়মান (রাহ:) বলেন আমি ইমাম শাফেয়ীকে স্বপ্নে দেখে বললাম আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? শাফেয়ী বললেন আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমার উপর যমরদ, মনি, মুক্তা বর্ষিত করেছেন। আর কিছু দিনারের বিনিময়ে ৭০ হাজার দিনার দিয়েছেন। আর ক্ষমা করেছেন। (জহিরুল আসফিয়া ২০৮)

ইমাম শাফেয়ীর ইন্তেকালের উপর এক ব্যক্তি রাসুল (সা:) কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলেন, হে রাসুল (সা:) ইমাম শাফেয়ী তার কিতাবে দুরুদ লেখেছেন صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ এই দুরূদের বিনিময়ে আপনার পক্ষ থেকে কি দেওয়া হবে?

রাসুল (সা:) বললেন আমার পক্ষ থেকে এটার বদলা হল, তাকে হিসাবের কালে আটকানো হবে না।

ইবনে বান্নান ইস্পাহানী রহ. বলেন আমি রাসুল (সা:) এর সাথে স্বপ্নে সাক্ষাত করলাম। আমি জিজ্ঞাস করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ, ইমাম শাফেয়ী আপনার চাচার সন্তান (চাচার সন্তান এ হিসাবে বলেছেন, রাসুল (সা:) এর দাদা হাশিম পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশ মিলিত হয়। কারণ ইমাম শাফেয়ী আবদে আজীজ ইবনে হাশেমের আওলাদ) আপনি কি তাঁকে বিশেষ কোন সম্মান প্রদান করবেন?

রাসুল (সা:) বললেন হ্যাঁ, আমি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছি যে, কিয়ামতে তাঁর যেন হিসাব না নেন। আমি বললাম এই সম্মান কোন আমলের বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন? রাসুল (সা:) বললেন সে আমার প্রতি এমন শব্দমালা দ্বারা দুরূদ পড়ে যা অন্য কেহ পড়ে না। আমি বললাম এই শব্দমালা কি? রাসুল (সা:) বললেন

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُوْنَ

(ফাজায়েলে দুরূদ)

এক নেককার ব্যক্তির ঘটনা

শায়খ ইবনে হাজার মক্কী (রাহ:) বর্ণনা করেন, একজন নেককার ব্যক্তিকে কেহ স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা জিজ্ঞাস করল। সে বলল আল্লাহ আমার প্রতি রহম করেছেন। আমাকে ক্ষমা করেছেন। জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। লোকটি এর কারণ জিজ্ঞাস করল সে বলল ফেরেস্তারা আমার গুণাহ ও দুরূদ শরীফ গণনা করে দেখলেন ১০০ দুরূদ গুণাহ থেকে বেশি। আল্লাহ তায়ালা বললেন এতটুকুই যথেষ্ট। তার হিসাব কর না তাকে বেহেস্তে নিয়ে যাও।

(ফাজায়েলে দুরূদ ৯৬)

হযরত আবুল আব্বাস আহমদ বিন মানসুর (রাহ:)

আবুল আব্বাস আহমদ বিন মানসুর (রাহ:) যখন ইন্তেকাল করলেন তখন শিরাজ শহরের এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি শিরাজ শহরের জামে মসজিদের মেহরাবে দন্ডয়মান। তার পরনে এক জোড়া জামা, মাথায় মৃকুট রয়েছে। যা জাওহার ও মুতি দ্বারা অলংকৃত।

স্বপ্নে লোকটি তাঁর অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে মাফ করেছেন। অনেক সম্মানিত করেছেন। আমাকে মুকুট দিয়েছেন। এসব রাসুলের প্রতি দুরূদ পাঠের কারণে হয়েছে। (ফাজায়েলে দুরূদ)

দুই গুণাহগারের কাহিনী

সুফিদের একজন বর্ণনা করেন মিসতাহ নামক একজন ব্যক্তি ছিল যে তার জীবনে শুধু গুণা করেছে। দ্বীন দ্বারির ব্যাপারে একেবারে গাফেল ছিল। তার

303

মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা জিজ্ঞাস করলাম। সে বলল আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আমি বললাম কোন আমলের কারণে মাফ করেছেন? সে বলল আমি এক মোহাদ্দিসের সামনে হাদীছ বর্ণনা করছিলাম। উস্তাদ তখন দুরূদ শরীফ পড়ছিলেন। আমিও তাঁর সাথে উচ্চস্বরে দুরুদ পড়লাম। আমার আওয়াজে উপস্থিত লোকেরাও দুরূদ পড়ল। আল্লাহ তায়ালা ঐ সময় মজলিসে অংশ গ্রহনকারি সকলকে মাফ করে দিয়েছেন।

নুজহাতুল মাজালিসে এরুপ একটি ঘটনা উল্লেখ আছে এক বুজুর্গ বলেন আমার এক প্রতিবেশি ছিল। খুবই গোনাহগার ছিল। তাকে বারবার তওবার কথা বললেও তওবা করে নাই। তার মৃত্যুর পর আমি স্বপ্নে তাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। আমি তাকে বললাম এই মর্যাদা কিভাবে লাভ করলে? সে বলল আমি এক মুহাদ্দিসের খেদমতে ছিলাম। তিনি বললেন যে ব্যক্তি রাসুলে উপর উচ্চস্বরে দুরূদ পড়বে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। আমি উচ্চস্বরে দুরূদ পড়লাম। আরো অন্যান্য যারা ছিল তারাও পড়ল। আর এই দুরুদের কারণে সবাইকে মাফ করে দিয়েছেন।

এই ঘটনা রওজুল ফায়িকে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। ছুফীদের একজন বলেন আমার একজন পাপিষ্ট প্রতিবেশি ছিল। সব সময় মদপানে রত থাকত। রাত দিনের কোন খবর ছিল না। তাকে নসিহত করলে শুনত না। আমি তওবা করার কথা বললাম তওবা করে নাই। মৃত্যুবরনের পর আমি স্বপ্নে তাকে জান্নাতি কাপড় পরিধানরত অবস্থায় উচ্চ মর্যাদায় আসিন দেখলাম। বড় সম্মানে আছে। তাকে এই মর্যাদা প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাস করলে পুর্বে বর্ণিত ঘটনা বলল। (ফাজায়েলে দুরূদ ৯৭-৯৮)

হযরত আবু আব্দুল্লাহ বিন হামিদ (রাহ:)

আবু হাসান বাগদাদী (রাহ:) বলেন আবু আব্দুল্লাহ বিন হামিদ মারা যাওয়ার পর কয়েকবার তাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। তার অবস্থা জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন আমাকে আল্লাহ মাফ করেছেন। আমার প্রতি রহম করেছেন।

আমি তাকে বললাম আমাকে এমন কোন আমল বলে দেন যা করলে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন এক হাজার রাকাত নফল নামাজ

এভাবে পড়বে যে, প্রত্যেক রাকাতে قُلْ هُوَاللهُ এক হাজার বার পড়বে। আমি বললাম এটাতো অনেক কঠিন। তখন তিনি বললেন তাহলে প্রত্যেক রাতে এক হাজার বার দুরূদ পড়বে। দারেমী (রাহ:) বলেন আমি এটাকে আমার নিয়মিত আমল বানিয়ে নিয়েছিলাম। (ফাজায়েলে দরূদ)

হযরত আবু হাফছ কাগজী (রাহ:)

এক ব্যক্তি আবু হাফছ (রাহ:) কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে অবস্থা জিজ্ঞাস করলেন। আবু হাফস বললেন আল্লাহ আমাকে মাফ দিয়ে জান্নাত দান করেছেন।

লোকটি বলল কিভাবে হল? আবু হাফস বলেন যখন ফেরেস্তাদেরকে হিসাব নিকাশের জন্য বলা হলো তখন তারা আমার গুণাহ ও দুরূদ হিসাব করলেন। তারা দেখলেন আমার দুরূদ শরীফের সংখ্যা গুণাহ থেকে বেশি। তখন আল্লাহ বললেন যথেষ্ট। আর হিসাব কর না। তাঁকে জান্নাতে নিয়ে যাও।
(ফাজায়েলে দুরূদ শরীফ)

এক লেখকের ঘটনা

উবায়দুল্লাহ বিন আমর কাওয়ারিরি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমার একজন লিখক সহপাঠি ছিল। তার মরনের পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? সে বলল আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি মাফ পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাস করলাম। সে বলল আমার অভ্যাস ছিল যখনই রাসুল (সা:) এর নাম কিতাবে লিখতাম তখনই (সা:) লিখতাম। এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে এমন কিছু দান করেছেন যা চোখ দেখেনি, কান শুনেনি, না কারও হৃদয়ে তা উদয় হয়েছে। (ফাজায়েলে দুরূদ)

আরেক ব্যক্তির ঘটনা

শায়খুল মাশায়িখ শিবলী (রাহ:) বলেন আমার এক প্রতিবেশি মারা যাওয়ার পর স্বপ্নে তাকে দেখে তার অবস্থা জানতে চাইলাম। সে বলল হে শিবলী, কঠিনতর পেরেশানি অতিক্রান্ত হয়েছে। মুনকার নাকীরের প্রশ্ন করার সময় আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি মনে মনে বলছিলাম হে আল্লাহ, এই মুসিবত

কোথা থেকে আসছে? আমি কি ইসলামের উপর মৃত্যুবরন করি নাই? তখন একটি আওয়াজ আসল এটা হচ্ছে দুনিয়াতে তোমার জবানের অসতর্কতার শাস্তি।

যখন এই দুই ফেরেস্তা আমাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করলেন তখনই অত্যন্ত সুন্দর এক ব্যক্তি আমার আর ফেরেস্তাদের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালেন। তার শরীর থেকে অত্যান্ত সুঘ্রান আসতেছে। তিনি আমাকে ফেরেস্তাদের প্রশ্নের উত্তর বলে দেন । আর আমি সাথে সাথে উত্তর দিয়ে দিলাম। আমি তাকে বললাম আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি কে? তিনি বললেন আমার জন্ম হয়েছে তোমার অধিক দুরূদ পাঠ থেকে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে সকল মুসিবতে তোমাকে যেন সাহয্য করি। (ফাজায়েলে দুরূদ)

খলফ রহ. এর সহপাঠির ঘটনা

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহঃ) বলেন, হযরত খলফ (রাহঃ) বর্ণনা করেন আমার এক সহপাঠি ছিল। সে আমার সঙ্গে হাদিছ পড়ত।

তার মরণের পর আমি তাকে স্বপ্নে সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় ঘোরা ফেরা করতে দেখলাম। আমি তাকে বললাম তুমি তো আমাদের সঙ্গে শুধু হাদিছ পড়তে, তাহলে এই সম্মানমর্যাদা কিসের ভিত্তিতে লাভ করলে? সে বলল হাদিছসমুহ তোমাদের সঙ্গে লেখার সময় যখনই নবী করীম (সা:) এর নাম হাদিছে আসত তখন আমি নামের নিচে (সা:) লিখতাম। এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে এই সম্মান দান করেছেন যা তুমি দেখতে পাচ্ছ।

(ফাজায়েলে দুরূদ শরীফ ১০১)

হযরত আবু সুলায়মান রহ.

ইবনে আবু সুলায়মান (রাহ:) বলেন আমার পিতার ইন্তেকালের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললাম আপনার সাথে কিরূপ আচরন করা হয়েছে? তিনি বললেন আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আমি বললাম কোন আমলের কারণে? তিনি বললেন প্রত্যেক হাদিছ লিখার সময় রাসুলের (সা:) এর উপর দুরুদ লিখতাম। (ফাজায়েলে দুরূদ)

306

হযরত আবু যুরআ (রহ)

জাফর বিন উবায়দুল্লাহ (রাহঃ) বলেন আমি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু যুরআকে স্বপ্নযোগে আসমানে ফেরেস্তাদের ইমামতি করতে দেখলাম।
আমি তাঁকে বললাম এত মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন? তিনি বললেন আমি নিজ হাতে ১০ লক্ষ হাদিছ লিখেছি। যখন রাসুল (সাঃ) এর নাম আসত তখনই রাসুল (সাঃ) এর নামের উপর اَلصَّلٰوةُ ও اَلسَّلَامُ লিখতাম। হুজুর (সাঃ) এর ইরশাদ হল যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর ১০ রহমত প্রেরন করবেন। এ হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি রহমতের সংখ্যা ১ কোটি হয়ে যায়। যেখানে আল্লাহর একটি রহমতেই সব কিছু হয়ে যায় সেখানে আমার প্রতি রহমত আছে ১ কোটি।
(ফাজায়েলে দুরূদ)

শাহ সনজরি (রাহঃ) এর মুক্তি

সাফিনাতুল আউলিয়ার মুসান্নিফ লিখেন এক ব্যক্তি শাহ সনজর কে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করল আল্লাহ আপনার সাথে কেমন আচরন করেছেন? সনজর বললেন আমাকে জাহান্নামের আগুনের কাছে সোপর্দ করার আদেশ করা হলো। আযাবের ফেরেস্তারা আমায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আওয়াজ আসল তাকে ছেড়ে দাও। সে একদিন হযরত খাজা শরীফ জানদানী (রাহঃ) এর মজলিসে অভাবি হয়ে হাজিরি দিয়েছিল। এই মজলিসের বরকতে তাকে মাফ দেওয়া হলো। এভাবেই আমার মুক্তি মিলল।
(খাজিনাতুল আসফিয়া, সিলসিলায়ে চিশতিয়া ৫৭)

শায়খ মুহাম্মদ (রাহঃ)

মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন (রাহঃ) এর ছাহেবযাদা বলেন মৃত্যু যন্ত্রনার সময় আমার পিতা দাড়িয়ে বললেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام আসুন, আমি বললাম আব্বু আপনি কাকে দেখছেন ? বললেন শায়খ আবুল হুসাইন খারকানীকে। ওয়াদা পুরনের জন্য এত দিন পর এখানে এসেছেন। যাতে আমি ভীতু না হই। তার সথে আছেন আরো কয়েকজন বাহাদুর। একথা বলেই আব্বা মারা যান।
(জহিরুল আসফিয়া ৫১৭)

307

শায়খ আবু বকর শিবলী (রাহ:)

তিনি সুফিদের অন্যতম। খুরাসানের আশরুসিয়া শহরের শিবলা গ্রামের প্রতি সম্মন্ধ করে তাকে শিবলী বলা হয়।

সামিরাতে তার জন্ম হয়। তিনি খায়রুন নিসাজ এর হাতে তওবা করেন। তার বয়ানে প্রভাবিত হয়ে তার হাতে তওবা করেন। এবং বিভিন্ন শায়েখদের সাহচর্যতা বেছে নেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাকে নেককারদের অন্তর্ভূক্ত করে নেন। জুনাইদ রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন اَلشِّبْلِىْ تَاجٌ هؤُلَاءِ অর্থাৎ শিবলী ঐ সকল লোকদের মাথার মুকুট।

খতিব (রাহ:) আলী বিন মাহমুদ যুযনী থেকে বর্ণনা করেন, আমি আলী বীন মুছান্না তামীমী কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন। একদা আমি শিবলীর কাছে প্রবেশ করলাম, তখন শিবলী আল্লাহকে সম্বন্ধ করে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

عَلى بُعْدِكَ لَا يَصْبِرُ* مَنْ عَاتَهُ الْقُرْبُ
وَلَا يَقْوى عَلي هِجْرِكَ* مَنْ تَيَّمُهُ الْحُبُّ
فَاِنْ لَمْ تَرَكَ الْعَيْنُ* فَقَدْ يُبْصِرُكَ الْقَلْبُ

যার অর্থ হলে, প্রভু আপনার থেকে দুরে থাকা ও বিচ্ছিন্নতার উপর ধর্য্য ধারন করা যাচ্ছে না। যে ভালোবাসার লোভি সে বিরহের শক্তি রাখে কিভাবে? চক্ষু যদিও দেখতে পাচ্ছে না অন্তরতো দেখতে পাচ্ছে।

বর্ণিত আছে শায়খ আবু বকর শিবলী কিছু দিন অদৃশ্য ছিলেন। সর্বত্র তালাশ করে পাওয়া যায় নি। একদিন তাঁকে হিজরাদের দলে পাওয়া গেল। লোকেরা বলল হে শিবলী এটা আবার কি? শিবলী বললেন এই দল দুনিয়াতে না পুরুষ না নারী। আমি চাই আমিও যেন এভাবে গ্রেফতার হই যে আমি পুরুষও না নারীও না।

যে রাতে শিবলী (রাহ:) মারা যান সেই রাতের পুর্ণ সময় বলেছিলেন

كُلُّ بَيْتٍ اَنْتَ سَاكِنُه غَيْرُ مُحْتَاجٍ اِلى السُّرُجِ
وَجْهُكَ الْمَاْمُوْلُ حُجَّتُنَا يَوْمَ تَأْتِي اَلنَّاسُ بِالْحُجَجِ

যে ঘরে তুমি অবস্থানকারি সে ঘরের বাতির প্রয়োজন নেই। যে দিন লোকেরা নিজ নিজ প্রমানাদি নিয়ে আসবে সেদিন তোমার দর্শনের আশা রাখাটা আমাদের দলিল হবে।

308

শায়খ শিবলীর জানাযার নামাজ পড়ার জন্য অনেক লোক হাজির হল। অথচ তাঁর মৃত্যু তখনও হয়নি। তিনি অন্তরদৃষ্টি দ্বারা তা বুঝে ফেললেন। তাইতো বললেন আশ্চর্য্য বিষয় মৃত লোকেরা জিন্দা ব্যক্তির জানাযা পড়তে এসেছে। লোকেরা তাঁকে তালকিন করতে গিয়ে বলল لا اله الله বলুন। শিবলী বললেন আল্লাহ ছাড়া যেহেতু আর কেহ নাই তাহলে নফী কিসের করব? তখন উচ্চস্বরে এক ব্যক্তি কালিমা শাহাদতের তালকিন করল। শিবলী বললেন মৃত ব্যক্তি জীবিতকে তালকিন করতে এসেছে? কিছুক্ষন পর লোকেরা বলল তিনি কেমন আছেন? বলা হল, প্রিয় জনের কাছে পৌঁছে গেছেন। (জহিরুল আসফিয়া ৫৩২)

হযরত শিবলী (রাহ:) এর খাদেম বকরান দিনুরী (রাহ) কে জাফর বিন নুসাইর জিজ্ঞাস করলেন, তুমি শিবলী (রাহ:) এর মরনকালে কি দৃশ্য দেখেছ? খাদেম বলল তিনি মরনকালে বলতেছিলেন আমার উপর এক ব্যক্তির এক দিরহাম (রুপ্যমুদ্রা) পাওনা ছিল আমি তার পক্ষ থেকে কয়েক হাজার দিরহাম ছদকা করেছি। তারপরও এটার বুঝা আমার অন্তরে রয়ে গেছে। কেন আমার কাছে পাওনা রয়ে গেল? অতপর বললেন আমাকে অজু করাও। আমি অজু করালাম। কিন্তু দাড়ি খিলাল করতে ভুলে গেলেন। তিনি দুর্বলতার দরুন করতে পারতেন না। জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার হাত ধরে তার দাড়িতে ডুকালেন এবং এই অবস্থায়ই মারা গেলেন। একথা শুনে জাফর কাঁদতে লাগলেন যে এই ব্যক্তি এ অবস্থায়ও শরিয়তের মুস্তাহাব বিষয় ছাড়েন নাই।
(ফাজায়েলে সাদাকাত ৪৭৩)

এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের সময় আপনি কি করেছেন? শিবলী বললেন মুনকার-নাকির এসে বললেন আপনার খোদা কে? আমি বললাম আমার খোদা হলেন তিনি যিনি তোমাদেরকে এবং সকল ফেরেস্তাদেরকে আমার দাদা আদম আ: কে সিজদা করতে হুকুম করেছিলেন। আর আমি আদমের পৃষ্ঠদেশে তোমাদের অপেক্ষা করছিলাম। তখন তারা বলল এই লোকটি সমস্ত লোকের জবাব দিয়ে ফেলেছে। একথা বলে তারা চলে যান। (জহিরুল আসফিয়া ৫৩২ আখবারুল আখয়ার ২৩২)

আরেক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? শিবলী বললেন আল্লাহ আমার কোন কথার উপর দোষারূপ করেন নাই। শুধু একটি কথার উপর দোষারূপ করেছেন। তা হলো একদিন আমি বলেছিলাম সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল জান্নাত ছেড়ে জাহান্নামে যাওয়া। আল্লাহ তায়ালা শুধু এ

309

কথার উপর দোষারূপ করে বলেছেন যে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হল ঐ ব্যক্তি যে আমার দিদার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আরেক ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে দেখে বলল আখেরাতের বাজার কেমন পেলেন? শিবলী বললেন বাজার এমন পেয়েছি যে এখানে জলন্ত ও বিপর্যস্ত হৃদয় সতেজ হয়। জলন্ত হৃদয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। ভাঙ্গা হৃদয়কে জোড়া দেওয়া হয়। হৃদয় আর কোন জিনিসের দিকে তাকায় না। (জহিরুল আসফিয়া ৫৩৩)

আরেক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখেন তিনি রাসাফা (বাগদাদের একটি স্থান) নামক স্থানে সুন্দর কাপড় পরিধান করে এসেছেন। সেখানে সাধারনত তিনি বসতেন। এই ব্যক্তি বলেন আমি অগ্রসর হয়ে তাঁকে সালাম দিলাম এবং তাঁর সামনে বসে জিজ্ঞাস করলাম আপনার বিশেষ বন্ধু কে? তিনি বললেন যে বেশি আল্লাহর যিকির করে। বেশি করে আল্লাহর হকের প্রতি গুরুত্ব দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অগ্রগামি হয়।

(কিতাবুর রুহ ৭৪)

শায়খ আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আহমদ আস-সুফি আল-খাওয়াছ (রাহঃ)

শেষ বয়সে তাঁর ডায়রিয়া হয়ে গেল। দিন রাতে সাতবার গোসল করতেন। প্রত্যেকবার ২ রাকাত নামাজ পড়তেন। আবার গোসলের প্রয়োজন হয়ে যেত। লোকেরা তাঁকে বলল আপনার কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা আছে কি? বললেন ভোনা কলিজা আমি চাই। অবশেষে পানিতে গোসলরত অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন। অতপর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

এক বুজুর্গ এসে তাঁর বালিশের নিচে রুটির টুকরা পান। তখন বুজুর্গ বললেন যদি এই রুটির টুকরা না দেখতাম তাহলে তাঁর জানাযা পড়তাম না। কেননা এটা হল এ বিষয়ের আলামত যে এই তাওয়াক্কুলের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরন করেছেন।

আরেক বুজুর্গ তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? বললেন যদিও বহু ইবাদত এবং তাওয়াক্কুলের পথ অবলম্বন করেছি কিন্তু মৃত্যুর সময় পবিত্রতার সাথে যে ইবাদত করেছি তার ছওয়াব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পবিত্রতার কারণে জান্নাতে সর্বোচ্চ মাকাম লাভ করেছি। অতপর আওয়াজ

দিয়ে বলা হল, হে ইবরাহিম এই অতিরিক্ত দান তোমাকে এজন্য দেওয়া হয়েছে যে তুমি আমার দরবারে পবিত্র অবস্থায় এসেছ। পবিত্রতার বড় মর্যাদা এখানে।

(জহিরুল আসফিয়া ৫৪৫)

আল্লামা ইবনুল কাসিম (রাহঃ)

১৯১ হিজরীতে মিশরে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করল এই বিশ্বের কোন বস্তু তোমাকে উপকৃত করেছে? জবাবে বললেন ইস্কন্দরিয়ায় যে কয় রাকাত নামাজ পড়েছি তাই আমাকে উপকৃত করেছে।

এই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাস করল ফেকাহর মাসায়িল যেগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তা কি উপকারে আসল না? জবাবে বললেন আমি এগুলোর কিছুই দেখি নাই। হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন এই সবগুলাকে هَبَاءً مَنْثُوْرًا নেস্তেনাবুদ পেয়েছি।

(বুসতানুল মুহাদ্দিসিন ৪০)

হাসান বিন ছালেহ (রাহঃ)

আম্মার বিন সায়েফ (রাহঃ) বলেন আমি হাছানকে স্বপ্নে দেখে বললাম আমি আপনার সাক্ষাতে আগ্রহি হয়ে আছি। আপনার অবস্থা বলুন। হাছান বললেন খুশি হয়ে যাও। আমি আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারনা করার ন্যায় কোন আমল পাইনি।

(বুসতানুল মুহাদ্দিসিন)

হযরত মারওয়ান মাহলবী (রাহঃ)

ইয়াকযা বিনতে রাশেদ (রাহঃ) বলেন, মারওয়ান মাহলবী আমার সমবয়স্কের ছিলেন। তিনি কাজি ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হই। স্বপ্ন যোগে তাঁকে দেখে বললাম তোমার অবস্থা বর্ণনা কর। তিনি বললেন আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেছেন। আর অতিরিক্ত কি মিলল? তিনি বললেন আল্লাহ আমাকে তার নৈকট্যশীলদের স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি বললাম আপনার কোন কোন ভায়ের সাথে সাক্ষাত হয়েছে? বললেন আমি হাছান বসরী, ইবনে সীরীন, মায়মুন ইবনে সাইয়াহ (রাহ.) কে দেখেছি।

311

উম্মে আব্দুল্লাহ বসরী (রাহঃ) বলেন আমি স্বপ্নে দেখলাম এক সুন্দর ঘরে প্রবেশ করেছি। অতপর এক বাগানে গেলাম যা অত্যন্ত প্রশস্ত। আমি বাগানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, স্বর্নের একটি গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসা। তার চতুর্দিকে শরাব নিয়ে খাদেমরা দাড়ানো। আমি সেখানের সুন্দর্যতা দেখে কিংকর্তব্যবিমুড় হয়ে গেলাম। ইত্যবসরে বলা হল, মারওয়ান মাহলবী আসছেন। একথা শুনে গাছে হেলান দেওয়া ব্যক্তি সোজা হয়ে বসল। অতপর আমার চক্ষু খুলে গেল। দেখতে পেলাম মারওয়ানের লাশ নিয়ে আমার দরজার সামনে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
(কিতাবুর রূহ ৫৮/৫৯)

মুসলিম বিন ইয়াসার (রাহঃ)

মালেক বিন দিনার বলেন আমি মুসলিম বিন ইয়াছার কে স্বপ্নে দেখে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি সালামের কোন জবাব দিলেন না। আমি বললাম আপনি সালামের জবাব দেন নাই কেন? তিনি বললেন আমি মৃত, সালামের জবাব দিব কিভাবে?

আমি বললাম মৃত্যুর পর আপনার অবস্থা কেমন হল? তিনি বললেন খোদার কছম আমি ভয়ংকর এবং মহা ভুমিকম্প প্রত্যক্ষ করলাম। আমি বললাম তারপর কি হল? বললেন দয়ালু সত্ত্বার প্রতি তুমি যেমনটা ধারনা কর তাই হল। তিনি নেকি কবুল করেছেন। গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এবং নিজেই অপরাধের জামিন হয়ে গেছেন। অতপর মালিক চিৎকার করে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। ফলে দীর্ঘক্ষন পর্যন্ত অসুস্থ রইলেন। অতপর হৃদয় ফেটে মারা যান।
(কিতাবুর রূহ)

মাওরিক আজালি (রাহঃ)

জামিল বিন মুররা (রাহঃ) বলেন, মাওরিক আমার বন্ধু ছিলেন। আমরা উভয়জন অঙ্গিকারবদ্ধ হয়েছিলাম, যে আগে মরবে তিনি যেন অপর জনকে নিজ হালত বলেন। প্রথমে মাওরিক ইন্তেকাল করলেন।

আমার স্ত্রী তাঁকে স্বপ্নে দেখেন, স্বাভাবিক যেভাবে জীবিত অবস্থায় আসতেন সেভাবে এসেছেন। এসে দরজায় নক করছেন। আমি অভ্যাসমত উঠে দরজা খুলে দেই। আর তাকে বলি আস বন্ধুর ঘরে আস। তিনি বললেন কিভাবে

আসব? আমিতো মৃত। আমি তো আমার বন্ধুকে আল্লাহর দয়ার সুসংবাদ দিতে এসেছি। একথা জানাতে এসেছি যে, আল্লাহ আমাকে তার বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
(কিতাবুর রূহ)

হযরত উয়াইছ কারনি (রাহ:)

আবু ইয়াকুব কারী (রাহ:) বলেন আমি স্বপ্নে বাদামি রঙ্গের লম্বা এক ব্যক্তিকে দেখলাম। যার পিছনে অনেক লোক ছিল। জিজ্ঞাস করলাম ইনি কে? লোকেরা বলল উনি উয়াইছ কারনি। অবশেষে আমিও তার পিছু নিলাম। এক পর্যায়ে বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। আমাদেরকে কিছু নসিহত করুন। তখন তিনি আমাকে গভীরভাবে দেখলেন। আমি বললাম আমি হেদায়াতের অনুসন্ধানকারি আমাকে পথ দেখান। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।
তিনি আমার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন আল্লাহর রহমত তার অনুগত্যের কাছে তালাশ কর। আর গুণাহের কাছে রয়েছে তার শাস্তি তা থেকে বেচে থাক। আকাঙ্ক্ষা সমুহের তালাশে লেগে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হইও না। এ নসিহত করে চলে যান।
(কিতাবুর রুহ)

শুবা বিন হাজ্জাজ (রাহ:) এবং মিছআর বিন কিদাম (রাহ:)

তারা উভয়জন হাফেজ ছিলেন। বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন আবু আহমদ বুরাইদী (রাহ:) বলেন আমি উভয়কে স্বপ্নে দেখলাম। আবু বুসতান (শুবা বিন হাজ্জাজ) কে জিজ্ঞাস করলাম আল্লাহ কি আচরন করেছেন? তিনি বললেন আমাকে তোমার এই কবিতা স্বরণ করার তাওফিক দিয়েছেন।

حبانی الهی فی الجنان بقية — لَها ألف باب من لجين و جوهرا
وقال الرحمن يا شعبة الذى — تحر فى جمع العلوم فاكثرا
تنعم بقربى اننى عنك ذورضا — وعن عبدى القوام فى الليل مسعرا
كفى مسعرا عزا بان سيزورنى — واكشف عن وجهى الكريم لينظرا
وهذا فعالى باللذين تنسكوا — ولم يألفوا فى سالف الدهر منكرا

313

যার অর্থ হলো, আমার মাবুদ আমাকে জান্নাতে এমন এক গুম্বুজ দান করেছেন, যার দরজা হচ্ছে এক হাজারটি। যা রূপা ও মুতির তৈরি। মেহেরবান আল্লাহ আমাকে বললেন হে শুবা, তুমি যে অধিকহারে ইলম জমা করতে পারদর্শি ছিলে, এখন তুমি আমার কাছে আনন্দ কর। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আর আমার বন্দা মিসআরের প্রতিও সন্তুষ্ট সে তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিল। মিসআরের জন্য এই সম্মানই যথেষ্ট যে, সে আমার দিদার লাভ করেছে। আর তার জন্য আমার সম্মানের চেহারা খুলে দিয়েছি। ইবাদত কারীদের সাথে আমার আচরন এমনই হয়। যে অতিতে মন্দ কথায় অভ্যস্ত ছিলনা। (কিতাবুর রূহ)
ইবনে সাম্মান বলেন, আমি মিসআরকে স্বপ্নে দেখে বললাম আপনার নিকট শ্রেষ্ট আমল কোনটি? তিনি বললেন যিকিরের মজলিস সমুহ।

ঈসা বিন যাযান (রাহঃ)

আবু জাফর বর্ণনা করেন আমি ইসা বিন যাযানকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলাম আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরন করেছেন? উত্তরে তিনি এ কবিতা পড়লেন

لَوْ رَأَيْتَ الْحِسَانَ فِيْ الْخُلْدِ حَوْلِىْ* وَاَكَاوِيْبَ مَعَهَا لَشَرَاب
يُرَنِّمْنَ بِالْكِتَابِ جَمِيْعًا* يَتَمَشَّيْنَ مُسْبِلَاتِ الثِّيَابِ

আফসোস! যদি তুমি সুদর্শন হুরদেরকে বেহেস্তের মধ্যে আমর চতুর্পার্শে শরাবের পাত্র নিয়ে দাড়ানো দেখতে, যারা মধুর স্বরে কুরআন পড়ছে। এবং কাপড় টেনে টেনে হাটছে।
(কিতাবুর রূহ ৭৫)

মুসলিম বিন খালেদ জঙ্গি (রাহঃ)

ইবনে জুরাইজ (রাহঃ) এর এক সাথি বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে নিজেকে মক্কার একটি কবরস্থানে দেখলাম। আমি প্রত্যেক কবরের উপর চাদর টানানো দেখলাম। একটি কবরে চাদরের সাথে তাবুও দেখলাম। আর বড়ই বৃক্ষ দেখলাম।
আমি তাবুর দরজার কাছে এসে সালাম করে ভিতরে প্রবেশ করে সেখানে মুসলিম বিন খালেদ জঙ্গিকে দেখলাম। আমি সালাম করে তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম, কি বিষয় সকল কবরের উপর শুধু চাদর আছে আর আপনার কবরের

314

উপর চাদরও আছে তাবুও টানানো আছে। আবার বড়ই গাছ? তিনি বললেন আমি বেশি করে রোযা রাখতাম। আমি বললাম ইবনে জুরাইজের কবর কোথায়? তাঁর মর্যাদা কেমন? আমি তার সামনে উঠা বসা করতাম এখন তাকে সালাম করতে চাই। মুসলিম ইহা শুনে নিজের শাহাদাত আঙ্গুলি ঘুরিয়ে বললেন তার কবর কোথায়? তার আমলনামা তো ইললিয়্যিনে উঠানো হয়েছে।
(কিতাবুর রূহ)

শুরাইহ বিন আবিদ শিমালী (রাহঃ)

গাদিফ বিন হারিছ (রাহঃ) বলেন শুরাইহ বিন আবিদের সাকরাতের সময় আমি তাঁর কাছে আবেদন করলাম যদি মৃত্যুর পর আপনি এসে আপনার সংবাদ জানাতে পারেন তাহলে অবশ্যই তা করবেন। এই কথাটি দরবেশদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল।

মৃত্যুর পর অনেক দিন যাবৎ তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম না। হঠাৎ একদিন স্বপ্নে তাঁকে দেখে বললাম আপনার কি মৃত্যু হয়নি? আচ্ছ এবার বলুন তো আপনার অবস্থা কি? তিনি বললেন আহরাদ ছাড়া সবাইকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। আমি বললাম আহরাদ কে? তিনি বললেন যার দিকে কথা বলার সময় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা হত।
(কিতাবুর রূহ)

মুররা হামদানী (রাহঃ)

মুররা হামদানী এত দীর্ঘ সিজদা করতেন যে তার কপালে মাটি দেখা যেত। তাঁর মৃত্যুর পর এক নিকটাত্মীয় তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন উনার কপালে সিজদার স্থানে তারকার ন্যায় একটি উজ্জল আলো চমকাচ্ছে। তিনি (নিকটাত্মীয়) জিজ্ঞাস করলেন এই উজ্জলতা কিভাবে আসল? উত্তরে বললেন মাটির চিহ্নের কারণে এই আলো দান করেছেন। তিনি বললেন পরকালে আপনার কি মর্যাদা আছে? উত্তরে বললেন উত্তম স্থান দান করা হয়েছে। এবং এমন ঘর দান করা হয়েছে যেখান থেকে কখনও স্থানন্তরিত হতে হবে না সেখানে কেহ মরবেও না।
(কিতাবুর রূহ)

আল্লামা হুমায়দী আন্দালুসী (রাহঃ)

৪৮৮ হিজরী সনের ১৭ জিলহজ্জ তিনি ইন্তেকাল করেন। শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আবু বকর শামী তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। শায়খ আবু ইসহাক শিরাজীর কবরের নিকট দাফন করা হয়।

মৃত্যুর পুর্বে বাগদাদের প্রধানমন্ত্রী মুজাফফারকে ওসিয়ত করেছিলেন আমাকে বিশরে হাফির কাছে যেন দাফন করা হয়। কিন্তু সম-সাময়িক বিধি নিষেধের কারণে ওসিয়ত মত আমল করা যায়নি। মুজাফফার স্বপ্নে তাঁকে দেখলেন হুমাইদি তাকে ওসিয়তের বিপরীত কাজের জন্য অভিযুক্ত করেন।

অবশেষে মুজাফফার সাহেব বাধ্য হয়ে ৪৯১ হিজরী সনের সফর মাসে তাঁকে স্থানান্তর করে বিশরে হাফির কবরের পাশে দাফন করা হয়। কবর থেকে উত্তোলনের সময় তার শরীর কে তরুতাজা পাওয়া যায় , অনেক দুর থেকে ঘ্রান পাওয়া যায়। ইহা তাঁর কারামত।

(বুসতানুল মুহাদ্দিসীন ১৪০)

আল্লামা ইয়াহইয়া বিন মুয়ীন (রাহঃ)

২৩৩ হিজরীতে বাগদাদ থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রথমে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন, জিয়ারত শেষ করে মক্কায় আসেন।

মদীনা থেকে সফরের সময় প্রথমে যে স্থানে ঘুম আসে সেখানে অদৃশ্য একটি আওয়াজ আসল, হে আবু যাকারিয়া আমার প্রতিবেশি হওয়াটাকে ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাচ্ছ? ইয়াহইয়া বুঝে নিলেন এটা রাসুলের আওয়াজ। সাথে সাথে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থানের পর মারা যান। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি নিজ হাতে ১০ লক্ষ হাদীছ লিখেছেন।

মৃত্যুর পর কেহ তাঁকে স্বপ্নে দেখে বলল আল্লাহ আপনার সহিত কিরূপ আচরন করেছেন? উত্তরে বললেন আল্লাহ আমাকে অনেক উপহার-উপঢৌকন দিয়েছেন। ৩০০ হুরকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। (বুসতানুল মুহাদ্দিসীন ১১৩)

আল্লামা খতিব বাগদাদী (রাহঃ)

এক বুজুর্গ বলেন আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি বাগদাদে খতিব (রাহঃ) এর খেদমতে হাজির হয়েছি। আমি চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী তারীখে বাগদাদ

316

পড়তে চাইলাম। আমি দেখলাম খতিব বাগদাদীর ডান পাশে নসর ইবনে ইবরাহীম মাকদাসী বসা। বাম পাশে আরেক মহান বুজুর্গ বসা। আমি বললাম এই মহান বুজুর্গ কে? যার সৌন্দর্য্যতার কারণে চোখ নিস্ফল হয়ে গেছে। বাগদাদী বললেন ইনি রাসুল (সা:)। তারীখে বাগদাদ শুনার জন্য এসেছেন। ৪৬৩ হিজরী সনের ৭ই জিলহজ্জ তাঁর ইন্তেকাল হয়। শায়খ আবু ইসহাক শিরাজী তাঁর লাশ কাঁধে বহন করেন।

মৃত্যুর পর বাগদাদের এক নেককার লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখে অবস্থা জিজ্ঞাস করলেন। উত্তরে খতীব বলেন, আমি আরাম আয়েশের জান্নাতে আছি।

(বুসতানুল মুহাদ্দিসীন ১৩৫)

তিনি উপরোক্ত জবাব দ্বারা ঐ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ যদি সে নৈকট্যশীলদের মধ্য থেকে হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে শান্তি, আরাম আয়েশ ও সুখের জান্নাত।

শায়েখ ফাতাহ মুসিলী (রাহ:)

তাঁর মৃত্যুর পর লোকেরা স্বপ্নে অবস্থা জিজ্ঞাস করল। শায়খ ফাতাহ বললেন আল্লাহ আমাকে বলেছেন তুমি কেন এত কান্না কাটি করলে? আমি উত্তর দিলাম গুণাহের লজ্জায়। আল্লাহ বললেন তোমার অধিক কান্নার কারণে ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দিয়েছিলাম যেন তোমার কোন গুণাহ না লিখেন।

(জহিরুল আসফিয়া ২৭০)

আব্দুল আজীজ বিন সুলায়মান (রাহ:)

আব্দুল আজীজ বিন সুলায়মান রাহ. কে একজন স্বপ্নে দেখল সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় মাথায় মুতির মুকুট। লোকটি বলল অবস্থা কি আপনার? মৃত্যুকালে কি দেখলে? অবস্থা কেমন হয়েছে? আব্দুল আজীজ বললেন মৃত্যুর সময়ের ভয়াবহতার কথা জিজ্ঞাস কর না। তবে আল্লাহর দয়া আমার প্রত্যেক ত্রুটির উপর পর্দা ফেলে দেয়। তিনি নিজ দয়ায় আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

(কিতাবুর রূহ)

মাইছারাহ বিন সুলাইম (রাহঃ)

আবু আব্দুর রহমান ছাহেলী (রাহঃ) বলেন আমি মাইছারাহ কে স্বপ্নে দেখে বললাম বহুদিন যাবৎ তোমাকে দেখি নাই। মাইছারাহ বললেন সফর অনেক দীর্ঘ। আমি বললাম কেমন ব্যবহার করা হয়েছে? মাইছারাহ বললেন মুক্তি পেয়েছি। আমি বললাম আমার ব্যাপারে আপনার আদেশ কি? বললেন সুন্নতের অনুসরন এবং ওলী আল্লাহদের সুহবত জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় এবং আল্লাহর নৈকট্য করে দেয়। (কিতাবুর রূহ ৭৪)

শায়খ আবু আলী যাগবানী (রাহঃ)

শায়খ আবু আলীর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে বললেন মুক্তি কিভাবে পেলেন? আবু আলী ছহীহ মুসলিমের কিছু অংশের দিকে ইশারা করে বললেন এগুলোর বিনিময়ে। (বুসতানুল মুহাদ্দীসীন ১৮৭)

উস্তাদ আবুল কাসিম কুশাইরী (রাহঃ)

তিনি ৪৬৫ হিজরী সনের ১৬ রবীউস ছানী মাসের রবিবার দিন সকালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, সুস্থ অবস্থায় যে নফল পড়েছেন অসুস্থ অবস্থায় তা ছুটেনি। সকল নামাজ দাড়িয়ে আদায় করতেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর আবু তুরাব মুরাগী (রাহঃ) তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। শায়খ কুশাইরী তাকে বললেন আমি আরাম আয়েশে আছি। (বুসতানুল মুহাদ্দিসীন ১৩১)

জাইগাম আবিদ (রাহঃ)

তাঁকে একজন স্বপ্নে দেখল। জাইগাম স্বপ্নদর্শনকারিকে বললেন তুমি আমার জন্য কেন দোয়া করলে না? তখন ঐ ব্যক্তি ওজর পেশ করলেন। জাইগাম তাকে বললেন যদি দোয়া করতে তাহলে ভালো হত। (কিতাবুর রূহ)

আবুল আলা আইয়ূব (রাহঃ)

ইয়াযিদ বিন হারুন বলেন আমি আবু আলা আইয়ূব বিন মিসকিনকে স্বপ্নে দেখে বললাম আল্লাহ কেমন আচরন করেছেন? তিনি বললেন আমাকে ক্ষমা

318

করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম কোন আমলের কারণে? আবু আলা বললেন নামাজ রোযার কারণে। আমি বললাম মনসুর বিন যাযানের খবর কি? তিনি বললেন তাঁর বালাখানা আমরা দুর থেকে দেখি। (কিতাবুর রূহ ৬৯)

সালামাহ বিন কুহাইল (রাহঃ)

আজলাহ (রাহঃ) বলেন আমি সালামাহ বিন কুহাইলকে স্বপ্নে দেখে বললাম কোন আমলকে শ্রেষ্ট পেলেন? তিনি বললেন তাহাজ্জুদ। (কিতাবুর রূহ)

ওফা বিন বিশর (রাহঃ)

আবু বকর ইবনে মারয়াম (রাহঃ) বলেন আমি ওফা বিন বিশরকে স্বপ্নে দেখে অবস্থা জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বললেন প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিস্কৃতি পেয়েছি। আমি বললাম কোন আমলকে উত্তম পেয়েছ? তিনি বললেন আল্লাহর ভয়ে কাঁদা। (কিতাবুর রূহ)

আব্দুল্লাহ বিন আবী হাবীবা (রাহঃ)

মুসা বিন ওয়াররাদ (রাহঃ) বলেন আমি আব্দুল্লাহ বিন আবি হাবীবাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন আমার নেকি বদি দেখানো হয়েছে। আমার নেকির মধ্যে ডালিমের ঐ বিচিটিও দেখলাম যা জমিনে পড়ে ছিল, আর আমি উহা উঠিয়ে খেয়েছিলাম। আর বদির মধ্যে রেশমের ঐ জোড়াও দেখলাম যা আমার টুপির মধ্যে ছিল। (কিতাবুর রূহ)

হাম্মাদ বিন সালামা (রাহঃ) এর এক সাথি

হাম্মাদ বিন সালামা তার এক সাথিকে স্বপ্নে দেখে বললেন আল্লাহ কি আচরন করেছেন? সাথি বললেন আমাকে আল্লাহ বলেছেন তুমি দুনিয়াতে কষ্ঠ সহ্য করেছ। আজ সকল কষ্টের বিনিময়ে সর্বদা শান্তি দান করলাম। (কিতাবুর রূহ)

রাজা বিন হায়ওয়াহ (রাহঃ)

রাজা বিন হায়ওয়াহ রাহঃ এর মৃত্যুর পর তাঁর একজন নেককার স্ত্রী তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাস করলেন আপনি কোন দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন? তিনি বললেন

319

উত্তমতার দিকে। তবে তোমাদের থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার পর আমি ঘাবড়িয়ে গিয়ে ছিলাম। আমি ধারনা করেছিলাম কিয়ামত মনে হয় এসে গেছে। স্ত্রী বললেন কেন? তিনি বললেন জাররাহ এবং তার সঙ্গি নিজের সকল আসবাব পত্র নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করছিল। এমনকি জান্নাতের গেইটে ভিড় সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। (কিতাবুর রূহ)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

শিক্ষণীয় দরস

শিক্ষণীয় দরস

জাহানের প্রত্যেক দিকেই রয়েছে শিক্ষণীয় নমুনা
কিন্তু তোমাকে অন্ধ করে রেখেছে দুনিয়ার সুগন্ধি ও জাকজমকতা
কখনো কি চিন্তা করে দেখেছ তুমি
যে ঘর নির্মিত ছিল তা বিরাণ হয়ে গেছে

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

শামের অধিবাসিরা মাটির সঙ্গে মিশে গেলে কিভাবে
অট্টালিকার মালিক ছন্নছাড়া হয়ে গেল কিভাবে
প্রসিদ্ধ লোকেরা নিশ্চিহ্ন হল কিভাবে
জমিনকে আসমান খেয়ে ফেলল কিভাবে

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

জমিন মানুষের কবর হল কিভাবে
বাদশাহ, সম্মানিত, মালিক
তুমি কয়েক দিন শক্তি দেখাবে কিভাবে
মৃত্যু শক্তভাবে তোমার পিছনে লেগেছে

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

মৃত্যু কিসরাকেও ছাড়ে নাই, কোনো বাদশাহকে ছাড়ে নাই
তার মহাবিজয়ী সিকন্দরও হেরেছেন
কতইনা আফসোস প্রত্যেকেই চলে গেলেন
সকল শান-শওকত এমনিতেই পড়ে রয়ে গেল
দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

এখানে সকল আনন্দ শত দুঃশ্চিন্তা দ্বারা পরিবর্তনীয়
যেখানে ছিল প্রফুল্লতা-বিহল্ল, সেখানে এখন আহাজারি

সব দিকে এই জগতের পরিবর্তন
তোমার সত্ত্বাই প্রতি নিঃশ্বাসে হচ্ছে বিবর্তন।

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

বাল্যকাল তোমার কয়েকবছর নিঃশেষ করেছে
যৌবন পরে দেওয়ানা বানিয়েছে
বৃদ্ধকাল তারপর এসে কত কি যন্ত্রণা দিয়েছে
করে দিবে তোমার হায়াত একেবারেই শেষ

322

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

এ তোমার ঐশ্বর্য্য, থাকো সবার উপরে
শোভা হোক একাকী, সাজ-সজ্জা হোক তোমারই
যাই কর, এটা কি ধ্বংস হবে না
তোমাকে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ধোঁকায় ফেলেছে

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়
ওটাও ভোগ-বিলাসের মহল
যার অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘড়ি হচ্ছে শেষ
ব্যাস, এখন নিজের এই অজ্ঞতা থেকে বের হয়ে
নিজের জীবন কাটানোর পদ্ধতি এখন বদলিয়ে দাও

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

এই ধ্বংসশীল দুনিয়া তোমার প্রিয় হয়েছে,
হায়! কি বস্তু উদ্দিষ্ট তোমার!

এতটুকু জ্ঞান নেই তোমার হে আত্মহারা
এখনোই উচিত ভালো করে বুঝে নেয়া

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

বার্ধক্যের থেকে মৃত্যুর পয়গাম পেয়েও
বিচলিত হওনি, চেতনা ফিরেনি, একটুও সতর্ক হওনি

323

হঠাৎ তোমার গাফলতের হবে পরিসমাপ্তি
কবে আসবে চেতনা নিজের পাগলামী থেকে

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

না থাকবে কোন প্রেমিক গায়ক
না থাকবে কোন খ্যাতিমান প্রেমাসক্ত
না কেই রয়েছে; না কেউ থাকবে
থাকবে তুমি থাকবে না কারো আলোচনা
দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়
যখন এই ধরণী থেকে চলে গেছে অধিকাংশ বন্ধু
উঠে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে সদা সব সময়
এটা যখন সর্বদা দৃশ্যমান সামনে
তবে কিভাবে এতে তোমার অন্তরকে প্রশান্তি দাও

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

বসুন্ধরার কোথাও আহাজারির শোরগোল বিদ্যমান
কোথা অভাব-অনটনের রোনাজারি-ফরিয়াদ
কোথাও শান-শওকত, অত্যাচার, ধোঁকা-প্রবঞ্চনা
মোট কথা, প্রত্যেক দিক থেকে এমন বহু আর্তনাদ

দুনিয়া অন্তর দিয়ে ভালবাসার জায়গা নয়
এটা শিক্ষাগ্রহণের জায়গা তামাশা নয়

উচ্চাকাঙ্খা আমাকে এমন অনুপ্রাণিত করে যে,

দৃষ্টিনন্দন রুশ এবং তুস শহর আর কি
সুযোগ হলে বিলাসিতায় কাটিয়ে দিব জিন্দেগানী
এদিকে তবলার আওয়াজ, ও দিকে দামার প্রতিধ্বনি
নসিহত শ্রবণের এক পর্যায়ে মজাক করে বললাম
চল, তুমি যে লালসার বন্ধনে আটক তা তোমাকে দেখাব
নিয়ে গেলাম পরদেশের এক কবরস্থানের পাশ
যে স্থানে দিলের সকল তামান্না নিরাশ
দুই তিনটি কবর দেখিয়ে আমাকে বলতে লাগল
এ সিকন্দর, এ দারা, এ কায়কাউস

325

পরিপূর্ণ মরণের মোরাকাবা

পরিপূর্ণ মরণের মোরাকাবা

বন্দেগীর জন্য, স্মরণ রেখ!
সকল কামনা-চিন্তা নিক্ষেপিত, মনে রেখে।
অন্যথায় পরে আছে অনুতাপ স্মরণ রেখে
জীবন কিছু দিনের মনে রেখ!

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

তুমি কোন পদ মর্যাদা পেয়েছে তবে কি
রৌপ্য-মুদ্রার ভান্ডার দখলে এসেছে তবে কি
আড়ম্বরপূর্ণ অট্টালিকা বানিয়েছে তবে কি
শান-শওকত তোমার প্রদর্শন করে তবে কি?

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

কয়সর, সিকান্দর, জমশেদ মরে গেছে
যাল, সোহরার, রুস্তম মরে গেছে
কত কত বাঘ, সিংহ গেছে মারা
সবাই নিজের বাহাদুরী দেখিয়ে গেছে মারা

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

তোমার প্রভাব প্রতিপত্তি আসবেনা কাজে
দীর্ঘ আশাও আসবেনা কাজে
কিছুই মৃত্যুর সময় আসবেনা কাজে
তবে নেক আমল আসবে কাজে।
একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

বহু ঘরকে উজাড় করেছে মৃত্যু
কত খেল-তামাশাকে নস্যাৎ করেছে মৃত্যু
কতইনা পালোয়ানকে ধরাশায়ী করে মরণ
দেহ-মস্তক কবরে পুতেঁ রেখেছে মরণ

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

প্রস্থান হবেই বেখবর আলোর, গাফলতের সুবেহ হবেই
পাথেয় বেঁধে নাও; সফর হবেই
প্রত্যেক লোকেরই পরিসমাপ্তি ঘটবে

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

327

নফস ও শয়তান বগলের খঞ্জর
আক্রমণ হবেই ওহে অসতর্ক
দ্বীন ও ঈমানে যেন না হয় ত্রুটি
তাওবা কর, ফিরে আস হে বদকার!

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

হঠাৎ মাথার উপর চলে আসবে শেষ মূহুর্তে
তখন কোথায় থাকবে তুমি ও দারুল আমল
বিরাট সুযোগ হাত ছাড়া হবে
আর হাতে আসবেনা অপর জীবন
একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

তোমার কিছু নেই হে আখেরাতের ফিকির বঞ্চিত
ধোঁকা খেয়ো না, দুনিয়ার জীবন কিছু নয়
কিছু দিনের জীবন কিছু নয়
অমূলকের উপর ভরসা কিছুই নয়

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ
তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে একদিন
কবরে আবাসস্থল হবে তোমার একদিন
খোদাকে চেহারা দেখাতে হবে একদিন
এখন আর গাফলতে নষ্ট কর না একদিন

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

328

সকলকেই মৃত্যুপুরীর গলিতে পথচারী
সবই যাচ্ছে মরণের (অভিমুখে) দিক ধরি
প্রতিটি দিক থেকে ধ্বংসের নদি বহমান
প্রত্যেক বস্তু থেকে লয়ের গন্ধ আসছে

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

এ দুনিয়ার বাহার হল কয়েকদিন
কয়েক দিনের মালিক এর সাথে গাফিল হয়ে অন্তরের সম্পর্ক করোনা
নিজের এই জীবন গাফলতে অতিবাহিত কর না
গাফলত পরিত্যাগকারি, হুশিয়ার, হুশিয়ার,

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

ঐ সৌন্দর্য ও দুনিয়ার জীবন কয়েক দিন
এ সুরা ও শরাবের যুগ কয়েকদিন
ক্ষণস্থায়ী জগতে অবস্থান কিছুক্ষণ
তাই এখন পরকালের কাজ করে নাও কিছুক্ষণ

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

ধ্বংসশীল দুনিয়ার আনন্দ-ফুর্তি নাম মাত্র
বর্তমান জীবনের স্থায়িত্ব নামমাত্র
লয়প্রাপ্ত-প্রফুল্লতা কিছুই না
কয়েকদিনের জিন্দেগী কিছু না
একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ

যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

বরফের মত কমে যাচ্ছে জীবন
নি:শ্বাসে নি:শ্বাসে ধীরে ধীরে নি:শব্দে
শ্বাস-প্রশ্বাস হল নাস্তিজগতের পথিক
হঠাৎ একদিন সে যাবে থমকে

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ
আখেরাতের ফিকির করা আবশ্যক
সেভাবে করবে সেভাবে পূর্ণ করা জরুরী
অবশ্যই একদিন জিন্দেগী শেষ হবে
কবরে মায়্যিতের নামা হবে নিশ্চিত

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

আগত কারো থেকে ঘণ্টা চলে যাবে
প্রাণ ত্যাগকারী চলে যাবে
রূহ ধমনী থেকে বের করা হবে
তোমার উপর একদিন মাটি ঢালা হবে

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

তোমার জীবন কাল দ্রুত গমনকারী
সব ভাবনা ছেড়ে মাওলার সাথে ভাবনা জুড়
গম থেকে গম হয়, যব থেকে যব
আমলের প্রতিদান সম্পর্কে গাফিল হয়ো না
একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ

যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

জগতে ভোজৎসব ধ্বংসের কাল
শিক্ষার জায়গা, ভাবনার স্থান
তুমি গাফিল, এটা তোমরা কি পদ্ধতি
তবে মাত্র কয়েকদিনের জীবন কাল
একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

জটিল-কঠিন রোগ তোমাকে পেয়ে বসেছে
পরিত্রাণকারী কঠোর হৃদয়ের তাও বলা হয়েছে
যে কিছুকাল জিন্দা থাকবে তার কী হল
এক জগত বিনাশের ঢলে ভেসে গেছে

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

লাখো রৌপ্য হোক তোমার কব্জায়
লাখো অলংকার হোক তোমার পরিত্রাণকারী

লাখো কেল্লার গোপন থাকো তবে
মৃত্যু থেকে কখনোই কোনো পালাবার স্থান নেই

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ
অবাধ্যতা এ গ্রহে শোভা নয়
দেখ, তোমাকে যেতে হবে জমিন তলে
যখন তোমাকে মরতে হবে একদিন নিশ্চিত
তাহলে এটা ওটার ফিকির ছেড়ে, ফিকির কর দ্বীনের

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

গাফলতে পূর্ণ এটা তোমার জীবন নয়
দেখ, জান্নাত এত সস্তা নয়
দুনিয়া হল চলার রাস্তা, নয় এটা বস্তি
নয় তা ভোগ-বিলাসিতা ও মাতলামির স্থান

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

জীবন কাটাও, তবে আরাম করো না হে গাফিল
মাল উপার্জন কর, তবে যশ-খ্যাতি অর্জন কর না
আল্লাহর স্বরণ দুনিয়াতে সকাল-বিকেল কর
যে জন্য এসেছ তুমি, সে কাজ কর

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা অনর্থক
প্রয়োজন অতিরিক্ত উপার্জন বেকার
দুনিয়ার সাথে অন্তরের সম্পর্ক করা হল নিরর্থক।
গমনের পথকে ঘর বানানো হলো মূল্যহীন।

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

ভোগ-বিলাসিতার জন্য মানুষ নয়
স্মরণ রেখো, তুমি দাস; মেহমান নও।

গাফলত ও মাতলামির তুমি উপযুক্ত নয়।
মূর্খ না হলে তুমি গোলামী কর।

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

গায়কদের এ শোভা ও কামোদ্দীপক অঙ্গ ভঙ্গী
দেখে কখনো হয়ো না পথহারা
তাদের সঙ্গ ছাড়; এখনই হাত ছাড়িয়ে নাও
ভুলেও এদের পাশে যেয়োও না।

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

বাহ্যিক সৌন্দর্যের ভিত্তিতে তুমি গেলে
ক্ষয়প্রাপ্ত দুনিয়া দ্বারা তুমি ধোঁকা খেলে
এটা সজ্জিত সাপ, দংশন করবে
গাফিল থেকো না, মনে রেখো, আর নয় আক্ষেপ করবে।

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

লয়প্রাপ্ত জগতের সাজ-সজ্জায় পড়ো না
নেকী দ্বারা তোমার প্রকৃত ঘর সাজাও
পরে এতে বসে আনন্দের বাঁশি বাজাও
সেই প্রকৃত সফলকাম যে মুক্তি পেয়েছে

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

এজগতের ঘর হলো রঙ্গিন
অবুঝ বাচ্চা হয়ে এদিকে তাকিয়ো না।
আহ! তুমি কোথায় হৃদয় জুড়েছ
তুমি এখানে কতদিন থাকবে।

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

তুমি তো এ শিক্ষার স্থানেও বিলাসী
যদিও তার পরিক্ষার ক্ষেত্র, দুঃশ্চিন্তার ঘর
তোমার চলন বুদ্ধি বহির্ভূত
গাফলত ছেড়ে পরিণাম চিন্তাকারী হও।

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

এ তোমার গাফলত, অত্যন্ত বোকামী
বিদ্রুপ তোমার মাথার উপর আছে খাঁড়া
মরণকে প্রতি মূহুর্তে সামনে রাখ
এ জগত আসবে কঠোর হয়ে

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

তোমার উপর দুনিয়া যাচ্ছে পরওয়ানার মত
কাজের পরিণামে তোমাকে জ্বলতে হতে হবে
তাই এ দাবি করা যে, আমরা হুশিয়ার-বুদ্ধিমান
তবেই কি এটা বুদ্ধিমানের আলামত।

334

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

দুনিয়ার অপমৃত্যু হলো তোমার পরওয়ানা
পরজগতের কাজের তুমি করছো না কোন পরওয়া
তুমি বুদ্ধিমত্তা থেকে কত অপরিচিত
এভাবেই তুমি বড় জ্ঞানী হও

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

শত লোককে জমিনের নিচে নিজে দাফন করেছ
তারপরও মরণের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস নেই
তোমার চেয়ে গাফিল আর কেউ নেই
অভিশপ্ত আত্মা! কিছু হলেও তো শিক্ষা নেয়া উচিত।

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

নিজেকে বেকার রেখো না
আখেরাতের জন্য সদা প্রস্তুত রাখো
আল্লাহ বিনে অন্তরে কাউকে ঠাঁই দিয়ো না।
মরণের কথা প্রতি মুহূর্তে মনে রেখো
একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

কখনো মরণকে হত্যাকারি ভেবো না
জীবনের প্রাণ হল মরণ।
বুদ্ধিমান মউতে প্রিয় ভাবে

335

গাফিল! প্রতি মুহূর্তে মরণেকে স্মরণ রেখো
একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ
এখন সকল বাজে বিষয় ত্যাগ কর
নিজে নিজের সময় নষ্ট করো না
গাফিল থেকো না! আল্লাহ স্মরণ দিন রাত কর
"স্বাদ বিনাশী" কে স্বরণ কর ও ফিকির কর।

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

এটা তোমার পাগলামীর অবস্থা এবং শুন
জ্ঞান ফিরিয়ে আন, এখন আর গাফলতের দিন নেই
এখন সর্বদা মৃত্যুর দিন গণনা কর
প্রস্তুত হও, সামনে কঠিন ঘাঁটি

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

এই সম্মানপ্রীতি আলোর জন্য
আত্মপূজা আলোর জন্য
তোমার দালান এবং দুনিয়াদারী আলোর জন্য
আলোর জন্য, তোমার অস্তিত্ব আলোর জন্যই।

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

বুযূর্গীতে তুমি গাফলতকে বেছে নিয়োনা
এখন আর জিন্দেগীর কোন মূল্য নেই

গ্রীবায় হল মৃত্যুর খঞ্জরের আঘাত
তাই নিজেকে মুর্দাদের মধ্যে ধরে নাও

একদিন মরতে হবে, পরিশেষে মরণ
যা করার করে নাও, পরিসমাপ্তি মরণ

বাল্যকালে একটি কবিতা শুনেছিলাম, অবসর সময়ে যখন
ঘণ্টার আওয়াজ কানে আসে তখন এ কবিতা মনে পড়ে;
(অর্থাৎ) "গাফিল! তোমাকে ঘন্টা এটা ঘোষণা দেয়
আসমান জীবনকালের কিছুকাল কমিয়ে দিয়েছে!

337

কসিদা-১

[নিম্নোক্ত কিছু শ্লোক দীর্ঘ কবিতা থেকে সংগৃহিত]

ضيعت عمرك يا مغرور فى غفل
قم للتلافى فانت اليوم فى مهل
হে! তোমার জীবন গাফলতে নষ্ট করেছ।
প্রতিকারের উদ্দেশ্য দাঁড়াও, আজ তুমি অবসর।

واستفرغ الدمع مما فات من زمن
واندم بتوب على ايامك الاول
হাত ছাড়া সময়ের জন্য অশ্রু প্রবাহিত কর
গত দিনগুলোর উপর লজ্জিত হয়ে তওবা কর

بادر الى صالح الاعمال مجتهدا
فالنجح فى الجهد والحرمان فى الكسل
কঠোর পরিশ্রম করে নেক আমলের দিকে ধাবিত হও
সফলতা পরিশ্রমে, হতাশা অলসতায়

كن لا محالة فى الدنيا كمغترب
على رحيل دنى او عابر السبل
নিশ্চয় তুমি দুনিয়াতে থাকে পরদেশের যাত্রীরমত
যার যাত্রা নিকটে অথবা পথচারীর মত

دار الخلود مقاما دار آخرة
ان الاقامة فى الدنيا الى اجل
চিরস্থায়ী আবাস তো হল, পরকাল
দুনিয়াতে বাস নির্দিষ্ট কিছুকাল

338

কসিদা-২

[কবিতার কিছু শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হলো]

ليس الغريب غريب الشام واليمن
ان الغريب غريب اللحد والكفن
“শাম ও ইয়ামানের মুসাফির প্রকৃত মুসাফির নয়
কবর ও কাফনের মুসাফির বাস্তব অর্থে মুসাফির।

لا تنهر غريبا حال غربته
الدهر ينهره بالذل والمحن
কোন পরদেশিকে পরদেশে থাকাবস্থায় ধমকি দিও না।
কালই তাকে হীনতা ও পরীক্ষার দ্বারা ধমকায়

ان الغريب له حق لغربته
على المقيمين فى الاوطان والسكن
প্রবাসী সফরের কারণে তার আছে অধিকার
স্বদেশে ও বাসস্থানে অবস্থানকারীদের উপর

سفرى غريب و زادى لن يبلغنى
وقوتى ضعفت والموت يطلبنى
আমার সফর পরদেশে, পাথেয় আমাকে বাসস্থানে পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট নয়।
আমার সামর্থ দূর্বল হয়ে পড়েছে আর মৃত্যু আমাকে খোঁজছে।

ولى بقايا ذنوب لست اعلمها
الله يعلمها فى السر والعلن
আমার গোনাহ স্তুপ আছে, যা আমি জানিনা
তবে আল্লাহ তার প্রকাশ্য ও লোক্কায়িত সব জানেন।

339